লাল মাটি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

চার টাকা আট আনা

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬০
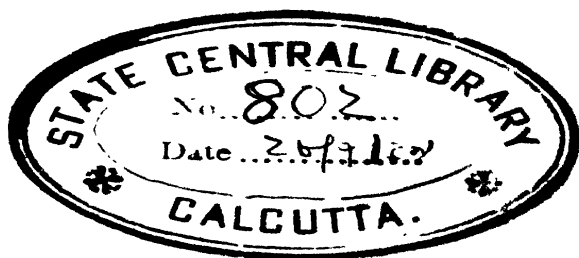
প্রচ্ছদপট-শিল্পী : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার শৈশবে হারানো মা-কে

'শিলালিপি' উপন্যাসের সঙ্গে 'লাল মাটি'র কাহিনীগত সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, শুধু ভাবগত যোগসূত্র আছে মাত্র। সুতরাং 'লাল মাটি' স্বয়ং-সম্পূর্ণ উপন্যাস।

কথামুখ
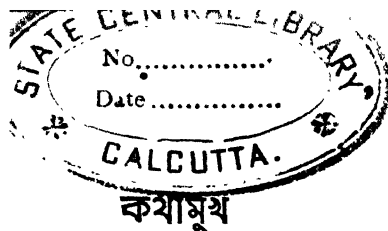
চৈত্রের বাতাসে ধুলো ওড়ে—রাশি রাশি লাল ধুলো। তালবীথি আর শালবন কাঁপানো দমকা হাওয়া যেন হোলি খেলার উল্লাসে উড়িয়ে দেয় ফাগের গুঁড়ো। বর্ষায় তাই রক্তচন্দন; ঝাঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া অশথ্-বটের একশো বছরের পুরোণো ডাল-পালায় বৃষ্টির ঝাপ্টা লাগে—'বরিন্দে'র এই নিঃসীম মাঠকে মনে হয় কোনো কাপালিকের মূর্তি—'ডাঁড়া বা নালার মুখ দিয়ে তীরবেগে ছুটে-চলা জলধারা একখানা বাঁকা খড়্গের মতো ঝিলিক মারে বিদ্যুতের উজ্জ্বলতায়।

কোনো মরা নদীর শুক্‌নো গর্ভের মতো বিলুপ্ত সভ্যতার অস্থিচূর্ণবাহী 'বরেন্দ্রভূমি'র মরা মাটি। হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয়, একদিন একটা রক্তসমুদ্র ঢেউ তুলে তুলে দুলত এইখানে; যেন সৃষ্টির আদিতে ফুটন্ত সোরা-গন্ধক-লাভা-তরঙ্গের মতো। তার পর আস্তে আস্তে থেমে গেল তার উৎক্ষেপ, নিবে গেল তার উত্তাপ। রক্ততরঙ্গ রূপায়িত হল উঁচু ডাঙা আর নিচু ঢালের খামখেয়ালিতে। পালতোলা সভ্যতার জাহাজ থমকে গেল সেই সঙ্গে, জরাজীর্ণ হতে লাগল ক্ষমাহীন সূর্যের আলোয়—তারপর তার ভাঙা হাড়-পাঁজরা রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

আজ 'বরিন্দে'র মাঠ প্রত্নবিদের কৌতূহল। এর মজা দীঘির ধারে ধারে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় তার সন্ধানী দৃষ্টি। এর সিঁদুর মাখানো থানে থানে মূক অতীত হঠাৎ ওঠে মুখরিত হয়ে। পুরোণো বটের কোটর যেখানে ফোপ্‌রা হয়ে গিয়ে একটা ফাটা পেটের মতো হাঁ করেছে—তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আধখানা শিলাফলক ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলে ম্লান মশালের আলো।

লাঙলের ফালে ফালে ওঠে শিলামূর্তি—কেউ সম্পূর্ণ, কেউ খণ্ড খণ্ড। কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে অচল ধর্মচক্র আলোর দিকে চোখ মেলে তাকায় হাজার বছরের ওপার থেকে। ভরা বর্ষায় দীঘির উঁচু পাড়ি কেটে কেটে বৃষ্টির ধারা যখন নামে,—তখন তার সঙ্গে হঠাৎ গড়িয়ে আসে এক-টুকরো স্বর্ণমুদ্রা: "শ্রীশ্রীধর্মপালস্য"। পাঁচু মিঞার মুরগীর খোঁয়াড়ের তলায় একদিন কুড়িয়ে পাওয়া যায় একখণ্ড উৎকীর্ণ তাম্রপট্ট: "দেবাচল গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সোমদত্তকে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ভূখণ্ড দান করলেন চণ্ডিকানুগৃহীত ক্ষত্রিয়কুলগৌরব ভূস্বামী বসুবন্ধু"।

শুধু তাই নয়। কাঠবাদাম আর পুরোণো নিম গাছের ছায়ার নিচে, স্বর্ণলতায় ছাওয়া লাটাবন আর মনসা কাঁটার আবেষ্টনে ভাঙা দরগা তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। পুরু শ্যাওলার আস্তর পড়া মস্‌জেদের গম্বুজের ফাটলে ফাটলে অশ্বথের শিকড় নামে নাগপাশের মতো। আলাদ-গোখুরের ফোকর্‌ভরা ভাঙাচুরো উঁচু জাঙ্গাল "শাহী শড়ক" নাম নিয়ে আকাশের দিকে মুখ ভ্যাংচায়।

সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ।

একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকন্‌পুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপ-স্তম্ভ। একমণ ঘী আর একথান কাপড় দিয়ে আজ আর সেই দীপস্তম্ভে প্রদীপ জেলে দেয়না কেউ; কবে একদিন সে প্রদীপ বুক জ্বলে নিবে গেছে—আর সেই সঙ্গে গৌড়ের প্রাসাদেও ঘটেছে দীপনির্বাণ—বরেন্দ্রভূমির বুকে ছড়িয়ে গেছে বিস্মৃতির নিশিপট।

আর ডাকে বান। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল নামে

বরিন্দের ঢালু মাঠের ওপর। মহাসাগরের রূপ ধরে। দেশী গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ির 'লিক' তলিয়ে থাকে তিরিশ হাতের জলের নিচে। এলো-মেলো বাতাসে বাদাম তোলে পশ্চিমা মাঝিদের নৌকো।

একদিন এই নদীগুলি ছিল বরিন্দের বাণিজ্যপথ—তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ভ যতই ভরাট হয়ে উঠছে—ততই বন্যার উচ্ছ্বসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত 'বরিন্দের মাঠ' যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। রাঢ়-বঙ্গ যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে—সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লাল মাটি—'বরেন্দ্রভূমি'। একদিকে যখন কষাড়-জঙ্গলের মাঝখানে জ্বলন্ত বাঘের চোখে আর হোগলার চড়ায় কুমীরের লেজ-ঝাপ্টানিতে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রাম, তখন এর রাজপথ দিয়ে 'গৌড়াবনীবাসবের' চতুরঙ্গ গৌরবে রণযাত্রা।

জৈন-তীর্থঙ্করদের পদচ্ছায়ায় ভিক্ষু করুণাশ্রীর ধ্যান-বিলীন সৌম্য-মূর্তি; সংঘস্থবির মণিভদ্রের উদার কণ্ঠে মুখরিত 'ত্রিপিটকের' পবিত্র বাণী; একলাখী আর সোনা মসজেদের উচ্চশীর্ষ থেকে 'আজানের' প্রভাতী ঘোষণা—একলক্ষ মানুষের সমবেত একটা সশ্রদ্ধ ছবি।

শুধু কি ক্ষয় আর মৃত্যুর ইতিহাস? না।

বরিন্দের রাঙা-মাটির মাঝখানে দিগ্বিকীর্ণ একটি দীঘি—"দীবোর দীঘি" তার নাম; একটি বিচূর্ণ বিধ্বস্ত প্রাচীন প্রাকার: তার নাম "ভীমের জাঙ্গাল"।

নিঃশব্দ ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। মহারাজচক্রবর্তী ধর্মপাল-দেবপালের বংশে

মূর্তিমান কুল-কলঙ্ক। মদ্যপ, লম্পট, অত্যাচারী। নারীমাংস-লোলুপতায় তার তুলনা নেই। একদিকে যেমন একজন সমৃদ্ধ প্রজা একটি মুহূর্ত শান্তিতে কাটাতে পারে না, অন্যদিকে একটি সুন্দরী নারী নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পারে না একটি রাত্রিতেও।

তার পর একদিন আগুন জ্বলল। অহল্যা মাটির পাষাণ বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হল আগ্নেয়গিরি। বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণ-বিপ্লব—শূদ্র শক্তির উদ্বোধন।

ইতিহাসের পাতায় তার নাম 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ'। শুধু তাই বলে এই বিদ্রোহ একটা বিশেষ শ্রেণীগতই ছিলনা, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছিল শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষ; দিব্যোকের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৈবর্ত-শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজপ্রতাপ—নিজের রক্ত দিয়ে এতদিনের সঞ্চিত ঋণ শোধ করতে হল মহীপালকে। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি দিব্যোক স্ববলে আয়ত্ত করলেন গৌড়ের সিংহাসন, ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ভীমভুজ রক্ষা করতে লাগল এই নতুন রাষ্ট্রকে।

দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সে কৈবর্ত-রাষ্ট্র। কিন্তু শত শত বছর পরে আগামী পৃথিবীর সূচনা এঁকে দিয়ে গেছে কাল-পুরুষের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে। স্বাক্ষর রেখে দিয়ে গেছে গণ-মানবতার—ওই মজে-আসা "দীবোর দীঘিতে", তার শিলামণ্ডিত জয়স্তম্ভে, দিগ্‌বিস্তীর্ণ ভীমের জাঙ্গালে। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পূর্বগামীদের প্রেরণা।

সেই প্রেরণাই কি পেয়েছিল তারও কয়েকশো বছর পরে আদিনার সাঁওতালেরা? অনার্য শক্তি কি নতুন করে খুঁজেছিল আত্মপ্রকাশের পথ? জিতু সাঁওতালের ভেতর দিয়ে আত্মঘোষণা করতে চেয়েছিল দিব্যোকের বিদ্রোহী প্রেতসত্তা?

না—লাল মাটি শুধু তো মৃত-কালের একটা স্তব্ধ সমুদ্রই নয়! বরিন্দের মাঠে মাঠে শুধুই তো আকীর্ণ নেই মৃত-সংস্কৃতির পঞ্জরাস্থি। নদীর বাঁধভাঙা বন্যায় বন্যায় শুধুই তো সূচিত হয় না নতুন কোনো আত্মহত্যার ইতিহাস।

লাল মাটি। রক্তচন্দনের তিলকপরা জটামণ্ডিত কাপালিক। 'ডাঁড়ার' জলধারায় উচ্চকিত তার খর-খড়্গের দীপ্তি। একটা নতুন সত্যের—নতুন পৃথিবীর সাধনাই সে করে চলেছে। মৃত-কালের শবদেহে তার তন্ত্রাসন—নিশি রাত্রের আলেয়ায় আলেয়ায় তার চোখ সংস্কৃতির এই বিপুল শ্মশানে অস্থি-অক্ষ সন্ধান করে ফেলে।

আর অন্ধকারে চোখ মেলে রাখে রুকন্‌পুরের দীপস্তম্ভ। তাকিয়ে থাকে দীবোর দীঘির জয়স্তম্ভের দিকে। প্রদীপ আর পতাকা! তারা কতদূরে যারা নতুন করে আবার দীপ জ্বেলে দেবে, কোথায় ঘুমিয়ে আছে তারা—যারা নতুন ধ্বজার ঔদ্ধত্যে স্পর্ধা করবে আকাশকে?

ঝোড়ো হাওয়ায় পুরোনো অশ্বত্থ-বটের ডালে-পালায় রুদ্র-তান্ত্রিকের জটা দুলে ওঠে। মেঘের ডাকে শোনা যায় তার গুরু গুরু স্বর: তারা আসছে!

উগ্র ভয়ঙ্কর আলোয় চারদিক জ্বালিয়ে দিয়ে তাল গাছের মাথায় বজ্র পড়ে। চড়্‌চড়্‌ করে ফেটে যায় খানিকটা মাটি—তীব্র পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। সামনে বাঁকা খড়্গের মতো 'ডাঁড়া'র জলটা ঝিকিয়ে ওঠে আর একবার, লাল মাটির একটা ঝড় হু হু করে ছুটে যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো।

এক

—শন্-শন্-শন্—

একটার পর একটা তীর চলেছে। ঘাসের বন ভেঙে-চুরে জানোয়ারটা যতই পালাতে চেষ্টা করুক, আজ আর রক্ষা নেই ওর। সাঁওতালেরা নির্ভুল ব্যূহ-রচনা করেছে চারদিকে। যেন শব্দভেদী বাণ ছুড়ছে ওরা—প্রত্যেকটি তীর গিয়ে লাগছে লক্ষ্যস্থলে।

বুনো শূয়োরটা দেখল আর আত্মগোপনের চেষ্টা করা বৃথা। এদিকের ঘাস-বন তোলপাড় করে সে লাফিয়ে পড়ল বাইরের ফাঁকা মাঠের ভেতরে। ততক্ষণে তার নোংরা বিশাল শরীরটায় গোটা তিনেক তীর কাঁপছে থর্ থর্ করে—ঘন রক্ত সারা গায়ে তার জমে আছে রক্তজবার একটা মালার মতো।

নিতান্তই দুর্বুদ্ধি, তাই এই তল্লাটে একটা বুনো ওলের গোড়া খুঁড়তে এসেছিল সে। তাতেও যথেষ্ট হয়নি—একটা রাখাল ছেলেকে একটু দূরেই দেখতে পেয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া করেছিল তাকে। গায়ে বেশি চর্বি থাকার জন্যেই হোক কিংবা রোদের তাপটা একটু বেশি প্রবলই হোক, তার মাথাটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল তখন। ছোকরাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে ধারালো দাঁতে তার পেটটাকে তৎক্ষণাৎ একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত সে।

কিন্তু কাছাকাছি একটা বাব্‌লা গাছ ছিল, তাই রক্ষা। ছোকরা এক লাফে তাইতেই উঠে বসল। শুধু উঠে বসল তাই নয়—প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলে সেখান থেকে।

দূরে কাঁদড়ের পাশ দিয়ে মহুয়া বনে হরিয়ালের খোঁজে চলেছিল

জোয়ান মাঝি একদল। চিৎকারটা কানে গেল তাদের। হৈ হৈ করে দৌড়ে এল তারা।

ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝেছে বুনো শূয়োর। উর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘাসবনের এই ফালিটুকুর মধ্যে। তার পর থেকেই চলেছে এই চক্রব্যূহের আক্রমণ।

নিরুপায় হয়ে মাঠের মধ্যেই সে লাফিয়ে পড়ল তারপর। জবার মালার মতো থকথকে রক্ত তার সারা গায়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজটা যন্ত্রণার গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে এতক্ষণে।

শাঁ করে আর একটা তীর এসে বিঁধল তার চোখের ওপর। অন্ধের মতো শেষ-আক্রোশে সম্মুখের লোকটার ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেল। ছিঁড়ে টুকরো করে দেবে তাকে—নেবে মর্মান্তিক প্রতিহিংসা। কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই চক্ষের পলকে আর একটা তীক্ষ্ণ ফলক এসে তার ফুস্‌ফুস্‌টাকে ভেদ করে দিলে—হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে —থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর।

তীর ছুটে এল শন্ শন্ করে—একটার পর একটা। কখন যে নিজের সঙ্কুচিত দেহটাকে প্রসারিত করে দিয়ে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল নিজেই জানে না সে। সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলল সাঁওতালেরা।

আর ঠিক সেই সময়ে, মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে সকৌতূহলে সেখানে সাইকেলটা থামালো রঞ্জন—কর্মী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আগ্রহ-ভরে জানতে চাইল : কিরে, কী শিকার পেলি তোরা?

—বরা, বাবু—একমুখ হেসে জবাব দিল একজন।

—বেশ বড় তো।—রঞ্জন ভীতি-মেশানো চোখে তাকিয়ে রইল শূয়োরটার দিকে।

—হাঁ বাবু, খুব বড়।—আর একজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে :

দাঁতাল্। আমরা সময়মতো এসে না পড়লেই শালা উ ছোকরাকে মেরে ফেলত একদম।

রাখাল ছোকরা তখন কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের দিকে একটা শাদা কাপড়ের ফালি ঝুলছে, তা ছাড়া আর কোনো পরিধেয়ই নেই তার। দুকানে দুটো তামার বীরবৌলি—তার একেবারে আদিম বেশ-বাসের সঙ্গে ও-দুটোকে কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। হাতে তার একটা পাঁচনবাড়ি—উত্তেজিতভাবে তখনো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে।

ওদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। অত্যন্ত বীরের মতো সজোরে গোটা দুই লাথি মারল শূয়োরটার পেটের ওপর। ধূলিমলিন কালো পায়ে জড়িয়ে গেল একরাশ জমে-আসা ঘন রক্ত।

বললে, আমাকে মারবি? মার্ শালা, মার্ ইবারে।

রঞ্জন হাসল: খুব জোয়ান দেখছি যে। এই, কী নাম তোর?

পায়ে শূয়োরের রক্ত মেখে ছেলেটা তখনো বীররসে উদ্দীপ্ত। সগর্বে বললে, ধীরুয়া।

একজন জানিয়ে দিল পরিচয়টা।

—উ টুল্‌কু মাঝির ব্যাটা। উর বাপের কথা জানো না? সেই যে মাঝিটা—ফতে শা পাঠানের পাইককে খুন করে হাজতে গেল?

মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এ অঞ্চলের নাম-করা জমিদার ফতে শা পাঠান। দুর্জনে বলে, সোনা দীঘির হাটের পথে নিজের লোক লাগিয়ে বাপকে খুন করায় সে, তারপর দখল করে জমিদারী। পিতৃহত্যার রক্ত হাতে মেখে নিঃসংকোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাঁওতালেরা মোটের ওপর জমিদারের সান্নিধ্য

থেকে দূরেই ছিল অনেককাল। কুঁজিকাঁটা আর ইকড় ঘাসে ভরা পতিত জমিতে বাস্তু বেঁধে বাস করতে অভ্যস্ত এই যাযাবরের দল। সামান্য ক্ষেত-খামার আর শিকার করেই এদের দিন কাটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না—এরা খুশি মতো একসের তামাক কিংবা দুটো একটা তিতির নজর দিয়ে আসে কখনো সখনো।

কিন্তু ফতে শা পাঠানের জমিদারী মেজাজ হঠাৎ যেন দিল্লীর শাহেন্‌শা বাদ্‌শাহের মতো চড়ে উঠল। গোরুর গাড়ি করে আসতে আসতে তিনি দেখলেন, মাঠের একটা অংশে মটর-কলাই একটি ঘন-সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে।

ফতে শা জানতে চাইলেন: ও জমি কার?

বিশ্বস্ত 'বাদিয়া' বরকন্দাজ বললে, হুজুরেরই!

—আহাম্মক!—ফতে শা খানিক থুথু ছিটিয়ে বললেন, জমি যে আমার, সে আমি জানি। রায়ত কে?

—জী, সাঁওতাল।

—সাঁওতাল?—একবার চোখ তুলে তাকালেন ফতে শা: খাজনা দেয় কত?

—কিছুই না—

—কিছুই না? কেন?—চোখ লাল করে জানতে চাইলেন ফতে শা: আমার প্রজা, অথচ খাজনা দেয় না?

—জী, ওটা পতিত জমি।

—পতিত জমি?—ফতে শা গর্জন করলেন: কিন্তু খয়রাতী তো নয়। জমি আমার। পতিত হোক যাই হোক—চাষ দিতে কে বলেছিল ওদের? খাজনা চাই।

—সাঁওতালেরা ক্ষেপে যাবে হুজুর—

—ডরপোক কুত্তার দল—চেঁচিয়ে উঠলেন ফতে শা : নেমকহারামের বাচ্চা! সাঁওতালের ভয়ে ল্যাজ্ গুটিয়ে আছিস! খাজনা চাই আমার —কালই যেন পাইক আসে।

পাইক এল পরের দিন।

ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বললে হয়তো রফা একটা হতে পারত, কিন্তু ফতে শা পাঠানের পাইক-বরকন্দাজদের শিক্ষাদীক্ষা অন্য রকম। তা ছাড়া খুনখারাপী করা বাদিয়া, কাউকে বরদাস্ত করবার বান্দাই নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত একটা তীর এসে মহবুব পাইকের গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। পুলিশ এসে চালান দিলে টুল্‌কুকে—দশ বছর হাজত হয়ে গেল তার।

সেই টুল্‌কুর ব্যাটা এই ধীরুয়া! রঞ্জন একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো ধীরুয়ার দিকে। কেউটের বাচ্চা কেউটে? বিষ সঞ্চয় করে প্রস্তুত হচ্ছে দিনের পর দিন—বরিন্দের প্রান্তে প্রান্তে, লাল মাটির টিলার আড়ালে-আবডালে?

চমক ভেঙে গেল।

সাঁওতালদের একজন বললে, বাবু, আজ রাতে আমাদের পাড়ায় তুর নিমন্তন্ন।

—ওই শূয়োর খাওয়াবি বুঝি?

—হাঁ, আর পচাই।

—দুটোর একটাও আমার চলবে না মোড়ল—রঞ্জন হাসল : নিমন্তন্নটা জমা রইল ভবিষ্যতের জন্য। কেমন?

—হাঁ বাবু।

—আচ্ছা—মৃদু হাসল রঞ্জন, শেষবার তাকালো টুল্‌কুর ছেলে ধীরুয়ার দিকে। তারপর আবার সাইকেল হাঁকিয়ে ধরল জয়গড় মহলের পথ—হাতে তার অনেক কাজ এখন।

দুই

ধানসিঁড়ির দেশ এই বরিন্দ্।

দূর থেকে মনে হয় যেন অতি বিশাল একটা বৌদ্ধ প্যাগোডা। ঢেউ-তোলা মাটি চলেছে দিক থেকে দিগন্তে—যতদূর চোখ চলে উঁচু নীচুর খেলা। ঢেউ-তোলা এই মাঠের বুকে লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ধানের সমারোহ, আলের রেখাগণ্ডী দিয়ে বাঁধা ধানক্ষেতগুলি এক একটা সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে। ফসল যখন বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—শরতের রোদ মেখে হিরণ্যশীর্ষগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ে আলের ওপর, তখন মনে হয় বরিন্দের মাঠ জুড়ে কে যেন একটার পর একটা সোনার স্তূপ সাজিয়ে গেছে। আকাশ থেকে এক এক ছঁড়া পান্নার মালা কে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর—উড়ে পড়ছে গাঢ়-সবুজ নল-টিয়ার ঝাঁক।

এই ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমেছে একটা ফালি পথ। মানুষের পায়ে পায়ে মসৃণ—সূর্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল। কোথাও কোথাও পুরু লাল ধূলোর স্তর পড়ে আছে, তার ওপর সরু সরু সর্পিল রেখা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ওর অর্থ বুঝতে গেলে আসতে হবে সন্ধ্যার পরে—যখন তালবনের মাথার ওপর চাঁদটা ভালো করে উঠে আসবে—যখন অল্প অল্প 'লিলুয়া' বাতাসে ভেসে বেড়াবে বহু দূরে ফোটা ঝাঁটি-আকন্দের গন্ধ; সেই সময় জুড়িয়ে যাবে দিনের দাবদাহ—মাটির ফোকরের ভেতর থেকে একটি একটি করে মুখ বার করবে গোখরো আর কেউটের শিশুরা, বায়ু সেবন করবে, খেলে বেড়াবে খোলা পথটুকুর ওপরে। আর যদি মাটিতে টের পায় কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করবে ধানক্ষেতের আড়ালে।

সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে এই ঢালু পথ দিয়ে নামছিল রঞ্জন।

লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ক্ষেত দুধারে বিস্তীর্ণ কিন্তু, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ধান এবারে হৃতশ্রী। অসময়ে কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়ে পোকা লেগেছে ধানে। শুক্তির বুকে আঁকড়ে রাখা মুক্তোর মতো ধানের স্নেহকোষে সঞ্চিত শস্যকণাটি কেটে খেয়েছে কীটেরা—এলোমেলো বাতাসে রেণুরেণু তুঁষ উড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল রঞ্জন। গত বছর বন্যায় ফসল গেছে, এবারে যদি পোকায় সর্বনাশ করে তাহলে মানুষের দুর্গতির কিছু বাকী থাকবে না আর। গেল বার আগাগোডাই আধিয়ারদের কর্জের ওপর চালাতে হয়েছে; এবারে যদি শোধ না করতে পারে তা হলে না খেয়ে মরতে হবে দেশশুদ্ধ লোককে।

ধানের ক্ষেতে সবটাই সোনা নেই—তাতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে। অথবা কোনো দিনই সোনা ছিল না—ওর ভেতরে সবখানিই খাদ, সবটুকুই কলঙ্ক। দূর থেকে দেখেছে বলেই বুঝতে পারেনি; মনে হয়েছিল, রৌদ্রপীত স্বর্ণাঞ্চল বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গলক্ষ্মী। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা নিয়ে—অনেক উচ্ছ্বাসে মুখর হয়েছে শহরের বক্তৃতামঞ্চ। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষা আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্টায় ফিকে হতে শুরু করেছে গিলটির রং।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন সন্দেহ হয় একটা আকাল নামছে। আকাশের ওই দিকটাতে মেঘ জমে উঠছে—হয়তো ফাঁকা, হয়তো শেষ রাতের দিকে খানিক বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু মনে হয় ওটা যেন একটা বিশাল গিন্নী শকুন;—সামনের দিকে মেঘের যে অংশটুকুর ওপর রোদ জ্বলছে তা ওরই শানানো ঠোঁট। শবদেহের মতো পৃথিবী পড়ে আছে সম্মুখে—শুকনো কুঞ্চিত চামড়ায় বলিচিহ্নের মতো সাপের রেখা।

এখনই তো তার কাজ। জমি তৈরী হচ্ছে—সময় আসছে এগিয়ে। খাটুনিও বড় বেশি পড়েছে কিছুদিন যাবৎ। কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখান

থেকে বাস এবার তুলতে হল। গীতাপাঠের অভিনয়টা আর চলছে না। কুমার বাহাদুরও এর মধ্যে সন্দেহ করেছেন বলে মনে হয়।

সেদিন সবে যখন কুমার বাহাদুরের আফিঙের মৌজটা বেশ জমে উঠেছে, ডেক চেয়ারটায় লম্বা হয়ে গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি চোখ বুজেছেন, আর বালাখানা তামাকের আমেজে ভারী হয়ে গেছে ঘর, তখন রঞ্জন খুব দরদ দিয়ে তাঁকে গীতা বোঝাচ্ছিল।

কুমার বাহাদুরের ডায়বেটিস্ আছে। শরীরের কোথাও ইলশে গুঁড়ির ফোঁটার মতো একটা ফুস্কুড়ি দেখলেই আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন তিনি, চেঁচিয়ে ওঠেন: ডাক্তারকো বোলাও। আনো ইন্‌সুলিন। মৃত্যুভয় তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেই জন্য রঞ্জন তাঁকে কিছুটা আশ্বাস দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

গলার স্বরে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেই সে পড়ে যাচ্ছিল:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি—
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।…

অর্থাৎ কিনা, হে কৌন্তেয়, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে থাকে, তেমনি জীর্ণ শরীরকেও ত্যাগ করে মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকটা কুমার ভৈরবনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ মৃত্যুর দুর্ভাবনা এতে অনেকটা যেন লাঘব হয়ে আসে। আত্মা অজরামর—এই সত্যটা অধিগত হলে সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও আসে যে মরেই তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না; তাঁর জমিদারীর স্বত্ব-স্বামীত্ব ভোগ করবার জন্ম আবার দেহধারণ করে ফিরে আসবেন মর্ত্যে।

কিন্তু ডায়বেটিস্ ভীত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার বাহাদুর আজ এমন

মনোরম আলোচনাতেও গদ গদ হয়ে পড়লেন না ফরশীতে একটা টান দিয়ে কেমন মিটি মিটি চোখে তাকালেন।

বললেন, আচ্ছা ঠাকুরবাবু!

একদিকে বাবু, অন্যদিকে ঠাকুরমশাই—এই দুই মিলিয়ে হিজলবনীর রাজবাড়িতে এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছে রঞ্জনের—ঠাকুরবাবু! কুমার বাহাদুর যেদিন রাত্রে একটু বেশি কারণ করেন সেদিন কখনো কখনো ঠাকুরবাবাও বলে থাকেন! রঞ্জনও পিতৃস্নেহে তাঁকে মোহ-মুদ্গর শোনাতে আরম্ভ করে। আজ কিন্তু আফিঙের এমন জমাট নেশার ঠাকুরবাবু সম্ভাষণের মধ্যেও কেমন একটা দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ গড়গড়ায় মৃদুমন্দ চুম্বন করলেন। তারপর :

কাল বুঝি জয়গড় মহলে গিয়েছিলেন আপনি ?

রঞ্জন নড়ে উঠল। সতর্ক হয়ে তাকালো ভৈরবনারায়ণের দিকে।

কিন্তু তাঁর চোখ তো ততক্ষণে আবার নেশার আবেশে অর্ধনিমীলিত হয়ে এসেছে। মুখে একটা নির্মল নির্লিপ্ততা—গীতাপাঠের নগদ নগদ ফল কিনা কে জানে। শিথিল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন : বেড়িয়ে এলেন বুঝি জয়গড় থেকে ?

রঞ্জন অত্যন্ত সাবধানে উত্তর দিলে। আত্মপ্রকাশ করলে সংক্ষিপ্ততম শব্দে : হুঁ।—আরো কিছু বলবার আগে কুমার বাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায়টা জেনে নিতে চায় সে।

কুমার বাহাদুর কিন্তু বেশি কিছু ভাঙলেন না। তেমনি নির্মল নির্লিপ্ত-ভাবে বললেন, তাই শুনলাম। তা জয়গড় বেশ ভালো জায়গাই বটে। যেমন ওর মহুয়া বনটি, তেমনি ওর নদীর ধার। খাসা জায়গা!

—আজ্ঞে হাঁ।

কুমার বাহাদুর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন, এইভাবে বললেন, নিন, শুরু করুন তা হলে আবার।—হ্যাঁ—কী যেন পড়ছিলেন? বাসাংসি জীর্ণানি—মানে পুরোনো বাসা ত্যাগ করে—

—বাসা নয়, বাস। অর্থাৎ কাপড়। মানে শরীর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর।—গড়গড়ার নলটি আবার চুম্বন করেই ছেড়ে দিলেন কুমার বাহাদুর: তবে জয়গড়ে কয়েকটা বেয়াড়া লোক আছে—একবার দেখতে হচ্ছে তাদের। আর সেই কী বলে নগেন ডাক্তারকেও। সে যাক, আপনি পড়ুন। মানে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে—

যন্ত্রের মতো পড়েছে অগত্যা, যন্ত্রের মতোই ব্যাখ্যা করে গেছে। শুনতে শুনতে ফরশীর নল মুখে করেই ঘুমিয়ে গেছেন ভৈরবনারায়ণ। কিন্তু মনের মধ্যে স্বস্তি পায়নি রঞ্জন। কুমার বাহাদুরকে সে যতটা চালাক ভেবেছিল, তিনি তার চাইতে আরো কিছু বেশি। যা বলবার, মাত্র একটি কথাতেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন; স্পষ্ট করার চাইতে তিনি ইঙ্গিতেরই পক্ষপাতী বেশি।

অতএব বেশিদিন থাকা চলবে না আর। এখন থেকে হুঁসিয়ার না হলে নিজেই জালে পড়ে যাবে। তবু দেখা যাক—!

চিন্তাটা থমকে গেল হঠাৎ। বেশ রূঢ়ভাবেই। ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথটা সম্পর্কে যে আরো একটু সচেতন থাকা উচিত সে তার মনে ছিল না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাইকেলটা একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেলো, তারপর সোজা ওকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে কাত হয়ে পড়ল।

ধানসিঁড়ি সাজানো সোনার 'পালার' মতো বরিন্দের মাঠ শব্দ-সুরভিত হয়ে উঠল। আধখানা ভরা কলসীর জলের মতো আওয়াজ তুলে হেসে

উঠল একটি মেয়ে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে আর্ত কর্কশধ্বনি তুলে গোটাকয়েক নল টিয়া ডানা মেলল আকাশে।

হাসছিল কালোশশী।

প্রথম বর্ষায় প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা। উজ্জ্বল—পল্লবিত। বরিন্দের রোদ-বাতাস আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, রসায়িত মেয়েটি।

রঞ্জন সাইকেল টেনে লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াতে কালোশশী এগিয়ে এল।

—হাসলি যে?

কালোশশীর মুখ আবার আলো হয়ে উঠল হাসিতে: অমন করে পড়ে যাবি তুই—হাসব না?

—আচ্ছা, আচ্ছা—মনে থাকবে।—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল: যাবি তো রাজবাড়িতে—দেখা যাবে তখন। বলে দেব কুমার বাহাদুরকে—টের পাবি।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কালোশশী। কুমার বাহাদুরের নাম শুনেই যেন তার মুখের আলোটা ফিকে হয়ে এল। উজ্জ্বল দৃষ্টির ওপর নামল আশঙ্কার স্তিমিত ছায়াভাস।

—এই বাবু, গোঁসা করিস্‌নি। আর হাসবনা আমি।

রঞ্জন যেন অপ্রতিভ হল। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা শিশুকে একটা ভূতুড়ে মুখোস পরে ভয় দেখানোর অপরাধবোধটা স্পর্শ করল মনকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভৈরবনারায়ণের মুখখানা স্মৃতির ওপরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একবার। সাধারণ মানুষের মুখের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়—টকটকে রাঙা তার রঙ; পুরু একজোড়া ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁতগুলো এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকে যে অকারণ পুলকে সে মুখে

এক আঁটি বিচালি গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। হাসির বালাই সেখানে নেই—শুধু খামোকা মনে হয় লোকটা বুঝি মাথার ওপর থেকে এক জোড়া শিং বের করে এখুনি গুঁতিয়ে দেবে কাউকে। কালোশশীর দোষ নেই।

সদয় কণ্ঠে রঞ্জন বললে, আচ্ছা—এ যাত্রা মাপ করা গেল। কিন্তু কী নিয়ে যাচ্ছিস তুই? ঝাঁপিতে কী ও?

—একটা মজার জিনিস আছে—দেখবি?—কালোশশীর মুখে আবার আলো ফুটে উঠল।

—মজার জিনিস? দেখি—

কিন্তু 'দেখি'—বলে দু-পা এগিয়ে গিয়েই 'বাপ্‌রে' বলে দশ পা পেছনে লাফিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপির ঢাকা খুলতেই ভেতর থেকে তীব্র গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো অসহ্য ক্রোধে ফণা দোলাতে লাগল নীলকৃষ্ণ রঙের বিশাল একটি গোখ্‌রো সাপ—তার ফণার ওপরে চক্রচিহ্নটা রোদে ঝলমল করে উঠল।

—কী সর্বনাশ! সাপ!

কালোশশী ততক্ষণে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়েছে। বললে, এখুনি ধরলাম কিনা—তাই এত তেজ। কামিয়ে দিতে পারলে আর অত মেজাজ থাকবে না।

—সেকি! এখনো ওর বিষদাঁত আছে তা হলে!—সভয়ে রঞ্জন বললে, যদি কামড়াতো?

—কামড়াবে কেন রে?—সগর্বে কালোশশী বললে, বেদের কাছে কি সাপের চালাকি চলে বাবু? ওর মতন গণ্ডা গণ্ডা সাপ নিয়ে আমার কারবার।—কালোশশী মৃদু হাসল: চারটে পয়সা দিবি বাবু? তা হলে এখনি ওকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে দিই।

—দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।—তেমনি আতঙ্কে রঞ্জন বললে,

তোকে চার পয়সা দিতে যাব কেন? আমাকে কেউ চারশো টাকা দিলেও আমি ওর খেলা দেখতে রাজী নই!

কালোশশী তেমনি হাসতে লাগল: কিন্তু মরা সাপ নিয়ে খেলা করে কি সুখ আছে বাবু? এম্‌নি তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম। হাতের তালে তালে নাচবে—ছোবল মারতে চাইলেও পারবে না, তারপর মাটি ঠুকরে ঠুকরে নিজেই কাহিল হয়ে পড়বে!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কালোশশী তাকালো রঞ্জনের দিকে। ছিলে-টেনেধরা ধনুকের মতো তার ভ্রূ রেখা চকিতে প্রসারিত হয়ে গেল; নিস্তরঙ্গ দীঘির কালো জলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙা হাল্‌কা ঢেউ খেলে গেল দৃষ্টিতে। আর তখনি কালোশশীর জীবনের যতটুকু ওর জানা, তা মনে পড়ে গেল।

আলোচনাটা অম্‌নি থামিয়ে দিল রঞ্জন। সাইকেলে ওঠবার উপক্রম করে বললে, নে পথ ছাড়, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি কাল একবার তোর কাছে যাব বাবু।

—আমার কাছে? কেন?

—ভারী বিপদে পড়ে গেছি বাবু—কালোশশী বিশীর্ণ হয়ে গেল: পরশুরাম ফিরে এসেছে।

—পরশুরাম? তোর আগের স্বামী?

কালোশশী লজ্জিতভাবে মাথা নামাল: হঁ্যা। আর বলছে, আমাকে খুন করবে।

—খুন করলেই চলবে! আইন আছে না? তুই ভাবিস্‌নি—রঞ্জন আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল তাকে: আচ্ছা, আসিস তা হলে কাল।

পথ ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে দাঁড়িয়েছে কালোশশী, রঞ্জন সাইকেলে প্যাড্‌ল করল। উজ্জ্বল মেঠো পথ দিয়ে সাইকেলটা আবার

এগিয়ে চলল সবেগে। পেছনে তাকিয়ে দেখল রৌদ্রভরা মাঠের ভেতরে তরুণী সাপুড়ে মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—তার গলার রূপোর হাঁশুলীতে একখানা বাঁকা তলোয়ারের মতো রোদ ঝলকাচ্ছে।

অদ্ভুত এই মেয়েটা! এ দেশী নয়—বাড়ি ওর বাংলা-বিহারের কোনো সীমান্তে। অথবা আসলে ওর কোনো দেশই আছে কিনা সন্দেহ। একটা বেদের দলের সঙ্গে ঘুরত, সেখান থেকে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসে লোকালয়ের স্থিতিতে। কিন্তু স্রোতের মন বাঁধা পড়বে কার কাছে? তাই একটির পর একটি মানুষের সঞ্চার হচ্ছে ওর জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে সমানগতিতে পা ফেলে তারা কেউই চলতে পারছে না—একটা বিশাল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যেন একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে তারা। বনহংসীর নীড় গড়বে কে?

দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। আরো কত আসবে কত যাবে, কে জানে। এ হাঁসের পাখায় ক্লান্তি নেই—এক দিগন্ত ছাড়িয়ে আর এক চক্রবাল তাকে ডাক দেয়; এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্যে—এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে।

এত কথা রঞ্জনও কি জানত? একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে পরশুরামকে ধরে আনা হয়েছিল কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছারীতে—সেই সঙ্গে বিলাপ করতে করতে এসেছিল কালোশশী। সেদিন মাধবীলতা জড়ানো একটা খরকণ্টক ফণীমনসা যেন দেখেছিল রঞ্জন—চমক লেগেছিল তার চোখে।

কালোশশী তার মনের ওপর নেপথ্য-প্রভাব বুলিয়েছিল কিনা আজ সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক যে অনেকটা তারই চেষ্টায় সে যাত্রা অল্পের ওপর বেঁচে যায় পরশুরাম। মাত্র দরোয়ানের কড়া হাতে গোটাকয়েক থাপ্পড় খেয়েই নিষ্কৃতি পায়—হাজত পর্যন্ত

যেতে হয়নি আর। সেই থেকেই তার ওপর কৃতজ্ঞ কালোশশী। পরশুরামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য চুকে-বুকে গেছে অনেককাল—এখন বরং পরশুরাম কালোশশীকেই খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রঞ্জনের ওপর শ্রদ্ধা অবিচল আছে মেয়েটার। জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধার থেকে জাম কুড়িয়ে ফেরবার সময় প্রায়ই ভেট দিয়ে যায় রঞ্জনকে।

বাস্তবিক, অদ্ভুত মেয়েটা। কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হয় যেন।

চলতে চলতে কানের কাছে কথাটা বাজতে লাগল: তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম।—তাই বটে! প্রতি মুহূর্তেই টাটকা গোখরো সাপই তো খুঁজে ফিরছে কালোশশী। পরশুরামের মতো বিষধরেরা এসে জুটবে তার ঝাঁপিতে—ফণা তুলিয়ে তুলিয়ে খেলা করবে তার রূপোর কাঁকণ পরা হাতের তালে তালে, ছোবল মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় আহত হয়ে হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করবে নির্জীব পরাজয়ে! আর তখনি সে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে তাকে—আবার শুরু হবে নতুন ক'রে সাপ খোঁজার পালা। নিষ্প্রাণ সাপ নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না কালোশশীর।

ধান-সিঁড়ি পার হয়ে সাইকেলটা এতক্ষণে নেমেছে সমতলে। পেছনে টিলার ওপরে কালোশশীকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ফেলে-আসা-পেছনের পৃথিবীটাকে হঠাৎ যেন ঢেকে দিলে সামনে হিজলবনীর জমিদার বাড়িটা; দূরে মাঠের ভেতর ঝকে উঠল মালিনী নদীর ক্ষীণ আঁকাবাঁকা রেখা। তারই একটা বাঁকের মুখে একপারে হিজলবন, অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানা।

ফাঁকা মাঠের ভেতর লাল-শাদা বাড়িটা—যেন কোনো জন্তুর একটা রক্তাক্ত পাঁজর পড়ে আছে ওখানে। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মালিক—বহু মানুষের দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় অধিপতি কুমার ভৈরবনারায়ণ

বাস করেন ওই বাড়িতে। ধানসিঁড়ির দেশে, খোলা আকাশ আর অবারিত মাঠের মাঝখানে যারা মাটি কাটে আর ফসল ফলায়—ওই বাড়িটা তাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা ছোরার মতোই বিঁধে আছে সব সময়।

আর আপাতত ওই বাড়িতেই রঞ্জনের আশ্রয়।

চাকরিটা জুটেও গেছে বিচিত্র উপায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে বেকারের মতো ঘুরছিল এদিক ওদিক, এমন সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল—পেয়ে গেল কাজটা। নামে প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু কাজ গীতাপাঠ করে শোনানো! আফিং খেয়ে ঝিমুবার সময় গীতার শ্লোক না হলে কুমার বাহাদুরের নেশা জমেনা। আহা—গীতার মতো কি আর জিনিস আছে! মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দেয়—আশা হয় বাহাল-তবিয়তে আবার এই পৈত্রিক জমিদারীতে আসীন হওয়া যাবে। কেননা আত্মার বিনাশ নেই ঃ

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"—

অর্থাৎ কিনা—হে কৌন্তেয়, আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র দ্বারা এ ছিন্ন হয়না, অগ্নিতে এ দগ্ধ হয়না—

আকুল হয়ে পড়ে রঞ্জন, বিভোর হয়ে শোনেন কৌন্তেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে নাকের ডগায় দু একটা মাছি এসে বসাতে তন্ময়তার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে কুমার বাহাদুরের।

ঘোঁৎ করে গলায় একটা আওয়াজ বের করে বলেন ঃ অ্যাঁ—কী বলছিলেন? কোথায় আবার আগুন লাগল?

মুখে আসে ঃ তোমার ল্যাজে—কিন্তু প্রকাশ্যে বললে চাকরী থাকে না। সুতরাং বেশ ভদ্র ভাষায় জানাতে হয় ঃ আজ্ঞে না, না, আগুন কোথাও লাগেনি। ওই গীতায় বলছে আর কি—মানে আত্মা কখনো দগ্ধ হয়না—

—যাক্, বাঁচালেন—সাধারণ মানুষের দেড়া মুখখানায় নিশ্চিন্ত একটা ভঙ্গি ছড়িয়ে আবার ঝিমুতে থাকেন ভৈরবনারায়ণ। মাঝে মাঝে গাল নড়ে ওঠে, যেন জাবর কাটছেন। আড় চোখে দেখতে দেখতে তোতা-পাখির মতো রঞ্জন শুরু করে: হে পাণ্ডুপুত্র—

কিন্তু এতদিন ধরে সে বোধ হয় অবিচার করছিল খানিকটা। যতটা ঘুমন্ত ভেবেছিল ভদ্রলোককে, তিনি তা নন্। নেশার ঘোরেও চোখ মেলে রাখতে জানেন।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল: পাঁচটা। সর্বনাশ—এখনি চায়ের টেবিলে তার ডাক পড়বে! রঞ্জন দ্রুত সাইকেলটাকে চালিয়ে দিল।

তিন

পাহাড়ের মতো উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ওই রকম বিচিত্রই দেখায় বটে বাড়িটাকে। কিন্তু কাছে এগিয়ে এলে ওর মূর্তি একেবারে বদলে যাবে। দেখা যাবে, বাড়িটা একটা আকস্মিক নিঃসঙ্গতা নয়—তার সাত মহলায়, দ্বারী-দৌবারিকে, ডায়নামো আর গ্যারাজে, ঠাকুর-দালান আর বাই-নাচের রংমহলে একেবারে জমজমাট। দেউড়ির দারোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতে রামলীলার গান গায়—অন্তঃপুর থেকে চড়া গলায় রেডিয়োতে গানের চিৎকার আসে।

লোক-লস্কর, আমলায় পেয়াদায় দস্তুরমতো রাজকীয় কারবার। মহাল নেহাৎ ছোট নয়, প্রায় ষাট হাজার টাকার জমিদারী। আগে আরো ছিল, কিন্তু মদিরা এবং মদিরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। জমিদার ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ অবশ্য পিতৃপুরুষদের এই দুর্বলতার ইতিহাসটুকুকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বলেন, এক সময় দশ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল আমাদের। কান্তনগরের যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা।

—সে সম্পত্তি গেল কোথায়?—কোনো কোনো চাটুকার হয়তো মুগ্ধকণ্ঠে জানতে চায়।

—আরে, সে দেবীসিংহের আমলে।—শোনা কথাকে ইতিহাসের গাম্ভীর্য দিয়ে তার ওপরে রং বুলোতে থাকেন কুমার ভৈরবেন্দ্র, সংক্ষেপে ভৈরবনারায়ণ: দেবীসিংহ হল এ তল্লাটের ইজারাদার। জমিদারদের তখন যেমন লাঠির জোর, তেমনি টাকার তাকৎ—কথায় কথায় হাতে

মাথা কেটে আনে। দেবীসিংহ দেখল—এদের জব্দ না করলে আর চলছে না। কিস্তির টাকা এমনি চড়িয়ে দিলে যে তা দিতে দিতেই অনেকের জমিদারী সরকারী লাটে চড়ল। নইলে—হুঁঃ—হঠাৎ ভৈরবনারায়ণ নাকের ওপরে বসা মাছিটাকে হিংস্রভাবে থাবা দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন: নইলে এতকাল কি আর ইংরেজে রাজ্যিশাসন করত! করতাম আমরা—আমরা!—মাছিটাকে ধরতে না পেরে উত্তেজিতভাবে একটা থাবড়া কষিয়ে দেন নিজেরই পেটের ওপরে।

সুতরাং শরীরে আপাততঃ আফিঙের জড়তা থাকলেও মনে জেগে আছে প্রচণ্ড ক্ষাত্র তেজ। গীতা শুনতে শুনতে কখনো কখনো তেতে উঠে কোমরের আল্‌গা কষি দুটোকে বাঁধতে চেষ্টা করেন সজোরে। মনে হয় এক্ষুণি বুঝি যুদ্ধে চললেন। কিন্তু তা করেন যা। হাত বাড়িয়ে গাণ্ডীবের বদলে ফরসীর নল টেনে নেন, তারপরেই তাঁর পাঞ্চজন্য বাজতে থাকে—মানে সারা বাড়ির লোক ভৈরবনারায়ণের ভৈরব নাসিকা-নিনাদ শুনতে পায়; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা হয় বটে, কিন্তু সেটা মাছিদের মধ্যে; কৌরবরাজ্য অধিকার করবার জন্যে নয়—তাঁর নাসিকাগ্র দখল করবার সুমহান্ প্রেরণায়।

তবুও বেশ বড় জমিদার। বাইরে প্রচুর নাম-ডাক আছে। এই জমিদারীর এলাকাতেই গোটা কয়েক বড় বড় বিল রয়েছে—অগ্রহায়ণ থেকে বুনো হাঁসের মচ্ছব পড়ে যায় সেখানে। কুমার ভৈরবনারায়ণ বৈষ্ণব, তাঁর বিলে কারও পাখি শিকার করবার নিয়ম নেই। কিন্তু নিয়ম নেই বলেই তার ব্যতিক্রম আছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব প্রতি বছরই শিকারের জন্য এখানে এসে তাঁবু পাতেন, কখনো কখনো আসেন ডিভিশন্যাল কমিশনার—বছর বারো আগে লাট সায়েবও একবার এসেছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে, সেই মুহূর্তেই

বীররসোদ্দীপ্ত কুমার ভৈরবনারায়ণের হৃদয় হঠাৎ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। কৌন্তেয় আর সামনে কুরু-সৈন্য দেখতে পান না; সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

—আহা—অমন সাহেব আর হয় না!

—খুব ভালো সাহেব বুঝি?—মুগ্ধ চাটুকার মুগ্ধতর কণ্ঠে জানতে চায় হাজার বার শোনা সেই পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি—রোমাঞ্চিত হতে চায় সাহেবের প্রায়-অলৌকিক অপূর্ব চরিত গাথা শ্রবণ করে।

—ভালো মানে?—কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে আবার উঠে পড়েন ভৈরবনারায়ণ: একেবারে খাস বিলিতী জিনিস, বুঝলে! একরত্তি ভেজাল নেই কোথাও! কী লম্বা চওড়া আর ক্যায়্সা লাল টকটকে চেহারা! কথা তো বলে না—যেন কুঁজের ভারে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে ওঠে। আর খাওয়া! একাই একখানা দেড়সেরী খাসির রাং মেরে দিলে হে! হ্যাঁ—একেবারে জাত-সাহেব, অমন লাট দেখলেও পুণ্যি হয়।

চাটুকারের স্বরে মুগ্ধতা এবার উচ্ছ্বাস হয়ে গলে পড়ে: তা যা বলেছেন।

—এখনো সব বললাম কই!—কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় চটে ওঠেন কুমার বাহাদুর: তুমি তো বড্ড ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করো হে। ভারী বাধা দাও।

চাটুকার কাঁচুমাচু মুখ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম।—সভা শাসন করে আবার শুরু করেন ভৈরবনারায়ণ: তখন বাবা বেঁচে। লাটসায়েব বাবার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলেছিল, ইউ আর এ ভেরি লয়্যাল্ সার্ভেন্ট। বাবা আবার এক থলি গিনি দিয়ে ওঁকে প্রণাম করেছিলেন কিনা!

চাটুকার আবার কী যেন বলবার জন্যে মুখ খোলে, কিন্তু কুমার বাহাদুরের একটা রুদ্র দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়তেই কেমন থেমে যায় থতমত খেয়ে। যে শব্দটা প্রায় ঠোঁটের সামনে এসে পৌঁছেছিল, অদ্ভুত কৌশলে সামলে নেয় সেটাকে—খানিকটা হাওয়া আচম্‌কা গিলে খাওয়ার মতো কোঁৎ করে একটা শব্দ হয় গলায়।

আজও চায়ের আসরে তারই জের চলছিল।

এই সময়টাতেই একটু প্রকৃতিস্থ থাকেন কুমার বাহাদুর—আফিমের মৌতাতটা ফিকে হয়ে আসে। নেশা ছেড়ে-যাওয়া শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে যে মন্থর অবসাদ ঘনিয়ে থাকে, তাকে সতেজ করে তোলবার জন্যেই যেন ভৈরবনারায়ণ এই সব গল্প শুরু করেন—হাজার বার বলা হিউমারের পুনরাবৃত্তি করে আবহাওয়াটাকে সজাগ করে রাখবার প্রয়াস পান।

একটুকরো কাটা পেঁপে চামচেতে তুলে নিয়ে বলেন, আমি একবার ঘোড়ায় চড়েছিলুম—বুঝলেন ঠাকুরবাবু!

স্বাভাবিক বিতৃষ্ণ অনুভূতির মধ্যেও গলার স্বরে কেমন করে যে একটা কৌতূহলের আমেজ এসে যায় সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। হঠাৎ কোথাও একটা আঘাত লাগলে তড়িৎগতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে তার পাগলা একটা হিন্দুস্থানীর কথা মনে পড়ে—লোকটা পুলিশের কন্‌স্টেবল ছিল এক সময়। 'পুলিশ সাহেব' শব্দটা কানে গেলেই যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাক—ফিরে দাঁড়িয়ে খটাস্‌ করে সেলাম ঠুকত একটা।

সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে রঞ্জন বলে, তাই নাকি? বলুন—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ চারদিকে তাকিয়ে নেন একবার। লক্ষ্য করেন সকলের চোখ তাঁর ওপর উদগ্র আর সজাগ হয়ে আছে কিনা—সকলের মুখে ফুটে উঠছে কিনা জ্বলন্ত কৌতূহল। তারপর শুরু করেন:

—বুঝলেন, বাবা সেবার নেকমর্দনের মেলা থেকে কিনে আনলেন এক ভুটানী ঘোড়া। যেমন তাকৎ, তেম্‌নি চাল। কিন্তু কে জানত ঘোড়াটার মাথা খারাপ! যেমনি চেপে বসেছি, অম্‌নি—সবাই এর মধ্যে হাসতে শুরু করেছে। যাদের কোনোমতেই হাসি পায়নি, তারা যে-কোনো একটা মারাত্মক হাসির কথা ভেবে নিয়ে অন্তত একটুক্‌রো হাস্যরেখা ফোটাবার প্রাণান্তিক চেষ্টা পাচ্ছে ঠোঁটের আগায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মানুষ-গুলো পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়! নইলে এমন অর্থহীন ভাবে কেউ হাসির প্রতিযোগিতা চালাতে পারে এ কল্পনাই করা যায় না।

তবু কখনো যেন কেমন একটা সন্দেহ জাগে রঞ্জনের।

হঠাৎ মনে হয় কুমার বাহাদুর বড় বেশি ক্লান্ত—বড় বেশি হতাশায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। আফিংটা তাঁর আত্মরক্ষার একটা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—যেমন তীব্র যন্ত্রণার ওপর মর্ফিয়ার প্রলেপ। কিন্তু সে মর্ফিয়ার নেশা যখন কাটে তখন যেমন যন্ত্রণায় শরীরের নাড়ীগুলো ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেতে চায়, সেই রকম কুমার বাহাদুরও নেশার শেষে নিজের নিরুপায় নিরাশাকে আড়াল করতে চান ওই পুরোনো রসিকতার সুড়্‌সুড়ি বুলিয়ে। যেটাকে তাঁর হাস্যভরা মুখ মনে হয়, আসলে সেটা হয়তো মুখোস মাত্র।

কিন্তু কেন এমন হয়?

পচন ধরেছে নিজের মধ্যে? বহুকাল ধরে মানুষের হাড়ে গড়ে তোলা কীর্তিস্তম্ভে ফাটল ধরেছে কি প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুসরণে? কালের ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে উত্তুঙ্গ গ্রানিটের শিলাস্তর? হঠাৎ কি টের পাচ্ছেন পায়ের নিচের মাটিটা আসলে চোরাবালি—এতদিন পরে সরতে শুরু করেছে একটু একটু করে? কিংবা যে আসনটিকে এতকাল তাঁরা রাজত্ব করবার জন্যে নিশ্চিন্ত ময়ূর সিংহাসন বলে মনে করেছিলেন—দেখা

যাচ্ছে সেটা কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার—এতদিন পরে ধুঁইয়ে উঠছে কোনো রুদ্র-সংকেতে ?

অথবা এসব কিছুই না—সবটাই তার নিছক ভাব-বিলাস ? নিজের দৃষ্টির রং দিয়ে স্থূলবুদ্ধি একটা আফিংখোর মাংসপিণ্ডকে মননময় করে তোলা ?

ভাববার সময় পাওয়া যায়না—ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলেছেন কুমার বাহাদুর। আরম্ভ করেছেন আর একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু : আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন ?

—ভূত !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।—গাল নাচিয়ে নাচিয়ে হাসেন ভৈরবনারায়ণ : জিন, প্রেত, কন্ধকাটা, এই সব। ঠাকুরবাবু, আপনিও কি কিছু দেখেননি ?

এক মুহূর্তে রঞ্জনের মনে আসে তার ছেলেবেলার দেশকর্মী অবিনাশ-বাবুর স্মৃতি। আত্রাইয়ের বানে রিলিফ করতে গিয়ে প্রাণ দেন। তবু ডাহুক-ডাকা এক কালীসন্ধ্যেবেলায় রঞ্জন তাঁর অদৃশ্য গলার ডাক শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কোথায় যেন চলে গিয়েছিল ! জীবনে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা !

কিন্তু এই স্থূলতার আসরে সে বেদনা-রোমাঞ্চিত স্মৃতিটাকে উদ্ঘাটন করতে তার ইচ্ছে হয় না। মাথা নেড়ে বলে, না, আমি কিছু দেখিনি।

—কিছুই না ?

—না—আরো সংক্ষেপে জবাব দিয়ে মুক্তি পেতে চায় রঞ্জন।

—তা হলে আমি জিতেছি আপনার চাইতে—ভৈরবনারায়ণের চোখে মুখে এবার সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে পরম আন্তরিক একটি আত্মপ্রসাদ : হুঁ-হুঁ—এবারে হারিয়েছি আপনাকে।

গীতা-পড়ুয়া পণ্ডিতকে হারানোটা গৌরবের ব্যাপার নিশ্চয়। মন

চায়না কুমার বাহাদুরের সে গর্বটাকে খর্ব করতে। প্রসন্নমুখে বলে, বেশ তো, বলুন।

তখন কুমার বাহাদুর কোনো এক চণ্ডীতলার মাঠে নিশীথ রাত্রে দেখা ভূতের গল্প আরম্ভ করে দেন। ফুটফুটে ভরা-জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠে সে পঞ্চাশ হাত লম্বা দুখানি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল—আর সেই সঙ্গে কী যেন খুঁজে ফিরছিল অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে। রসান দিয়ে কুমার বাহাদুর বলেন: তার আঙুলের নোখগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছিল এক একটা ধারালো ছোরার মতো—

হাসির গল্প, ভূতের গল্প, আফিং। সমস্ত শরীরটা সঙ্গতি আর শৃঙ্খলাহীন একটা বিসদৃশ মাংসপিণ্ড। কানের কাছে প্রতিদিন গীতা-পাঠের দুঃসহ অভিনয়। বিচিত্র। একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির জগতে যেন কৃত্রিম উপায়ে লোকটা বেঁচে আছে। মৃত্যুমুখী মানুষ নাভিশ্বাস টানছে অক্সিজেন টিউবের সহায়তায়!

কিন্তু রক্তে রক্তবীজেরা মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের সাধ্য কি তাদের বিনাশ ঘটায়! আজও স্বাভাবিক নিয়মে সবটা চলতে হঠাৎ আলোচনা বাঁক নিলে একটা।

কথাটা বলে বসলেন রাজা সূর্যনারায়ণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল। সাইনবোর্ডে তিনি নিজের নামের পাশে বসিয়েছেন—এল্‌-এম্‌-এফ্‌, ব্র্যাকেটে 'পি'। 'পি' মানে প্লাকৃড্‌—একথা তিনি নিজে বুঝিয়ে না দিলে কারুই বোঝবার উপায় নেই—বরং কোনো একটা বাড়তি উপাধি মনে করে গেঁয়ো লোক আরো বেশি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে।

ভৈরবনারায়ণ একটা হাই তুললে দশবার তুড়ি দেন ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল এল্‌-এম্‌-এফ্‌, ব্র্যাকেটে 'পি', আজ কিন্তু তিনিই রসভঙ্গ করলেন।

—একটা খবর শুনে এলাম হুজুর।

কুমার বাহাদুর তখন সবে ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পটা শেষ করে ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখতে চাইছেন ভয়ে তাদের কারুর গা দিয়ে ঘাম ছুটছে কিনা। এমন সময় ডাক্তারের এই অবান্তর কথাটায় তিনি ভ্রূকুটি করলেন।

ডাক্তার ঘাবড়ালেন না। কারণ খবরটা জরুরি। এতক্ষণ ধরে বলবার জন্যে তাঁর জিভ নিস্‌পিস্‌ করছিল, কিন্তু ভৈরবনারায়ণের গল্প বলবার তোড়ে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি আর কোনোখানে সুবিধেমতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

—তুরীদের একটা পঞ্চায়েত বসেছিল কালাপুখ্‌রিতে।

—কালাপুখ্‌রিতে তুরীদের পঞ্চায়েত!—এবারেও ভৈরবনারায়ণ ভ্রূকুটি করলেন, কিন্তু তার জাত আলাদা। এতক্ষণ ধরে ঝাঁপির মধ্যে যে সাপটা আফিঙের নেশায় ঝিমুচ্ছিল, সে হঠাৎ খোঁচা খেয়ে ফোঁস্‌ করে উঠল।

—ব্যাটারা ভয়ঙ্কর পাজী—আর ওই সোনাই মণ্ডল—চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভৈরবনারায়ণ: পঞ্চায়েত বসলেই একটা না একটা কুমৎলব বার করে ছাড়বে। কয়েকটাকে দিলাম—বি-এল্‌ কেসের আসামী করে ফাঁসিয়ে, তবু যদি একটু হুঁশিয়ার হয় ব্যাটারা। ওদের মাথাগুলো আবার বড় হয়ে উঠেছে দেখছি, ভালো করে ছাঁটাই করতে হবে আর একবার!—হিংস্র স্বগতোক্তিটা শেষ করে জানতে চাইলেন: কিন্তু পঞ্চায়েত কেন?

—কামারহাটির ডাঁড়ার জন্যে।

—বটে?

—আজ্ঞে হাঁ। ওরা ঠিক করেছে, তিন চারশো মানুষ কোদাল ধরে এবার ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করে দেবে—ওদিক দিয়ে আর জল বেরুতে দেবেনা।

—বটে—বটে!—কুমার বাহাদুরের স্বরে মর্মঘাতী ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল: হঠাৎ এ রকম সাধু সংকল্প কেন তাদের?

—সে তো তারা হুজুরে জানিয়েছে।

—হুঁ!—কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থেকে ভৈরবনারায়ণ বললেন, দরখাস্তটা আমি শুনেছি। ওরা বলে, বানের জল ওই ডাঁড়ার পথ দিয়েই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছে, ফলে ওদের ফসলী জমি ডুবে যায়।

—আজ্ঞে তা নেহাৎ অন্যায় বলে না—সাহসে ভর করে পোস্টমাস্টার বিভূপদ হাজরা জানালো। কালাপুখ্রির দিকে তার নিজেরও কিছু ধানী আধিতে আছে, তাই ক্ষতিটা তার গায়ে লাগছিল।

—আরে রাখো ওসব বাজে কথা—কুমার বাহাদুর চটে উঠলেন: তিন-চার কাঠা ধানী জমি ডুবলেও ডুবতে পারে, সেটা এমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার ক্ষতি কী রকম, সে জানো? ওই ডাঁড়া দিয়ে জল না নামলে আমার ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর বিল ভরবেনা—বছরে তিন হাজার টাকার জলকর বেমালুম বরবাদ। অমন বাজে আবদার করলে আমি শুনবনা—ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব—সংকল্পে ভয়াল শোনালো তাঁর গলা।

—কিন্তু ওরা তো বলে তিন চার কাঠা নয়, প্রায় তিন হাজার বিঘে জমির ফসল ওই ডাঁড়ার জলে নষ্ট হয়!—আবার দীনতম প্রতিবাদ ঘোষণা করল বিভূপদ।

—তার মানে? তাহলে কি তুমিই ওদের তাতিয়ে তুলছ?—মুহূর্তে সমস্ত চক্ষুলজ্জার আড়ালটা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট গলায় সরল প্রশ্ন করলেন ভৈরবনারায়ণ।

বিভূপদ এক মুহূর্তে মাটিতে মিলিয়ে গেল। হেলে সাপের মতো

নির্বিষ ভাবে একটু আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিল, এবারে যেন কেন্নো হয়ে গুটিয়ে গেল নিজের চারপাশে।

—ছিঃ ছিঃ—এটা কী করে বললেন হুজুর। এমন বেয়াদবী আমি কখনো ভাবতে পারি?

—কী জানি, কিছুই বলা যায় না—কুমার বাহাদুর হঠাৎ বিচিত্রভাবে দৃষ্টিটা রঞ্জনের নির্বাক মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন। আর তখনি রঞ্জন বুঝতে পারল। আসলে বিভূপদ তাঁর উপলক্ষ, লক্ষ্যটা অন্যত্র।

আফিংয়ের নেশায় ঝিমন্ত চোখ কি নিছক একটা ভান?

একবারের জন্যে বুকের ভেতরটা নাড়া খেয়ে উঠে পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল তার। আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই আর। পরন্তু কুমার বাহাদুর জয়গড়ের ব্যাপার নিয়ে একটা নিরাসক্ত মন্তব্য করেছেন, আজও বিভূপদকে সাবধান করে দিতে গিয়ে তার দিকে হয়তো বা বিনাকারণেই দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একটা। কিন্তু অনেক বলার চাইতে এই না বলা দৃষ্টির সংকেত অনেক বড় ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে, এ অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম হয়নি জীবনে।

তবু যখন কুমার বাহাদুর একটা ছলনার মুখোস টেনে রেখেছেন, তখন নিজেকেও সে সুস্পষ্ট করে ধরা দিল না। পরস্পরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে আরো কিছুক্ষণ ধরে না হয় চলুক না মৈত্রীর ছদ্ম অভিনয়। বাঁ হাতে ছোরা লুকিয়ে ডান হাতে করমর্দনের পর্ব।

রঞ্জন মাথা নাড়ল। কুমার বাহাদুরের দৃষ্টির উত্তরে মাথা নেড়ে জবাব দিলে, ঠিক।

আলোচনাটা আবার হয়তো শুরু হত পূর্ণোদ্যমে। একটা বক্সিং রিংয়ের ভেতর পরস্পরকে আঘাত করবার আগে চলত আরো খানিকক্ষণ সন্ত্রস্ত পদচারণা। কিন্তু ছেদ পড়ল হঠাৎ।

একজন হিন্দুস্থানী পাইক প্রবেশ করল ঝড়ের বেগে।

—হুজুর, জটাধর সিং খুন হো গিয়া!

—কেয়া!—চর্বির প্রকাণ্ড পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল একটা টেনিস বলের মতো: কেইসে খুন হুয়া? কোন্ খুন কিয়া?

—মালুম হোতা কি ই গোয়ালা আদ্মীকে কাম হ্যায়। সব্ একদম চক্‌নাচুর করকে জঙ্গল মে মুর্দা ফেক্ দিয়া—

—কাঁহা মুর্দা?—ভৈরবনারায়ণ গর্জন করলেন।

—লে আয়া—দেখিয়ে আপ—রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে পাইকটা।

—চলো—ভৈরবনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। এখনো মৌতাতের আফিং খাননি, চোখদুটো বাঘের মতো কপিশ আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠছে তাঁর।

চার

বেশ নিপুণ হাতেই খুন করেছে লোকটাকে।

অতবড় জোয়ান হিন্দুস্থানীটার পাথুরে মাথাটাকেও গুঁড়ো করে ফেলেছে বাজের মতো নিষ্ঠুর লাঠির ঘায়ে। বীভৎস বিকৃত মুখে রক্ত আর কাদার প্রলেপ। শুধু লাঠি নয়—দু চার জায়গায় টাঙ্গিও চালিয়েছে মনে হয়। বক্রফলক সেই ধারালো টাঙ্গির আঘাত হাঁ করে আছে ঘাড়ের ওপর। কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া যাবে না—এই সংকল্প নিয়েই জটাধর সিংকে খুন করেছে নির্মম ভাবে।

দৃশ্যটার পৈশাচিকতা কয়েক মুহূর্ত পাথর করে রাখল সকলকে। এ হত্যা যেন মানুষে করেনি, এই নিধনের ভেতরে কোথাও যেন চিহ্ন নেই মানবিক কোমলতার; স্তব্ধ কোনো রক্ত সমুদ্রের মতো 'বরিন্দের' বন্য মৃত্তিকায় এ যেন একটা প্রাকৃতিক-জিঘাংসা। যেন আচমকা ঝড়ের ঝাপটায় কোনো দিগন্ত-প্রহরী তালগাছ ধ্বসে পড়ে একটা মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার মতো—বুনো শূয়োরের দাঁতে কোনো ছিন্নোদর অপমৃত্যুর বিভীষিকার মতো। এদেশের মাটিতে এই মৃত্যুই যেন স্বাভাবিক, সব চাইতে যুক্তি-সঙ্গত।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। স্তব্ধতা চেপে রইল জগদ্দল-পাথরের মতো।

রঞ্জনই কথা বললে তারপরে।

—একটু ভুল হয়েছে বোধ হয়?

—কী ভুল?—এমন একটা দৃষ্টিতে ভৈরবনারায়ণ তাকালেন যে তার ব্যাখ্যা হয় না।

কিন্তু ও দৃষ্টিকে ভয় পাবার বয়েস তার কেটে গেছে উনিশশো

তিরিশ সালে। ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধিত চোখে তাকে গিলে খেতে চেয়েছিল ধনেশ্বর—বিপ্লবী যুগে সেই আই বি ইন্‌সপেক্‌টার। একটা ছোট বলের মতো হাতের ওপর লোফালুফি করেছিল ছয় চেম্বারের লোড্ করা রিভলভারটাকে—রাইডারের হিংস্র চামড়াটা বাতাস কেটেছিল তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দে।

সমান দৃষ্টিতেই রঞ্জন তাকালো ভৈরবনারায়ণের চোখের দিকে।

—বডিটা তুলে আনা উচিত হয় নি। পুলিশে খবর দিলেই ভালো হত।

—পুলিশ!—ক্রূর ভ্রূকুটি ফুটল ভৈরবনারায়ণের মুখে। তারপর মৃতদেহটার দিকে আগ্নেয় দৃষ্টি ফেলে বললেন, সে খবর একটা দিতে হবে বটে। কিন্তু ঃ একবার থামলেন, বললেন, ভাবছি এর শেষ কোথায়।

আবার স্তব্ধতা। কালান্তক ক্রোধে পাথর হয়ে রইলেন ভৈরবনারায়ণ।

—মুর্দা, বাবু?—সভয়ে জিজ্ঞাসা করল একজন।

—থাক ওখানেই। থানায় একটা খবর দিয়ে আয়। তারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুক। কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এবার।

পায়ের ভারী চটিটার শব্দ করে কুমার বাহাদুর ভেতরে চলে গেলেন।

রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করছিল রঞ্জন।

গুরুভার বই। লাল পেন্‌সিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে মার্জিনে নোট করে পড়তে হয়। কিন্তু আজ আর ওই তর্ক-তত্ত্বের অরণ্যে সে ঢুকতে পারল না। মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে, পড়তে পড়তে বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। বইয়ের পংক্তি হঠাৎ যেন ছন্দ-শৃঙ্খলা হারিয়ে একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ছে। অসম্ভব।

উঠে দাঁড়ালো সে। বাইরে কৃষ্ণা রাতের মধ্যযাম। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

তার ঘরখানা বিশাল বাড়িটার এক প্রান্তে। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির। পূজোর মরশুমগুলো ছাড়া এ মহলটা অনাদরেই ম্লান হয়ে থাকে। মাকড়শার জাল আর রাশি রাশি ঝুলে আবৃত হয়ে যায়, বাঁধানো বেদীর ফাটলে বর্ষার ডুবো মাঠ থেকে দু একটা গোখরো সাপ এসে বাসাও বাঁধে কখনো-কখনো। আর চাপ চাপ অন্ধকার-জড়ানো মণ্ডপের কোণায় আরো ঘন টুকরো টুকরো অন্ধকারের মতো চামচিকে ঝুলে থাকে—বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়, আর দিনান্তিক পাণ্ডুরতা চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে এলে কতকগুলো প্রেতসত্তার মতো কদাকার ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে সামনের আমবাগান আর নদী পার হয়ে কোথায় উড়ে যায় কে জানে!

নিজের নির্জন ঘরটিতে বসে বসে রঞ্জন এক একটা সন্ধ্যায় তাদের ডানার শব্দ শোনে। কী যেন একটা অদেহী অস্তিত্ব সঞ্চরমান অন্ধকারকে মুখর করে তোলে। মনে হয়ঃ দেবীসিংহের আমল, অথবা তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়িতে বসে যারা জমিদারী করেছে, তারা এখনো এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি: চাম্‌চিকে হয়ে যক্ষের মতো এ বাড়ির প্রতিটি ইট-পাথরকে চলেছে পাহারা দিয়ে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে পুরোনো অভ্যাসের তাগিদে তারা বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে, তারা চলে যায় গ্রামে গ্রামে—তমসার মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে—চাম্‌চিকে নয়—ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

হঠাৎ ভয় করে। মনে হয় তারও চারদিকে যেন চক্র দিয়ে ফিরছে এই চাম্‌চিকেরা। লণ্ঠনের বিমর্ষ হলুদে আলো পড়ে দেওয়ালে

—নতুন জিনিস দেখতে পায় একটা। পুরোনো বাড়ি, কতকালের পুরোনো এই দেওয়াল। তার গায়ে এলোমেলো ভাবে অজস্র শ্যাওলার বিসর্পিল সবুজ রেখা পড়েছে। ওই রেখাগুলো হঠাৎ যেন কতগুলো মুখ হয়ে ওঠে—যেন চামচিকের ডানার শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তারা। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কতগুলো মুখ—এই মুমূর্ষু প্রাসাদের তারা মৃত প্রতিহারীর দল। ফিস্ ফিস্ করে তাদের কথা বলবার শব্দও যেন স্পষ্ট কানে আসে—বাইরের আমবাগানে বাতাস মর্মরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, এই সহজ প্রত্যক্ষ সত্যটাকে যেন বিশ্বাস করা যায় না কিছুতে।

এই ভয়! একে ভাঙতে হবে। চুরমার করতে হবে এই প্রেত-পূজোর বেদীকে। ছাদভাঙা খানিকটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যের আঘাতে মিলিয়ে ছায়া হয়ে যাবে এই চামচিকেরা। আজও মানুষের মনের ওপরে এরা ভর করে আছে—প্রেতের ভর! আজও কুমার বাহাদুরের আটটা বন্দুক আর আটত্রিশজন পাইক পাহারা দিচ্ছে এই পিশাচতন্ত্রকে। কিন্তু কতদিন আর?

কতদিন আর? ঘরের দেওয়ালে সরীসৃপ মুখাকৃতিগুলির দিকে সে তাকালোনা—তাকালোনা সবুজ শ্যাওলায় আঁকা সেই বীভৎস প্রেতসত্তাগুলোর দিকে—উড়ন্ত চাম্‌চিকের পাখার শব্দ যাদের জাগরণের সংকেত। এখন অনেক রাত। জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূর্ব দিগন্ত; যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরে সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।

প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পিশাচ মন্দিরের পাথর ধ্বসছে। তুরীদের পঞ্চায়েত বসেছে কালা পুখরিতে। কামারহাটির ডাঁড়ার মুখে জল নামতে দিয়ে তারা আর

সর্বনাশ করবে না তিন হাজার বিঘে ফসলী জমির। জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর জলকর না ভরলেও তাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই —এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনো শূয়োর মারতে শিখছে—টুলকু সাঁওতালের ছেলে ধীরু সাঁওতাল ধানসিঁড়ির আল্‌পথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে 'ডুবা'র ঘোষেরা—বাজের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে লোহা-পেটা জোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা!

একটা ছবি মনে পড়ল হঠাৎ।

—হোই বাবু, সামাল!

সাইকেলে করে আসছিল। পেছন থেকে আবার ডাক এল: সামাল বাবু, সামাল।

কী ব্যাপার? এমন ভাবে সাবধান করে কে?

চারদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার কাছে।

চৈত্রের মাটি ফাটানো রোদে শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে চারদিকের বুক সমান উঁচু ইকড়, বেনা আর শন ঘাসের বন। সেই বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সাম্‌নে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে ধূ ধূ করে জলছে শুকনো ঘাস, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে আকাশে। যেন চারদিক থেকে একটা অগ্নিবৃত্ত আসছে ঘিরে ঘিরে।

—সামলে বাবু। আগুনের ভেতর গিয়ে পড়িস্ না।

সেই আগুনটা যেন আজও আসছে এগিয়ে। কিন্তু ঘাসবন নয়। দাবাগ্নি।

—মচ্—মচ্—মচ্

নাগরা জুতোর শব্দ। কাঁচা চামড়ার আওয়াজ। ওদিকের লম্বা

বারান্দাটা দিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে একটা লণ্ঠনের আলো। মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্রহরী। জমিদার বাড়ি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির শব্দ পাওয়া গেল, বারকয়েক শোনা গেল কুঁই কুঁই করে খানিকটা কাতরোক্তি। দারোয়ানের লাঠির ঘা খেয়ে একটা ঘুমন্ত কুকুর পালিয়ে গেল বারান্দা থেকে।

আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল নিশীথ দিগন্তের দিকে। একটা ভোঁতা ছুরির মতো তমসাস্তীর্ণ নদীটা বয়ে যাচ্ছে। ওপারের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড আলো—কারা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে যেন। ঠিক তারই ওপরে আকাশে একটা জ্বলজ্বলে প্রকাণ্ড তারা। ওই তারাটা থেকে খানিকটা আগুন মাটিতে ছিটকে পড়েই কি জ্বলে উঠেছে অমন দাউ দাউ শব্দে?

নক্ষত্রের আলো, না আগামী দিনের সংকেত? আকাশের সীমান্তে সীমান্তে যেন ভবিষ্যৎ দিনের প্রত্যাশা। কোথা থেকে কি দলে দলে মানুষ মশাল হাতে আসছে এগিয়ে? পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—প্রতিটি প্রান্ত থেকে পদক্ষেপ করেছে মশালধারী সৈনিকের দল। আসছে—এগিয়ে আসছে।

আচ্ছা—ওই দিকে, নদীর ওপারে ওই অগ্নিকুণ্ডটার কাছাকাছিই কোথাও কি গোয়ালাদের সেই গ্রাম নয়? সেই গ্রাম—যেখানে লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে জটাধারী সিংয়ের মস্ত শক্ত মাথাটা? আর শুধু তারই মাথা নয়—সে চোটটা সোজা কুমার ভৈরবনারায়ণেরও ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে?

হ্যাঁ—ওদের দেখেছে রঞ্জন। বরিন্দের আরণ্য-মৃত্তিকায় চিনেছে আর একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকে। মাথা নোয়ায় না—হার মানতে জানে না। খোলা মাঠ আর খোলা হাওয়ায়, পোষা মহিষের ক্ষীরের মতো ঘন দুধ

খেয়ে খেয়ে দরজার কপাটের মতো চওড়া তাদের বুক, প্রতিটি পাঁজর লোহার আগল। 'শাল-প্রাংশু মহাভুজ' আর পুঁথির জগতে বেঁচে নেই, তা নেমে এসেছে জনগণের পৃথিবীতে,—পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবান বিপুল সত্তা আজ ওদের মধ্যেই সার্থক হয়েছে—পেয়েছে সর্বোত্তম পূর্ণতা।

আগে ঘর ছিল পশ্চিমের মাটিতে। রক্তের মধ্যে কোন্ আদিম যাযাবরী প্রেরণায়, কোন্ জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম-নগর-নদী-পাহাড়-বন পেরিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে। কিন্তু শুধু বাসাই বাঁধেনি—শক্ত করে শিকড় মেলেছে মাটিতে—সাঁওতালদের মতো সহজে উৎপাটিত হয়ে যাবে এমন শিথিল মূল নয় এদের। হাতে এদের দশ থেকে বারো হাত পর্যন্ত লম্বা লাঠি; তার গিঁটে গিঁটে পিতলের তার জড়ানো, বছরের পর বছর সর্ষের তেলে পাকানো। লোহার মতো তা দৃঢ় আর নির্মম—তার দণ্ড চরম দণ্ড।

রঞ্জনকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঘোষেরা।

অদ্ভুত ভাষা বলে। খানিকটা ভাষা হিন্দী, খানিকটা বাংলা। কিছু কিছু সাঁওতালী আর ওঁরাওঁ ভাষার খাদ তার সঙ্গে। রঞ্জনের মনে হয়েছিল বেশ চমৎকার একটা সর্বজনীন ভাষা তৈরী করে ফেলেছে এরা—রাষ্ট্রভাষার সমস্যা ফেলেছে মিটিয়ে।

—ঠাকুর বাবু, নমস্তে।

—নমস্তে। কী খবর তোমাদের ?

—খবর খুব আচ্ছাই।—ঘোষেদের মুরুব্বি যমুনা আহীর বলেছিল ঃ লেকিন থোরা থোরা গণ্ডগোল হচ্ছেন।

—কী গণ্ডগোল হচ্ছেন আবার ?

—বলছি ঠাকুর বাবু। আপনি আচ্ছা আদমি আছেন, আপনি সমঝাবেন। তো আগে আসেন, একটু তামাকু খেয়ে যান।

—আমি তো তামাক খাই না।

—তো ভি আসেন—বসেন একটু—আবার অভ্যর্থনা করল যমুনা আহীর।

আমন্ত্রণটা আর উপেক্ষা করা গেল না। তা ছাড়া পথ চলতে চলতে সেও ভারী ক্লান্তি বোধ করছিল। সারাটা সকাল এক নাগাড়ে কড়া নগ্ন রোদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করেছে সে—শরীর যেন বইছিল না। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না—মনের ভেতর থেকে এই জাতীয় একটা তাগিদ ঠেলে উঠছিল বার বার।

তাকিয়ে দেখল আহীরদের বাথানের দিকে। একজোড়া নিমগাছ। এই টিলাটার ওপর ভারী স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছ দুটো ওরাই লাগিয়েছে সম্ভব—নইলে লাল মাটির এই দেশে এমন করে প্রাকৃতিক খেয়ালে নিমগাছ জন্মায় না। কিন্তু নিজেরাই লাগাক আর মাটির খেয়ালেই হোক্—এই রোদের মাঝখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়া যেন একটা মরুদ্যানের আভাস বয়ে আনে। সেখানে খানদুই দড়ির খাটুলি পাতা। ইচ্ছে করল ওই খাটুলিদুটোর ওপরে সেও খানিকটা গড়িয়ে নেয়।

খাটুলিতে এসেই বসল। যমুনা আহীর তাকে বসিয়ে ঘরে ঢুকল, তার একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে—স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন সর্বাঙ্গে প্রখর হয়ে জেগে আছে তার। সুডোল নিখুঁত হাতে মোটা রূপোর বালা, কিন্তু সে বালা অলঙ্কার নয়—অস্ত্র। তার একটি ঘা লাগলে যে কোনো দুর্বিনীত লোভী মানুষের মুখ চোখ ভোঁতা হয়ে যাবে চক্ষের নিমেষে। উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি—সারা শরীরে তার রূপ আছে কিনা কে জানে কিন্তু বরেন্দ্র ভূমির জ্বলন্ত রৌদ্র যে বিচ্ছুরিত হয়ে আছে সন্দেহমাত্র নেই তাতে।

যমুনা আহীরের মেয়ে। ঝুম্‌রি।

চকচকে রূপোর বালা পরা নিটোল হাতে কাঁসার গ্লাস বয়ে এনেছে। রঞ্জনের সামনে ধরে বললে, পীজিয়ে।

—কী এ?

যমুনা এসে বললে, ওটুকু খেয়ে লিন্ ঠাকুরবাবু। দুধ আছেন।

—দুধ! দুধ খাবো?

হা হা করে হেসে উঠল যমুনা আহীর—মাঠের মধ্য দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল হাসিটা। বললে, দুধ তো পিবারই জন্যে। দেখবার জন্যে না আছেন।

মুক্তা-ধবল দাঁত বের করে হাসল ঝুম্‌রি। নিটোল হাতে গেলাসটি আরো কাছে এগিয়ে এল। আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

খাঁটি মহিষের দুধ। মৃদু জ্বাল পড়ে তাতে সঞ্চারিত হয়েছে আরো খানিকটা সুমিষ্ট আস্বাদ। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সে। মনে হল, সে শুধু দুধই খেল না, তারও সর্বদেহে যেন 'বরিন্দের' মাঠ থেকে আহরিত হল 'জল-বাতাস-রৌদ্র-স্বাস্থ্য';—কোনো পূর্ণ জীবনের একটা তরঙ্গ ভেঙে পড়ল তারও রক্তের গভীরে।

গ্লাসটা ঝুম্‌রিকে ফিরিয়ে দিলে। তারপর তাকালো যমুনা আহীরের দিকে।

—এইবার তোমার কথা শুনব ঘোষ। কী গণ্ডগোলের কথা বলছিলে?

যমুনা আহীর বললে, হামারা ঘী দহি তৈয়ার করি। সে সব কি বিনা পয়সায় বিকবার জন্য?

—কে বলেছে বিনা পয়সায় বেচবার জন্য?

—কে বলবে আবার?—যমুনার মুখের চেহারাটা বিকট হয়ে উঠল:

জমিদার বলে। পাইক-পেয়াদারা বলে। একদম জেরবার করে দিচ্ছেন ঠাকুরবাবু।

চারদিকে রোদে-ধোয়া বরিন্দের মাঠ। অপরিমিত আলো, অপরিসীম প্রাণ। হু হু করে হাওয়া বইছে। দূরে-কাছে ঘাসবনের মধ্যে পাহাড়ের নীল রেখার মতো পিঠ তুলে জেগে আছে অতিকায় সব মহিষ—বিরাট বিরাট তাদের শিংগুলো রোদে ঝকঝক করছে। ওই শিংগুলো দেখে ভয় করে। আরণ্য-প্রকৃতির শাসনের মতো যেন উদ্যত আর উদ্ধত হয়ে আছে।

সব কিছু মিলিয়ে নিজের মধ্যেও যেন কী একটা সঞ্চিত হয়ে থাকে। কেমন একটা ধারালো উত্তাপ ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকায় রক্তে। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাওয়া যায়না, তবু মনে হয় সেই রোদের ছোঁয়ায় অতসী কাচের প্রতিফলকের মতো জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। মনে হয়, হাতে একটি অস্ত্র থাকলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেও নরহত্যা করতে পারে!

রঞ্জন বললে, জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের ওপর?

—জমিদার ফের কবে হামাদের মাথায় তুলে রাখে?—বিকট মুখে একটা তিক্ত হাসি হাসল যমুনা আহীর: খাজনা যা ল্যায়—সেটা তো দিচ্ছিলাম। কিন্তু পাইক আসবে—পাঁচ হাঁড়ি দহি লিয়ে যাবে; কাল পেয়াদা আসবে তো ও ফের পাঁচ সের ঘী লিয়ে যাবে। হামরা তবে কী বিচ্‌বার জন্তে এখানে বাথান করে বসে আছি?

—তোমরা গিয়ে নালিশ করোনা কেন?—প্রশ্নটা নিজের কানেই ব্যঙ্গের মতো শোনালো। তবু জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জন। কেমন সংস্কার হয়ে গেছে। দেবতায় বিশ্বাস না থাকলেও ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় সিঁদুর মাখানো থান দেখলে যেমন আপনা থেকেই মাথায় হাত

উঠে আসে, তেম্‌নি। ফল হবেনা জেনেও একবার প্রার্থনা-নিবেদন।

—শুধু একবার নালিশ? হাজার বার করেছি।—যমুনা বললে, কী হইল? কিছুই না। উল্‌টে হামাদের হাঁকিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটারা ঝুটমুট বলছেন—যমুনা আহীরের মুখের ভেতর দাঁতগুলো ক্রোধে কিড়মিড়িয়ে উঠল: জমিদারবাবুদের অমন হাতীর মতন গতর হয় কেমন করে? এমন মোটা হয় কেন? মুফত্‌ হামাদের দহি-ঘী না খেলে অমন হয় ঠাকুরবাবু?

কেবল দই-ঘিই নয়—ওই মেদস্ফীত স্বাস্থ্যের পেছনে যে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস—একথা রঞ্জনের মনে এল। ভৈরবনারায়ণ আফিং খান আর ঝিমোন। কিন্তু সেই ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে থাকে কোথায় ছোঁ দিয়ে পড়বেন তারই সুযোগ সন্ধানে; বরিন্দের মাঠে তালগাছের মাথার ওপরে বসে থাকা ঝিমন্ত শকুন যেন।

দুধের গ্লাস নিয়ে ঝুমুরি ভেতরে চলে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে এল। হাতে হল্‌দে ন্যাকড়া জড়ানো ধূমায়িত একটা ছোট কল্‌কে। ধোঁয়াটার উগ্র দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস মুহূর্তে আবিল হয়ে উঠল। গাঁজা।

যমুনা আহীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভৎর্সনাভরা চোখে তাকালো ঝুম্‌রীর দিকে।

—আঃ, এখন কেনো লিয়ে এলি!—যা—এখন রেখে দে—

রঞ্জন বুঝতে পারল। তাকে দেখে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে যমুনার। ঠাকুর-বাবু সাত্ত্বিক লোক—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত; তাঁর সামনে গাঁজার কলকেতে টান দিতে সংস্কারে বাধছে।

রঞ্জন অভয় দিয়ে বললে, খাওনা—লজ্জা কি!

অত্যন্ত অপরাধীর মতো হে হে করে সংকুচিত হাসি হাসল যমুনা। বললে, হামরা ছোটলোক ঠাকুরবাবু, একটু নেশা-ভাং না করলে হামাদের চলেনা—

রঞ্জন হাসল : তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই, অনেক বড়লোক আর বাবুলোক তোমাদের চেয়ে নেশায় ঢের বেশি ওস্তাদ।—তার মনে পড়ল মুকুন্দপুরের উকীল তরণীবাবুর কথা। নেশায় তিনি এমনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন যে মদ, আফিং, এমন কি মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শনে পর্যন্ত তাঁর আমেজ আসত না। অগত্যা সেই আমেজ আনবার জন্যে একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ঝাঁপিতে পুরে পুরে তিনি গোখরো সাপ পুষতেন। সাপুড়ের নির্বিষ মুমূর্ষু সাপ নয়—তাজা, হিংস্র, তীব্র বিষধরের দল। যখন শরীরের ভেতরে অবসাদ জমে উঠত, মন্থর হয়ে যেত রক্তের গতি—দাবী করত স্নায়ুতে স্নায়ুতে অস্বাভাবিক খানিকটা উদ্দীপনা, তখন এই গোখরোর ঝাঁপির ভেতরে হাত দিয়ে তাদের একটি ছোবল নিতেন তরণীবাবু। আর সেই বিষে সারাটা দিন তিনি ঝিম মেরে থাকতেন—বিষের উগ্র যন্ত্রণা তাঁর শরীরে সৃষ্টি করত নেশার একটি স্বর্গীয় আমেজ। রৌদ্রোজ্জ্বল 'বরিন্দের' মাঠের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মন যেন একটা দার্শনিকতায় ভরে উঠল। শুধু তরণীবাবুই নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে এই সাপের বিষের নেশা। বিষধরের ছোবল নিয়ে নিয়ে আমেজের মধ্যে তলিয়ে থাকা, এক জাতীয় উন্মাদনায় স্নায়ুকুণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা। কুমার ভৈরবনারায়ণ! আরো অনেক কুমার বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, মিল-মালিক। কিন্তু তারপর? এমন কোনো সাপ নেই কি—যাকে নিয়ে শুধু নেশা-নেশা খেলাই চলেনা? অমোঘ যার বিষ—যে নেশার ঘোর কখনো ভাঙবেনা আর?

আছে বৈ কি। ধানসিঁড়ি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সিঁথির রেখার মতো পথ। সেই পথে শাদা ধূলোর একটা হাল্‌কা আস্তর বিছানো। রাত্রিতে যখন আকাশে চন্দন মাখিয়ে চাঁদ ওঠে—তখন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া সেই ধূলোভরা ফালি পথের ওপর খেলা করতে বেরিয়ে আসে তারা। পথের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কিলবিল করে ছুটোছুটি করে, জড়াজড়ি করে পরস্পরের সঙ্গে। অপরিণত ক্ষুদ্র ফণাগুলোকে বাতাসের দিকে সমুদ্যত করে যেন বিষসঞ্চয়ে পুষ্ট করে নিতে চায়। তারপর : তারপর পথের ওপর কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন বাজে—ধানসিঁড়ির কোনো একটা শেষপ্রান্ত থেকে একটি হাল্‌কা ছায়া দীর্ঘায়িত হতে হতে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে মাঠের ফাটলে, অধুনা-স্বর্গীয় কোনো কাঁকড়ার বর্ষায় করা গর্তে অথবা বাস্তুহারা কোনো মেঠো ইঁদুরের আস্তানায় মিলিয়ে যায় তারা।

কিন্তু আর কতদিন কেবল ছায়া দেখে ভয় পাবে তারা—আর কতকাল শব্দ শুনে লুকিয়ে যাবে গর্তের আড়ালে ?

ঘোর ভাঙল তার।

যমুনা গাঁজার কল্‌কে নিয়ে টান দিয়েছে, আর সেই সুযোগে এই মানস-মন্থনের পালা শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণ পরে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশা করেই যেন সে তাকালো যমুনার মুখের দিকে। খানিকক্ষণ আমেজে বুঁদ হয়ে থাকার পরে যমুনা মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। দুর্গন্ধ খানিকটা পিঙ্গল কুয়াশা মাঠের উত্তাল হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—আরো একটা জরুরী কথা আছে ঠাকুরবাবু—

কল্‌কেটা নামিয়ে রেখে যমুনা তাকালো। দেখা গেল দুপুরের কড়া

রোদের সঙ্গে গাঁজার তীব্র নেশার ঝাঁজ মিশে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে যমুনার মধ্যে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছে চোখদুটো—ঠেলে-ওঠা চোখের রক্তবাহী ছোট ছোট শিরাগুলি স্ফীত হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করছে!

—কী জরুরী কথা?

—আমাদের জেনানাদের লিয়ে কী করব ঠাকুরবাবু?

—কেন, তাদের আবার কী হল?

—নজর লাগছে।—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে যমুনা আহীর।

হঠাৎ যমুনাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হল। তার বাথানের মহিষগুলোর মতোই কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ডশরীর—ন্যাড়া মাথা, দৃষ্টিতে একটা ক্ষিপ্ত জিঘাংসা।

—সে কী, কার আবার নজর লাগল?

—যার নজর লাগে!—যমুনা এমন তীব্র ভয়ঙ্কর ভাবে রঞ্জনের দিকে তাকালো যে মনে হল বুঝি তারই মধ্যে যমুনা আহীর তার উদ্দিষ্ট সেই প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটার ভ্রূরেখা প্রায় নেই বললেই চলে, আর অনেকটা সেই কারণেই হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতা হারিয়েছে তার চোখ থেকে। কোনো বুনো জানোয়ার বুঝি থাবা পেতে বসেছে রঞ্জনের কাছে। একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত উত্তাপের মতো ছোঁয়া দিচ্ছে তার গায়ে: ওই শালা পেয়াদার দল। খালি কি দহী-ঘী লিতে আসে? শালাদের মতলব বহুৎ 'বুঢ়া'—ঠাকুরবাবু।

—বটে!

—হামাদের জরু বেটীর দিকে বহুৎ খারাপ নজর দেয়। খারাপ বাতচিত করে। এতদিন সয়ে গেলাম হামরা।—যমুনার চোখ আদিম হয়ে উঠল: সেদিন মাঠের মধ্যে ঝুমরীর হাত ধরেছিল। ঝুমরি হাতের বালার এক ঘা দিয়ে শালার মুখ ফাটিয়ে পালিয়ে এসেছে।—হঠাৎ ক্রোধে

রোঁয়া ফোলানো 'ভামের' মতো সোজা হয়ে উঠে বসল যমুনা আহীর : হামি থাকলে কেবল মুখ ফাটিয়েই পালাতে পারত না—জান ভি মাঠের মধ্যে রেখে যেতে হত।

অভিভাবকের একটা বিজ্ঞ ভঙ্গি নিয়ে রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, ওসব খুন খারাপির কথা ভাবতে নেই।

—হামরা ভাবিনা বাবু—এবার আর ঠাকুরবাবু বললে না যমুনা। ক্রোধে-ক্ষোভে ওই জমিদার বাড়ি সংক্রান্ত মানুষগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার অনুভূতিও তার মনে জেগে নেই আর। গাঁজার কল্‌কেটাকে উবুড় করে ঢেলে দিতে দিতে যমুনা বললে, হামরা ভাবিনা। কিন্তু খুন চড়ে যায়। দহি ঘী বিনা পয়সায় লিয়ে যায় —লেও বাবা। ফের ইজ্জতে হাত দিতে চায়?—যমুনা ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে বোধ করি জমিদার বাড়িটাকে একবার দেখে নিতে চাইল : হামরা জাতে আহীর বাবু। হামাদের বাপ্‌ঠাকুর্দা ছিল জোয়ান —ছিল ডাকু। কথায় কথায় জান লিত তারা।

তারা নিত, তাদের বংশধরেরাও আজ নিতে পারে—যমুনার শরীরে যেন এই সত্যটিই ব্যক্ত হয়ে উঠল। রঞ্জন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনের মধ্যে জিনিসটা গোপন পাপের মতো বিঁধছে—সে কুমার ভৈরবনারায়ণের অন্নপুষ্ট। তাই যমুনা তাকে মেনে নিতে পারছে না কোনো আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায়; খানিকটা পরিমাণে কাছে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করে নামতে পারেনি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপরে। এমনি এক একটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে কেমন ত্রিশঙ্কুর মতো মনে হয় তার। শূন্য আকাশে যে বেশিক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবেনা তা সে জানে। কিন্তু নিচে পা দিয়ে দাঁড়ানোর মতো মাটিও কি সে খুঁজে পেয়েছে?

রঞ্জন উঠে পড়ল বললে, আজ চলি যমুনা, আর একদিন আসব।

—কিন্তু হামরা কী করব বাবু?

যমুনা জানতে চাইল। রঞ্জন ঠিক উত্তর দিতে পারল না। মনে হল, প্রশ্ন করবার আগেই যেন যমুনা নিজের ভেতরেই কর্তব্যটাকে নিশ্চয় করে নিয়েছে।

—যা ভালো মনে হয় তাই কোরো—

এর বেশি আর কী বলা যায়? ধানসিঁড়ি ক্ষেতের আল্‌পথে বিষ সঞ্চয় করে ফিরছে নাগশিশুরা। তাদের বিষফণাকে কে রোধ করবে? কোনো উপদেশ—কোনো সদিচ্ছাকে মনে হবে ভণ্ডামির মতো—স্বার্থপর প্রবঞ্চনার মতো।

—আচ্ছা চলি—

রঞ্জন বেরিয়ে পড়ল। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার মেয়ে ঝুমরি। নাগিনী।

…রঞ্জনের চমক ভাঙল। কত রাত হয়ে গেছে। ঘুমন্ত জমিদার-বাড়ি—নাগরা জুতোর মচ্‌মচানিও শোনা যাচ্ছে না আর। প্রেত পিতৃ-পুরুষেরা কোথায় রক্ত শুষে বেড়াচ্ছে কে জানে! জটাধর সিংহের খুন কি হিসেব নিকেশের প্রথম অঙ্কপাত!

না, আর নয়। শুয়ে পড়া যাক এবার।

পাঁচ

একটা মস্ত গড়খাই—প্রায় বুজে এসেছে। কলমীবন আছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢোঁড়া সাপ ডুব-সাঁতার কাটে শ্যাওলা ভরা কালো জলের তলায়। গলা উঁচু করে ঘোরে পানকৌড়ি—দূর থেকে কেউটের ফণার মতো দেখায়। পানও নেই, কড়িও নেই—গোটা কতক গেঁড়ি-গুগ্‌লি আর এক-আধটা পদ্মচাকাই ভরসা।

গড়খাই পেরিয়ে একটা উঁচু মিনারের ধ্বংস স্তূপ। লোকে বলে 'বুরুজ'। 'পাল বুরুজ'। হয়ত অবজারভেটরী ছিল পালরাজাদের আমলে। হয়তো এর সমুচ্চ চূড়োয় দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় মহীপাল দেখেছিলেন —দিব্যোকের বিদ্রোহী বাহিনীর মশাল রক্ত-জবার মতো ফুটে উঠছে কালান্তক অন্ধকারে।

পাল-বুরুজ ছাড়িয়ে কিছু কাঁটা বন, লাটার ঝোপ। তলায় তলায় বিকীর্ণ ইঁট-পাথরের কঙ্কাল। বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থি-শেষ। নক্‌সা-কাটা ইট, খোদাইকরা গ্রানিট্‌ আর কষ্টি পাথরের টুকরো। তারপরে আবার গড়খাইয়ের বৃত্তাকার রেখা। সেইটুক পেরিয়ে বুনো ওল আর ঘেঁটু ফুলের একরাশ জঙ্গল ভাঙলে পালনগর শুরু।

নামেই পালনগর, কিন্তু পালেরা কেউ নেই। দেড়শো ঘর পরাক্রান্ত পাঠানের বাস এখানে। উচ্চারণ করে "পায়ঠান"—'ঠ'এর ওপর অস্বাভাবিক জোর দেয় একটা। হয়তো ওই জোরটুকু দিয়েই সেদিনের বীরত্বের জের টানতে চায় একটুখানি।

এই 'পায়ঠান'দের নেতা ফতেশা পাঠান। কালো কুচকুচে জোয়ান শরীর। মুখে পুরু গোঁফ, তার দুটি প্রান্ত দংশনোদ্যত কাঁকড়া-বিছের মতো উধ্বর্গামী। প্রসন্ন থাকলে সেই প্রান্ত দুটিকে তিনি পাকাতে

থাকেন—উত্তেজনার কারণ ঘটলে টেনে টেনে লম্বা করে যান। দাঙ্গা হাঙ্গামা কাজিয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। তিন চারটে দেওয়ানী লড়ছেন কুমার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে—ফৌজদারীও আছে। 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণীর দুর্দান্ত লোককে এনে বসিয়েছেন 'পাল বুরুজে'র উত্তরে এক খণ্ড পতিত জমিতে। নাম মাত্র খাজনা দেয়—লাঠি ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়। হাত খুব পরিষ্কার 'বাদিয়া'দের। হাঁসুয়ার কোপে এত সহজে মাথা নামিয়ে দেয় যে মুণ্ডহীন মানুষটা টেরও পায় না কখন সে নিঃশব্দে মরে গেল।

পালনগরের মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটি মসজিদ। লাল গম্বুজটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। সারাদিন তার ওপরে জালালী কবুতর চক্র দিয়ে ওড়ে। মিনারের গায়ে দলে দলে বাদুড় ঝুলে থাকে। অনেক কালের পুরোনো মস্‌জিদ। যে পাঠান ফকির গাজী হয়ে পালনগর দখল করেছিলেন, তাঁরই কীর্তি নাকি ওটা।

সমৃদ্ধ পাঠানদের গ্রাম এই 'পালনগরে' শতকরা নিরানব্বই জন মুসলমান। এতকাল ছোট একটি মাদ্রাসায় 'আলেপ-বে-পে' ছাড়া আর কোনো শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। ফতে শা পাঠান গত বছর একটি এম-ই ইস্কুল করেছেন এখানে। পাঁচ সাতজন মাস্টার এসেছেন গ্রামে— সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর আলোও এসেছে।

ফতেশা পাঠানের বৈঠকখানা ঘরে মজলিশ বসেছিল। রবিবারের সকাল—ইস্কুল ছুটি। ফতেশা স্বয়ং আছেন, একজন মাস্টারও এসে জুটেছেন। তা ছাড়া দৈনন্দিন আগন্তুক জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি তো আছেনই।

সামনে একখানা খবরের কাগজ। তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা দানা বেঁধে উঠেছে।

কথা বলছিলেন আলিমুদ্দিন। পাবনা জেলার লোক—আই-এ পাশ করে নানা জায়গা ঘুরবার পর ইস্কুলের মাস্টারী নিয়ে এসেছেন।

আলিমুদ্দিন বললেন, এ বড় আফ্‌সোসের কথা, এখনো পাকিস্তান বোঝেননা আপনারা।

এস্তাজ আলী পাঠান কারবারী লোক। বয়স্ক ব্যক্তি। হাট-বাজারের উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, ব্যবসায় উপলক্ষ্যে নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মেশামেশি আছে। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝ্‌বনা কেন! নানা রকম কথাই তো শুনছি। শহরে দেখলাম ছোকরারা এরই মধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আপনি একটু খোল্‌সা করে বলুন দেখি মাস্টার সাহেব?

আলিমুদ্দিন নড়ে চড়ে বসলেন: আসল কথা, আমরা আর ওদের সঙ্গে থাকব না।

—কাদের সঙ্গে?—এস্তাজ আলী প্রশ্ন করলেন।

—কাদের আবার? কাফেরদের।

—হিন্দুদের বলুন।—এস্তাজ আলী শুধরে দিলেন।

—ও একই কথা—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বক্র দৃষ্টি এস্তাজ আলীর মুখের ওপর ফেলে বললেন, কাফের আর হিঁদুতে কোনো তফাৎ নেই। তারা পুতুল পূজো করে, হাজার কুসংস্কার মানে, এক জাত এক জাতকে ছুঁলে তাদের নাইতে হয়। তা ছাড়া তারা ইস্‌লামের শত্রু। কাফের কথার আর কী মানে থাকতে পারে এ ছাড়া!

একটা মস্ত তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া খাচ্ছিলেন ফতেশা পাঠান। চোখদুটো বোজাই ছিল, আলোচনা শুনছিলেন খুব মন দিয়ে। নলটা ছেড়ে দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন একবার। সোজা হয়ে উঠে বসলেন

খানিকটা—দংশনোদ্যত বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে টেনে খানিকটা লম্বা করতে চাইলেন, তারপর :

—যা বলেছেন। ও সব ব্যাটাই হারামখোর। সবাই কাফের। আর সব চাইতে বড় কাফের হল হিজলবনীর ওই ভৈরবনারায়ণ।

এন্তাজ আলী সম্পর্কে ফতেশার চাচা, সেদিক থেকে খানিকটা দুঃসাহস তাঁর আছে। তেমনি হাসিমুখেই বললেন, তোমার সঙ্গে মামলা চলছে বলেই বুঝি?

—না চাচা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনারা সেকেলে লোক, বুঝবেনও না এসব। মাস্টার সাহেবই খাঁটি কথা বলছেন।

—বেশ বলুন, শোনা যাক।—এন্তাজ আলী দেওয়ালে গা এলিয়ে দিলেন। আলিমুদ্দিন অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—এসব বাজে তর্কের কথা নয়—যুক্তির জিনিস। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি। হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়া রাষ্ট্র আর নতুন তমদ্দুন তৈরী না করতে পারলে আমাদের কোনো আশা নেই।

—সেদিন এক মৌলবী সাহেব মস্‌জিদে 'ওয়াজ' করে গেলেন। তিনিও ওসব বললেন বটে—

ফতেশা পাঠান নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

—ওসব মৌলবী-টৌলবীর কথা ছেড়ে দিন।—আলিমুদ্দীন বিরক্ত হয়ে উঠলেন : কিছু বোঝে না, এটা বলতে ওটা বলে—সব মাটি করে দেয়। ধর্ম ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না। ধর্মের নিন্দা আমি করছি না, কিন্তু এ হল রাজনীতির ব্যাপার। সে যাক। কিন্তু এখনো যদি আপনারা হুঁশিয়ার না হন, তা হলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—কে সর্বনাশ করবে, হিন্দুরা?—এন্তাজ আলী বললেন, কেন, মুসলমানের কব্জীর জোর কি একেবারে মরে গেছে।

—ভুল হল চাচা সাহেব। কব্জীর জোরের দরকার আছে, কিন্তু একালে তাই সব নয়। রাজনীতির খেলায় হার হয়ে গেলে কোনো কব্জী আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। আর এই বেলাই কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

—কংগ্রেস? কেন কংগ্রেস কী দোষ করল? শুনেছি, এতকাল তো কংগ্রেস আজাদীর জন্যেই লড়াই করে আসছে। সে তো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী—এন্তাজ আলী আস্তে আস্তে বললেন।

—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী!—আলিমুদ্দিনের মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল: গোড়াতে 'কায়েদে আজমও' তাই ভাবতেন। এমন দিন ছিল যেদিন গান্ধীজীর ডান হাত ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু যেদিন প্রথম তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভাবতে চাইলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বরাতে জুটতে লাগল ঘৃণা, সন্দেহ, নিন্দা। গোড়াতে তিনিও মুসলিম লীগকে ভালো চোখে দেখেন নি, কিন্তু পরে বুঝলেন—মুসলমানের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে তা কংগ্রেস নয়, ওই মুসলিম লীগ।

—কিন্তু কংগ্রেস—

—চাচা সাহেব, এতকাল ধরে ওদের একটানা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা শুনতে শুনতে কংগ্রেস ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না!—আলিমুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: আজাদী! কংগ্রেস কোন্ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এসেছে এতকাল? হিন্দুর। আমরা পৌত্তলিকতা মানিনা, তবু কেন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, 'বন্দেমাতরম্'—মাটিকে মা বলব আমরা কোন্ লজ্জায়? কেন আমরা ভাবতে যাব: 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী?' বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি; দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে, তাদের সালাম করি আমি। কিন্তু কেন বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার সময়

কালীমায়ের পায়ে প্রণাম করতে হবে? কেনই বা শপথ নিতে হবে ওই পুতুলের খাঁড়া মাথায় ঠেকিয়ে?

ফতেশা পাঠান কী বুঝলেন কে জানে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, সাবাস!

আলিমুদ্দিন সরদার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেললেন তাঁর দিকে। তারপর এস্তাজ আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, চাচা সাহেব, ওটা মুসলমানের আজাদীর রাস্তা নয়!

—কিন্তু আজাদী এলে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কি তাতে সুরাহা হত না?

—না, একেবারেই না।—জোরের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ফরাসে একটা ছোট কিল বসালেন আলিমুদ্দিন: ইংরেজ দেশ ছাড়বে এটা ঠিক। তার আর বেশিদিন বাদশাহী চলবে না সে তা বুঝতে পেরেছে। একথাও মানি যে তাকে তাড়ানোর পেছনে হিন্দু আর কংগ্রেসেরও অনেকখানি দান আছে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন আসবে সে হবে ত্রিশ কোটি হিন্দুর স্বাধীনতা—দশ কোটি মুসলমানেরও না—কয়েক লাখ শিখেরও নয়। চাকরী-বাকরী, সুযোগ-সুবিধা সব জুটবে হিন্দুর ভাগে, মুসলমান পাতের কাঁটাটিও পাবে না। সেটা হবে হিন্দুদের জুলুমশাহী।

—এখন অবিশ্যি মুসলমানদের কিছু চাকরী-বাকরীর সুবিধে হচ্ছে—ফতেশা অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, ফাঁক পেয়ে এইবারে জুড়ে দিলেন কথাটা: নবীপুরের আলতাফ মিঞা এবারে এম, এল, এ হয়েছে, বিস্তর চাকরী জুটিয়ে দিচ্ছে লোককে।

—লীগ মিনিস্ট্রি রয়েছে যে। হিন্দু মন্ত্রীরা থাকলে হত নাকি ওসব?

—আজাদী হলেও তো লীগ মিনিস্ট্রি হতে পারে—বলতে চাইলেন এস্তাজ আলী।

—কাঁচা কথা বললেন চাচাসাহেব, একেবারে কাঁচা কথা আপনার মতো প্রবীণ লোকের কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করিনি। লীগ মিনিস্ট্রি হবে কোত্থেকে ? ভোট পাবেন কেমন করে ? তিনগুণ বেশি ভোটে হিন্দুরা গিয়ে বসবে গদীতে—আসবে জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট। একটা কথা বলবার মুখ থাকবে না আমাদের।

—কিন্তু যেসব জায়গায় মুসলমান বেশি, সেখানে তো আমরাই জিতব।

—এইবার পথে এসেছেন—আলিমুদ্দিন হাসলেন : খানিকটা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। কিন্তু দুটো একটা প্রভিন্সে মুস্‌লিম মেজরিটি নিয়ে আমরা যুঝব কী করে দেশজোড়া হিন্দুদের সঙ্গে ? তাই যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেই সব প্রদেশ নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—সে রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান !—আলিমুদ্দিনের গলার স্বর ক্রমশ উচ্ছ্বাসে গভীর হয়ে উঠতে লাগল : আমাদের হাত থেকেই ইংরেজ হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছিল, যদি এ রাজ্য ফিরে পাওয়া যায় তা হলে এর সবটাই আমাদের পাওনা ! কিন্তু নানা অসুবিধের কথা ভেবে সে দাবী আমরা তুলিনি। আমরা শুধু আমাদের মেজরিটি প্রভিন্স নিয়েই নয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। তাও কি কম হবে ! দশ কোটির মধ্যে অন্তত আট কোটি মুসলমানকে আমরা পাবই। আর তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। শুধু ইস্‌লামিক রাষ্ট্রই বা বলছি কেন—ইয়োরোপের কটা দেশে আট কোটি লোক আছে ? যে আরবেরা একদিন সারা দুনিয়ার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়েছিল, কত ছিল তাদের সংখ্যা ?

ফতে শা আরামে গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকাতে লাগলেন : বেশক্ !

এস্তাজ আলী চুপ করে রইলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে সারা মুখে : আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—কিচ্ছু শক্ত নয় বোঝা। শুধু বোঝবার মতো মনটাই তৈরী হয়

নি চাচাসাহেব! কিন্তু দিন আসছে, আপনারাও আর ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন না।

—আপনারা কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন—এস্তাজ আলী বললেন।

—স্বপ্নকে আমরা সত্য করে তুলব। মহম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজীও তাই করেছিলেন।—আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখমুখ জ্বলতে লাগল: এই স্বপ্নই একদিন আরব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল। থর থর করে কেঁপেছিল ইয়োরোপ, খ্রীস্টানেরা আর্তনাদ তুলেছিল, "God, save us from Turks !"

—কিন্তু একসঙ্গে কি থাকা যেত না?

—না।—আলিমুদ্দিনের স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল: সে কথা 'কায়েদে আজম' ভেবেছিলেন, আমাদের পাকিস্তানের মহাকবি ইক্‌বালও তাই ভেবেছিলেন। একদিন তিনি লিখেছিলেন:

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা!
আব রোদ্‌ এ গঙ্গা বহ্‌ দিন হ্যায় য়াদ্‌ তুঝকো,
উতরো তেরী কিনারোঁ মেঁ কারোয়াঁ হামারা।"

তারপর তাঁর ভুল ভাঙল। বুঝলেন, হিন্দুস্থান তাঁর কেউ নয়, গঙ্গার জলের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই তাঁর। তিনি বললেন, আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও কবিতা লিখেছিলাম আমি। কিন্তু এখন বুঝেছি, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি নেই। তাই ভুল শুধরে তাঁকে লিখতে হল:

"অয়্‌ গুল্‌সিতান্‌ এ উন্দুলুস্‌ বহ্‌ দিন হ্যায় য়াদ্‌ তুঝকো,
থা তেরী ডালীওঁ মেঁ জব আশিয়াঁ হামারা।
মঘরিব কী বাদীওঁ মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হামারী—
সারে জাঁহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা!"

দরদ ভরা গলায়, উচ্চকিত আবৃত্তি করে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। চমৎকার আবৃত্তি করেন—স্বরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা। উর্দু কবিতার ললিত-ছন্দ-বিন্যাসে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা আবিষ্ট হয়ে রইল।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ফতেশা প্রশ্ন করলেন, মানে কী হল ওর?

ধিক্কারের দৃষ্টি ফুটে উঠল আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখে: মুসলমানের ছেলে, এইটুকু উর্দু জানেন না! এটা লজ্জার কথা হল সাহেব!

ফতেশা থতমত খেয়ে গেলেন: কিছু কিছু শিখেছিলাম—তা কবে ভুলে গেছি। আমি তো আপনার মতো আর—

—একটু পড়ে নেবেন আবার। শেখা দরকার।—আলিমুদ্দিন খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আমি এবার উঠি—অনেক বেলা হল।

—কিন্তু আলোচনা তো শেষ হল না—এস্তাজ বললেন।

—না, সবে শুরু হল—এবার আলিমুদ্দিনও হাসলেন: আরো অনেক কথা বলতে হবে, আরো অনেক আলোচনা করতে হবে। ভালো কথা, আপনারা সবাই লীগের মেম্বার তো?

এক এস্তাজ আলী ছাড়া সবাই মাথা নিচু করলেন।

—আমি জানতাম—আলিমুদ্দিনের স্বরে অনুকম্পা ফুটে বেরুল: আচ্ছা, কাল আমি চাঁদার খাতা নিয়ে আসব। পাঁচশো পাঠানের গ্রাম এই পালনগরে লীগের শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে হবে একটা। আচ্ছা, চলি এবারে, আদাব।

—আদাব।

আলিমুদ্দিন মাস্টার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা বেড়ে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় গুঁড়ো চন্দনের মতো লাল মাটি উড়ছে দিকে দিকে। মিনারের মাথায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলোর

পেছনে একদল কাক লেগেছে, বাদুড়ের কুশ্রী চিৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে বিকৃত যন্ত্রণায়। একরাশ ধূলো আর কুটো-কাটি বয়ে একটা ঘুর্ণি পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

বর্ষার জল শুকিয়ে আসা মাটি থেকে কেমন একটা গন্ধ—একটা উত্তপ্ত গন্ধ। পাড়াগাঁয়ের লোক আলিমুদ্দিন মাস্টার—ওই গন্ধটা তাঁর চেনা। ওর কেমন একটা নেশা আছে—একটা মাদকতা আছে যেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে, ওই সামনের ঘূর্ণিটার মতোই চিন্তা-গুলোকে আবর্তিত করে তোলে। আলিমুদ্দিন মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ চললেন।

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা।' নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, নির্ভুল বিশ্বাস। এর আর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। দৃষ্টি চলে গেল 'পাল-বুরুজের' উইঢিবি ঘেরা উঁচু চূড়োটার দিকে। এই গড়ের হিন্দু রাজত্ব যেমন একদিন বিজয়ী মুসলমানের শাণিতাগ্র তলোয়ারে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিল—সেইদিন আবার ফিরে আসছে নতুন করে। 'পাকিস্তান হামারা!'

কোনো সন্ধি? না। কোনো রফা? অসম্ভব। কোনো ঐক্য? অবাস্তব।

কিন্তু এমন কি চিরদিন ছিল? চিরকালই কি এমন চরমপন্থী ছিলেন তিনি?

না, তা নয়। জীবনে তিনিও অনেক করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁরও হয়েছে। প্রথম প্রথম যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনামাত্র মনে হয়েছিল, আজ তারা ধরা দিয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্যের ভেতরে—আজ আর কিছু জানতে বাকী নেই তাঁর।

মনে আছে, হিন্দুদের ইস্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার কথা। যে বেঞ্চে

তিনি বসেছিলেন, সেখানকার তিন চারটি হিন্দু ছেলে খানিকবাদে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল।

ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টার সারদাবাবু। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই, কী হচ্ছে তোদের ?

—বসতে পারছি না।

—কেন ?

—ও যে মুসলমান স্যার !

—মুসলমান তো হয়েছে কী ?—সারদাবাবুর দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠেছিল।

একজন বলেছিল, ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ স্যার। একেবারে মুসলমানী গন্ধ।

হো—হো করে ক্লাশ শুদ্ধ হাসির বন্যায় ভেঙে পড়েছিল। সে হাসি থেকে সারদাবাবুও বাদ যাননি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—ক্লাশের মুসলমান ছেলেরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল।

সারদাবাবু কৃত্রিম ক্রোধে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যত সব বানরের দল ! যা—যা, সামনের ওই বেঞ্চিটাতে বোস গিয়ে।

সেদিন সারা ক্লাশে আর মাথা তুলতে পারেনি আলিমুদ্দিন। কিশোরের প্রথম চেতনায় সে অপমান বিঁধেছিল যেন আগুনের চাবুকে কণ্টকিত আঘাতের মতো। সেই কৈশোরেই মনে হয়েছিল, এ অপমানের জবাব একদিন তাঁকে দিতেই হবে।

তারপরে এ জাতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুবার তাঁর হয়েছে। আঘাতের পর আঘাত এসেছে নানাদিক থেকে—স্পর্শাতুর মন বিদ্রোহ করে উঠেছে বার বার। আরো বড় হয়ে একজন বিদেশী রাজনৈতিক নেতার জীবনচরিত থেকে তাঁর মনের সমর্থন মিলেছিল :

"নতুন একটি পরিষ্কার কোট পরিয়া আমি স্কুলে আসিয়াছিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে মলিন-বস্ত্র পরা জীর্ণ-শীর্ণ দেহ কয়েকটি ছাত্র আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া তাহাদের একজন আমার কোটের ওপর খানিকটা থুথু ছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল। সে ব্যবহারের অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই, আজ তাহা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গেছে।"

তিনি বুঝেছিলেন এ বড়লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি দরিদ্রের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। আর আলিমুদ্দিন বুঝলেন এ শ্রেষ্ঠতার অভিমানে অন্যের আত্মমর্যাদায় নিষ্ঠুর আঘাত। এ আঘাত একদিন সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে—তাঁর মন ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু তখনো তাঁর ভুল সম্পূর্ণ কাটেনি। তখনো তিনি ভেবেছিলেন, সে মর্যাদা ফিরে পাবার পথ সকলের ভেতর দিয়েই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে কৈশোরেই জ্বলে উঠেছিল—উনিশশো তিরিশ সালের আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষবার তাঁর ভুল ভাঙল।

আলিমুদ্দিন মাস্টার চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন একবার।

উনিশ শো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' জয়ধ্বনিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে। তিন রঙা পতাকার সবুজ-সংকেত তাঁকে সেদিন দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেদিন তিনিও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন :

"ইসি ঝাণ্ডেকো নীচে নির্‌ভয়,
বোলো ভারত মাতা কী জয়!'

'ভারত মাতা কি জয়!' সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ড বলেই মনে হয়নি সেদিন। 'সুজলাং

সুফলাং সুখদাং বরদাং' মাতৃকামূর্তি সেদিন দীপিত ছিল দৃষ্টির সম্মুখে। সে ভারতবর্ষের পূজা-মণ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিলঃ 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী'—

কিন্তু তারপর? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্বুদ মায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলিতে পরিয়ে দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই চন্দন-চিহ্নকে সেদিন মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টীকা।

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অস্ত চাঁদের আলোয় চিক চিক করে। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠে—মনে হয় মন্ত্রোচ্চার উঠছেঃ 'মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। জ্যোৎস্নাঝকিত কালো ছায়া-ফেলা দীর্ঘকায় তালবীথি সারা রাত মর্মরিত হয়। দূরে আলোর মালা পরে রাত্রির অপ্সরী কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে—উৎসব-শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া কোনো সালঙ্কারা নর্তকী যেন।

বাতাসে শীত ধরে। তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখা যায়ঃ একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়ছে। বৃশ্চিক রাশি ধীরে ধীরে একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ক্রমে পাণ্ডু হতে থাকে। সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। পুলিশ আসবে—লাঠি আসবে, প্রিজন্ ভ্যানের খোলা দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে হাত বাড়িয়ে।

নিদ্রাহীন চোখে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কী যেন জ্বলতে থাকে। ঠিক জ্বালা নেই—অথচ আশ্চর্য আগ্নেয় অনুভূতি আছে একটা। ঘুম আসে না, তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে। কন্যাকুমারীর প্রান্তরেখা থেকে সমুদ্রের সফেন জলে স্নান সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন মহাভারতী; সিংহল তাঁর

পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটি রক্তকমলের মতো, সিন্ধুশীকরলিপ্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল কারাকোরাম-শিবালিক থেকে খাসী-জয়ন্তীর বেণীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অবধি। দক্ষিণকর প্রসারিত করে তিনি আরব-সমুদ্রের এলিফ্যাণ্টা থেকে প্রার্থনা করে নিলেন ত্রিশীর্ষ মহাকালের বরাভয়, বামকরের নীবার-মঞ্জরী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিলে গঙ্গাহৃদি শ্যামল বাংলার। উন্নত-কিরীটের তুষারশীর্ষে সৌরদীপ্ত স্বর্ণলেখা জ্বলতে লাগল, আকাশ থেকে আরাত্রিকের রাশি রাশি দেবধূপ নেমে এল কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জের মতো।

তারপর ছয়মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন। কিন্তু—

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন আর একজন সহকর্মী—হৃষীকেশবাবু।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ির বাইরের লনে ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছিল। হৃষীকেশ বললেন, তোমার বাবাকে একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমরা এসেছি।

ছেলেটি ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গিয়েছিল তার উৎসাহিত গলার স্বর: মা, মা, একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করে সেটা আর বোঝাতে হয়না। অপমানে কানদুটো জ্বালা করে উঠল, শরীরের সমস্ত রক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল মুখের প্রতিটি রোমকূপে।

হৃষীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাসলেন। যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমানুষ!

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে!—প্রাণপণে কাষ্ঠহাসি হাসতে হল আলিমুদ্দিনকে। মনে পড়ে গেল সারদাবাবুর ক্লাশে সেই অভিজ্ঞতা: ওযে মুসলমান স্যার!

এক আধটা নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি। সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে।

হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বটা দানা বেঁধে উঠেছিল একটু একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের জন্যে সব কিছু সমর্পণ করে বসে আছেন। তাঁর মা 'হরিজন পল্লীতে' নাইট-ইস্কুল করেছেন, তাঁর বোন কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী।

আলি দা' বলে ডাকত কল্যাণী। নিজের বোন নেই আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে; আরো ভালো লেগেছিল—যেদিন হৃষীকেশ বাবুর পাশে বসিয়ে তাঁকেও ভাইফোঁটা দিয়েছিল কল্যাণী: 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা—'। চোখ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে এসেছিল, সে কথা আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের সেকেণ্ড্ ক্লাশে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে তাকে দু'চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে যেদিন কোনো কাজ থাকত না, সেদিন অযাচিতভাবেই এসে বসতেন হৃষীকেশের বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ না থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্‌টে সময় কেটে যেত। তারপরে হয়তো হৃষীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ এ ঘরে এসে তাঁকে আবিষ্কার করত: বাঃ—এই যে, কখন এলেন আপনি?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—তবু একবার ডাকেননি! আচ্ছা মানুষ তো! এতদিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন!

—পরের মতো নই বলেই তো বিনা-নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে এসে বসে

আছি। বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে তারস্বরে ঘোষণা করতে চাইনি—হেসে জবাব দিতেন আলিমুদ্দিন।

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাই কাল হল তার পরে।

কাল? না—না, সেই হল আশীর্বাদ। সত্যকে চিনলেন তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোসের আবরণে লুকিয়ে থাকা বাস্তবের মুখশ্রীকে। মহিষবাথানের শীতার্ত রাত্রিতে জাগ্রৎ-স্বপ্নে-দেখা আলোকময়ী মহা-ভারতীমূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল—আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক একটা উল্কাখণ্ডের মতো।

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল পূবদিক থেকে। ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন হৃষীকেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন। বড় ভালো লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কল্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনবার দাবী করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে।

হৃষীকেশ বৈঠকখানায় নেই। টেবিলে একটা শেজবাতি জ্বলছে। অভ্যাসবশে একটা ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন।

একটা ডাক দিতে যাবেন, ঠিক সময়েই শব্দটা ভেসে এল। ভেসে এল অলক্ষ্য ব্যাধের স্থির লক্ষ্য একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরঝিরি আর হাওয়ার শন্‌শনানি তাকে প্রতিরোধ করতে পারলনা।

—কী দরকার অত মাখামাখি করার? সবটারই একটা সীমা আছে।

হৃষীকেশের মায়ের গলা। হরিজন পল্লীতে যিনি নাইট-ইস্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খদ্দরের শুভ্রশাড়ীতে যাঁকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপতী ভারতবর্ষ মনে করে।

অপরাধিনীর স্বরে জবাব এল কল্যাণীর।

—তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরছ। কী এমন অন্যায়টা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি—

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনালো। আরো বিষাক্ত।

—ওঃ, একেবারে সাতকেলে দাদা! জ্ঞাত নয়, গোত্তর নয়—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

চেতনাটা যেন ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছে। ফাঁসির দড়িতে অবধারিতভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা অন্তিম আক্ষেপের মতো সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করছেন আলিমুদ্দিন—চেষ্টা করছেন একটা মর্মান্তিক আগ্রহে। নিশ্বাস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নন।

কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা চললনা বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিলেন পরমুহূর্তে।

—দিনরাত আলি দা' আর আলি দা'—নাম করে করে মেয়ে আমার অজ্ঞান। বেশ তো, দাদা আছে থাক, মাঝে মাঝে আসুক যাক—কিন্তু এ কী! আলি দা' একটা অঙ্ক কষে দিন, আলি দা' একখানা নতুন গান শুনুন—এ সমস্ত কী! ও জাতের সঙ্গে অমন মাখামাখি কিসের!

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই হাসির আওয়াজটা যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। দু হাতে কান চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, বিশ্বাস নেবার মতো একটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোনোখানে নেই!

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে পথে নেমে গেলেন। দিক্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত।

চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখের সব কিছু লক্ষ্য বস্তুকে চির-দিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস সাপের লেজের মতো তাঁর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে লাগল, সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল নাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালার মতো। অবশেষে নগ্ন পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন নুড়ির একটা ঠোকা লাগল, নোখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত—সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন।

ঃ ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ।

ঃ একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান।

ঃ ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে পড়লেন আলিমুদ্দিন। তাঁর ধর্ম জানে, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি কল্যাণীকে।

ভালোমন্দ সব সমাজেই আছে। তাঁর নিজের সমাজ পিছিয়ে পড়া, অনেক দোষ ত্রুটিও আছে তার। সে কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাই বলে সমাজের প্রতিটী মানুষকে কেন এই ঘৃণার আঘাত!

সেই ভাই-ফোঁটার তিলক তো এখনো তাঁর ললাটের স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—সে তো তাঁরই প্রতি অকৃপণ মঙ্গল-কামনা। তবে?

কাটা নোখের অসহ্য যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে তার উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ-কামনাও আছে। কিন্তু কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই তার পূর্ণ ফল আসবে তাঁর হাতে।

কিন্তু সে কেমন করে? কী উপায়ে?

মাথা তুলে দাঁড়াও। ছোট হয়ে নয়, ঘৃণায় অনুকম্পায় নয়, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্যে দিয়েও নয়। সেদিন তাঁকে ছোট করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কারুর থাকবেনা, যেদিন মক্কা থেকে মস্কো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা ইস্‌লামী সমশেরের দীপ্তি পড়বে ভারতবর্ষের মুখে—সেইদিন। সেইদিনই কর্ম দেবীর রাখীবন্ধন উৎসব সফল হবে শাহেন্‌শা বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুর্‌ল। দিন কয়েক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাটবার পরে পথের নির্দেশ মিলল তাঁর।

—"I am first a Mussalman, then an Indian."—

মৌলনা মহম্মদ আলীর উক্তি। দেশের কাজে সমর্পিত-প্রাণ জননায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি।

না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি ঘৃণা করেন? না—তা নয়। কিন্তু হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

এত বড় হিন্দু সমাজ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র, আজাদীর শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনন্যব্রতী সহকর্মীদের, কেমন করে ভুলবেন তাঁদের কথা—যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করে গেলেন হিন্দু আর মুসলমানের? মহিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা কপালে চন্দন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যে কল্যাণীর কল্যাণস্পর্শ তাঁর জীবনের একটা অপরূপ সঞ্চয়, তাদের তিনি ভুলতে পারেননা। শুধু চান—তাদের কাছে প্রতিদিন পাওয়া এই ঘৃণার

কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোজা মাথায়, বলিষ্ঠ পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়াতে। হিন্দু হিন্দুত্বের ধ্বজা বয়ে বেড়াক—মুসলমান কেন ভুলে যাবে তার শেষ নবীর দীপ্ত বাণীকে, ভুলে যাবে তার দিগ্বিজয়ী তলোয়ারকে?

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমান। মিত্রতা হয় সমমর্যাদার ভিত্তিতে; সেই সাম্য—সেই মর্যাদাকে আগে নিতে হবে আদায় করে। আগে করতে হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 'পাকিস্তান হামারা'—

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন আলিমুদ্দিন? এইবারে চোখ রগড়ালেন। ফতেশা পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছেন তিনি! পাল-বুরুজ অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চূড়োর ওপর উড়ন্ত জালালী কবুতরগুলোকে এতদূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো।

অতীতের রোমন্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উঁচু নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেলা প্রায় মাথার ওপর। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, রৌদ্রদগ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে কারুর অদৃশ্য হাতছানি দেখতে পাচ্ছে যেন। একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর 'কারবালা'। প্রতি বছর পালনগরে মহরম শেষ হলে এই কারবালাতেই তাজিয়া বয়ে আনা হয়।

কারবালার পাশেই 'বাদিয়া'দের ছোট একটি গ্রাম: মুস্তাফাপুর। এই এলাকার মানুষগুলি তাঁর ভারী অনুগত, পালনগরে ফতে শাহুর কাছে দরবার করতে গেলে প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে, আর আছে একখানা 'সরল গৃহ-চিকিৎসা'। আপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ

করে মুস্তাফাপুরের দুর্বিনীত বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই ফতেশার সামরিক শক্তি—দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লাঠি, হাঁসুয়া আর বে-আইনি গাদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে! প্রত্যেকের গায়েই দুটো চারটে আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোলা আছে থানার দারোগাবাবুর দাগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাতবিরেতে প্রায়ই চৌকীদার এসে হাঁক পাড়ে: করমুদ্দি, ঘরে আছ? ও গণি ভুঁইয়া, তোমার খবর কী?

হোক দাগী, হোক দুরন্ত। তবু ইস্‌লামের এরাই প্রাণশক্তি—মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিমুদ্দিন। পাকিস্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। ইস্‌লামী ঝাণ্ডার এরাই সত্যিকারের উত্তর সাধক।

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আলিমুদ্দিন। এসেছেন যখন, একবার খবর নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরণের। ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি নিয়ে এদেশের গৃহস্থ পল্লীর মতো নয়, প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখানা আমবাগান কিংবা একটা এঁদো ডোবার ব্যবধান নেই। এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধ—যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এতটুকু সীমারেখা টেনে রাখতে চায় না। সারি সারি চালা ঘর গায়ে-গায়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চলার পথ। সেই চলার পথটুকুও কখনো একটা খাটুলি অথবা দুটো একটা জলচৌকি কিংবা আরো দশটা জিনিসে অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দিতে চায় না—গণ্ডির মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

—মাস্টার সাহেব যে! আদাব—আদাব।

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। পাকা-দাড়ি এক

বৃদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকো টানছে। কাঁচা পাকা মেশানো রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে তার দুকানের ওপর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত; গা খোলা—হাতের আর কাঁধের পেশীগুলি ভাঙাচুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শিরা-স্নায়ুর বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি, অনেক সমুদ্রের ভেতর দিয়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে তাকে।

—আদাব, আদাব। ভালো আছো তো এলাহী?

—জী, আছি একরকম। তা এই দুপুরবেলা এদিকে কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি?

—না, রোগী খুঁজতে এলাম।—আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—আসুন, আসুন, উঠে বসুন—এলাহী আহ্বান জানালো: তামুক খান।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাওয়ায় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। একটা খাটুলির ওপর বসলেন আরাম করে। এলাহীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে তাতে মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে তাঁর মনে হল, আঃ, সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত! সকাল থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা ভুলেও গিয়েছিলেন। ফতে শাহুর বৈঠকখানায় এন্তাজ চাচার সঙ্গে সেই তর্ক-বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পথে বেরিয়ে আসা। তারপর পথ চলতে চলতে স্মৃতির ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া। সমস্ত বোধ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—এখনো বুঝি চান-খাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার সাহেবের?—মনের ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল এলাহী বক্সের জিজ্ঞাসায়।

—নাঃ—তামাকের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—সে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল : বেলা তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে! তা হলে আমার এখানেই যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।

—না-না, ওসব কিছু করতে হবেনা—ধীরে ধীরে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, কোনো দরকার নেই ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাতেই খাওয়া আমার অভ্যাস।

—তা হোক। একটু চিঁড়ে-মুড়ির জলপান? নতুন গুড় আছে ঘরে—আগ্রহভরে আবার জানতে চাইল এলাহী।

—বলেছি তো কিছু করতে হবেনা—আলিমুদ্দিনের গলার স্বরে এবার যেন বিরক্তিই ফুটে বেরুল। মিনিটখানেক নিঃশব্দে তামাক টেনে জানতে চাইলেন, পাড়ার খবর কী?

—চলছে এক রকম করে।

—এক রকম কেন? ভালো নয়?—হুঁকো নামিয়ে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন একটা নিড়ানি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে নিচের ফালি পথটুকুতে। অযাচিতভাবে সেই-ই একটা ফোড়ন ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে।

—ভালো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব! শাহু কি তেমন লোক?

আচমকা যেন একটা ঢিল এসে ছিটকে লাগল আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন হোসেনের দিকে। কালো মুখের ভেতর থেকে দু সারি শাদা দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসি হাসছে সে।

—কী যা-তা বলছিস বেকুব?—চটে একটা ধমক দিলে এল শাহু আমাদের ভাত দেয়না? আমরা খাইনা তার নিমক?

—খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্তু নিমকের চাইতে খুনের দাম বেশি—হোসেনের শাদা শাদা দাঁতে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি। হাসিটাকে ভালো লাগলনা আলিমুদ্দিনের।

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু শাহুই নয়—এর আঘাত তাঁরও ওপরে এসে পড়েছে। মুখ লাল করে বললেন, তোমার যে খুব লম্বা চওড়া কথা শুনতে পাচ্ছি!

—না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোত্থেকে! আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায় আর উপোস করার বেলায়। লম্বা কথা বললেই বা তা শুনছে কে!

ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরো তীব্র, আঘাতটা তাঁর ওপরে আরও প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও জোগালো না তাঁর মুখে।

—আদাব মাস্টারসাহেব, চলি,—হোসেন আর এক ঝলক শাদা হাসি বিতরণ করে বিদায় নিলে।

—কী আস্পর্ধা! খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে পারলেন মাস্টার।

—তা বটে, ভারি অন্যায়।—এলাহী বক্স মাথা চুলকোতে লাগল : তবে কিনা নেহাৎ অন্যায় বলেনি। আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছি—

—কী বললে!—হাতের হুঁকোটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখলেন আলিমুদ্দিন : তোমরাও সবাই মিলে ওই সব ভাবছ বুঝি? মুসলমান হয়ে মতলব আঁটছ নিমকহারামীর?

—তোবা, তোবা।—দু হাতে কানে আঙুল দিলে এলাহী বক্স। জিভ কেটে বললে, জী না—না, ওসব আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে দুচারটে এটা-ওটা কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি।

—এটা-ওটা কথা? না, না, এটা-ওটা কথাকে তো আস্কারা দেওয়া যায় না—কড়া গলায় আলিমুদ্দিন বললেন। মুখে ছায়া পড়েছে, ঘনিয়েছে মেঘ। শাহুর খাস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও একি অতৃপ্তি মাথা তুলেছে আজ! চেতনা জাগুক তা তিনিও চান—কিন্তু তার এ কী রূপ! এ রূপের সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি, এর পরিণাম কী তাও তাঁর ধারণার বাইরে। হঠাৎ গভীর একটা আশঙ্কা তিনি অনুভব করলেন। রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র-দুপুরে আচমকা কোনো 'বাদিয়া'-পল্লীতে আগুন লাগলে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া পরম উল্লাসে একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে যায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে অত বড় পাড়াটায় পড়ে থাকে শুধু রাশীকৃত ছাইয়ের পিণ্ড। তাই একটা ফুল্‌কিও এখানে ভয়াবহ। শাহুকে বলতে হবে ব্যাপারটা।

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন: সে কি—অসুখ কার?

—আজ্ঞে না, ও কিছু না—এলাহী বক্‌স জিনিসটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল যেন।

কিন্তু আবার সেই গোঙানি। আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন? অসুখ কার?

মাথা নত করে এলাহী বক্‌স বললেন, আমার বড় বেটির। রাজিয়ার।

—কী অসুখ?

এলাহী নিরুত্তর রইল।

—অসুখটা কী, তাও বলতে বারণ আছে নাকি? দরকার হলে আমিও তো চিকিৎসা করতে পারি।

—আপনি পারবেন না জনাব।

—পারব না!

—না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে।—অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে এলাহী বক্‌স।

—পারার ঘা!—শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের: ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল?

—শাহুর বাড়ীতে বাঁদীর কাজ করত—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—শাহুর বাড়ীতে!

—জী!—একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালো এলাহী বক্‌স: শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।—নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল।

ঘরের মধ্যে গোঙানি চলছে। দূরে পোড়া মাটির মাঠ। অভুক্ত পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। আলিমুদ্দিন মাস্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ্ণ শাণিত হাসিটা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।

চক্‌মকিতে ঘা না লাগলে কি ঠিকরে পড়ে ফুল্‌কি?

ছয়

রেশমের কুঠিয়াল ক্রু সাহেবের কুঠি এখনো আছে, রেশম নেই।

রেশম নেই, রেশমী সাহেবীয়ানাও নেই। মোটা জিনের আধময়লা স্যুট—গলার টাইটা পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। একটা নতুন টাই কেনবার মতো অর্থ-সঙ্গতি এখনো ঘটে ওঠেনি ক্রু সাহেবের। মার্থার যে রঙীন স্কার্টটা সংপ্রতি পেন্‌শন পেয়েছে, তার থেকে একটা ফালি কেটে নিয়ে আত্ম-সম্মান বাঁচানো যায় কিনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ক্রু সাহেব।

সামনে একটা ঠ্যাং-ছোট টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে ছোটা হাজ্‌রী। একটা মুরগীর ডিম, দু টুক্‌রো মার্থার হোম-মেড্ নোন্‌তা স্কচ-ব্রেড, দুটি সুপুষ্ট কলা—তাতে দু চারটি আঁঠি থাকা অসম্ভব নয়! আর আছে এক কাপ গৌড়ীয় চা, তার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সংপ্রতি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, আখের গুড়েই চায়ের মিষ্টতা সাধন করতে হচ্ছে।

মার্থার ঝাড়নের শব্দ। ক্রু সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হল।

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় মার্থা বললে, চা খাচ্ছ না যে?

করুণ চোখে কালো চায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্রু সাহেব। তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে, বড্ড গন্ধ লাগছে। একটু চিনি হয় না মার্থা?

মার্থা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আমার চিনির দোকান আছে, না কল বসিয়েছি একটা?

—না, না, তা বলছি না। মানে, যদি কোথাও একটু থাকে-টাকে—

—নিজে খাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি কেমন?—খাঁটি বঙ্গনারীর মতো একটা মুখ ঝাম্‌টা মারল মার্থা: আজ তিন হপ্তা ধরে কত চিনি এনে দিয়েছ—মণ খানেক ঘরে জমা করে রেখেছি!

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ক্রু সাহেবের।

—ত্যাখো মার্থা ক্যারু, তোমার ভয়ঙ্কর মুখ হয়েছে আজকাল। তুমি ভুলে যাচ্ছ—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মার্থা ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে।

মার্থা ক্যারু। হাঁ, ক্রু সাহেবের আদত নাম ক্যারুই বটে। এ অঞ্চলের লোক গোড়ার দিকে বিকৃতি ঘটিয়ে উচ্চারণ করত কুরু। তারপরে হয়তো কোনো ইংরিজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ভুলটা শুধরে দিয়ে বলেছে, নামটা কুরু হতে পারে না—হবে ক্রু; সম্ভব ট্রেণের কোনো ক্রু সাহেব তার মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে উঠে থাকবে। সেই থেকেই ক্যারু সাহেব ক্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে গ্রামের লোকে কেউ কেউ এখনো কুরুই বলে।

মার্থার রং-জ্বলে যাওয়া ফিকে গোলাপী গাউনটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর একটা বিড়ির সন্ধানে পেণ্টুলুনের পকেটে হাত ঢোকাতে আর একটা নতুন ভয়াবহ সত্যের সন্ধান মিলল। পকেটের নীচেকার সেলাই খুলে গিয়ে কখন একটি বাতায়ন রচিত হয়েছে, আর তার অবারিত পথে বিড়িগুলো কোন্ মুক্ত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে।

অগত্যা প্রচণ্ড একটা ক্রুর মুখভঙ্গি করে ক্রু ওরফে ক্যারু গুড়ের চায়ে একটা চুমুক দিলে। একখানা রুটি তুলে নিয়ে একগ্রাসে গিলল সেটাকে। তারপর আধখানা কলায় কামড় দিয়ে তার আঁটি-গুলোকে জিভের আগায় সংগ্রহ করতে করতে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল।

নীল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পেরিয়ে টেম্‌স নদীর মোহানা।

দূরে ছবির মতো আঁকা টাওয়ার অব্ লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীণ-এ ঝকঝকে তকতকে একখানা বিশাল বাড়িঃ ক্যারুজ। ইণ্ডিয়ান সিল্কস্ অ্যাণ্ড ফেবরিক্স্।

কিন্তু ঢেঁকি কি কখনো স্বর্গে যায়? রাশি রাশি শুকনো পাতা, মরা পলু পোকা আর ভাঙা তাঁতের সঙ্গে কবে ভারতবর্ষের নরম মাটির স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে প্যার্সিভ্যাল্ ক্যারুর। এতদিনে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। আর যদি বেঁচেও থাকে—সেখানকার সংসারে, সেখানকার সমাজের পরিবেশে স্মাইদ্ ক্যারু—অর্থাৎ ক্রু সাহেবের স্থান কোথায়?

—রাস্কেল্! ওল্ড্ ফুল!

স্বল্পার্জিত ইংরেজি বিদ্যা নিয়ে বাপের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ক্রু সাহেব।

রেশমের কুঠি করেছিল পার্সিভ্যাল—কয়েক বছর টাকাও কামিয়েছিল দু হাতে। সেই প্রথম যৌবনে এবং অপরিসীম প্রাচুর্যের ভেতরে তার চোখে রঙ্ ধরিয়েছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি চাষার মেয়ে। জন্ম হল স্মাইদ্ ক্যারুর। মায়ের রঙ আর বাপের রক্ত নিয়ে। কিন্তু রক্তের প্রতি আকর্ষণের চাইতে রঙের প্রতি বিকর্ষণটাই পার্সিভ্যালের ছিল বেশি। তাই ব্যবসা তুলে দিয়ে এদেশ থেকে যখন চাটিবাটি তুলল, তখন স্মাইদ্‌কে ফেলে গেল রেশমহীন এই রেশমের কুঠিতে। মা-টা আগেই মরেছিল তাই রক্ষা।

স্মাইদের বয়েস তখন পনেরো বছর। কেঁদে বলেছিল, বাবা, আমার কী হবে?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করেছিল পার্সিভ্যাল।

—কী আবার হবে? বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরী করে

নাও। ইংল্যাণ্ডে তোমার মতো ধাড়ি ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানো হয়না —বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

—কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার?—বিরক্তির ভ্রূকুটিটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল পার্সিভ্যালের মুখেঃ তোমাকে তো বাপু আমি দস্তুরমতো প্রপার্টি দিয়ে গেলাম। এই বাড়ি রইল, জমি-জমাও কিছু করে রেখেছি। নাউ ট্রাই ইয়োর লাক!

—আমাকে কি কখনো তোমার কাছে নিয়ে যাবেনা? আমাদের নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ডে?

নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ড! একটা তির্যক হাসির রেখা প্রকটিত হয়েছিল পার্সিভ্যালের ঠোঁটের কোণায়ঃ আচ্ছা হবে, হবে। কিছুদিন পরে তোমায় আমি প্যাসেজ পাঠাবো, স্ট্রেট্ চলে যেয়ো। নাউ গুড্‌বাই মাই বয়—চিয়ার আপ্!

সান্ত্বনার মতো শেষবার ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে পার্সিভ্যাল্ পাল্‌কীতে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ না পথের বাঁকে পাল্‌কীটা অদৃশ্য হল, ততক্ষণ দেখা গেল সে রুমাল নেড়ে নেড়ে ছেলেকে বিদায়-বাণী জানাচ্ছে।

…জীর্ণ চেয়ারটার ওপর নড়ে-চড়ে বসল ক্রু সাহেব। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ উঠল। তারপরে আজ একটু একটু করে ষোলোটা বছর পার হয়ে গেছে। পাল্‌কী চলে যাওয়া ওই ধূলোভরা পথটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, পেরিয়ে গেছে রাতের পর রাত। যে বটগাছটার তলায় পার্সিভ্যালের আরবী ঘোড়াদুটো বাঁধা থাকত, সেটা উপড়ে পড়ে গেছে ঝড়ে; যে টিনের চালার তলায় চাষারা পলুর দাম নেবার জন্যে এসে দরবার করত, সেখানে এখন অজগর জঙ্গল।

সে প্যাসেজ আজো আসেনি। শুধু বহুদূর লণ্ডনের কোন্ এক গোল্ডার্স গ্রীণে কী এক ক্যারু কোম্পানির মায়াস্বপ্ন দেখতে দেখতে আজো প্রতীক্ষা করে স্মাইদ্ ক্যারু। আশা নেই, অভ্যাস রয়ে গেছে। আজো কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে মনে হয় পিয়ন এসে দরজার কড়া নাড়ছে: চিঠি হ্যায়—চিঠি।

কিসের?

ইংল্যাণ্ডের ডাক-টিকিটমারা লম্বা একখানা খাম। খুলতেই এক-টুকরো চিঠি: মাই সান, পত্রপাঠ চলে এসো। ডাকে দু'শো পাউণ্ড পাঠালাম। আমার সমস্ত সম্পত্তির তুমিই উত্তরাধিকারী, এখানে এসে ক্যারু কোম্পানির সব ভার আজ থেকে তোমাকেই নিতে হবে।

সে চিঠি এখনো আসেনি। কিন্তু কাল তো আসতে পারে? কিংবা পরশু? কিংবা তারও পরের দিন? কে জানে, কিছুই বলা যায় না। পার্সিভ্যাল ক্যারুর বুকের ভেতর বিবেক কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেনা এও কি সম্ভব?

না, কিছুই বলা যায় না। মরা একটা মেটে সাপের মতো লাল মাটির ওই বিসর্পিল রাস্তাটা নিরুত্তর হয়ে আছে ষোলো বছর ধরে। উত্তরের ওই রক্তাভ তারাটা ষোলো বছর ধরে সকৌতুকে যেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যায়। অন্ধকার ছায়া জমে জমে ওঠা কুঠি-বাড়ির কোনো রিক্ত কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আকুতির স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে—ভাঙা জানালায় বাতাসের ব্যঙ্গ।

লাল মাটির তপ্ত বাতাসে তপ্ত কামনার কয়েকটা দিন। কালো মায়ের কালো ছেলে, শাদা বাপ পথের ধুলোয় সে-দিনগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গোল্ডার্স গ্রীণ? আকাশের ছায়াপথের সঙ্গে তার তো পার্থক্য নেই কোথাও।

—চিঠি আছে সাহেব।

ক্রু সাহেব চমকে উঠল। হিজলবনী পোস্ট অফিসের পিয়ন রতন ভুঁইমালী। একখানা খাম দিয়ে সেলাম জানিয়ে গেল। সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আজো তা হলে রয়েছে লোকগুলোর!

একখানা খাম। পুরোনো অভ্যাসেই ডাক-টিকিটের দিকে প্রথমে তাকালো ক্রু সাহেব। না, না, ইংল্যাণ্ড নয়। ইণ্ডিয়া পোস্টেজ্। কলকাতার মোহর-মারা।

কিন্তু খামখানা খুলেই চক্ষুঃস্থির।

'ডিয়ার ক্যারু,

গত বছর ক্রিস্‌মাসের সময় তোমার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল, আশা করি, এর মধ্যেই তুমি তা ভুলে যাওনি। তোমার সাহচর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া তোমার নেমন্তন্নও আমি ভুলিনি—শিকারের অতবড় প্রলোভন ছেড়ে দেওয়া শক্ত। বহুদিন থেকেই আসবার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজের চাপে সময় পাইনি। এইবারে অফিস থেকে দু সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। শুনে সুখী হবে ১৫ তারিখ বিকেলে এখান থেকে রওনা হবে ১৬ তারিখ ভোরের ট্রেনে তোমাদের স্টেশনে পৌঁছুব। আশা করি, তোমার 'কার'খানা স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। আর তুমি যদি নিজে উপস্থিত থাকতে পারো, তা হলে তো আরো ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো ও মিসেস্ ক্যারুকে জানিও। ইতি—

'অ্যাল্‌বার্ট'

শুনে সুখী হবে! ক্রু সাহেব পুরো পাঁচ মিনিট বজ্রাহত হয়ে রইল। তারও পরে মনে পড়ল আগামী কাল ১৬ই তারিখ এবং কাল সকালেই বোয়ালমারী স্টেশনে বন্দুক কাঁধে অ্যাল্‌বার্টের আবির্ভাব ঘটবে। অসাড় শরীরটা আরো অসাড় হয়ে গেল। ছোটা হাজ্‌রীর যে আধখানা

কলা অনেকক্ষণ থেকে হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেটা হঠাৎ টপ্ করে গলে পড়ল বুকপকেটের ভেতরে, ক্রু সাহেব টেরও পেলনা ঘটনাটা।

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

অপরাধের মধ্যে গত ক্রিস্‌মাসে কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিল ক্রু সাহেব। একটা রেস্তোরাঁয় অ্যাল্‌বার্টের সঙ্গে আলাপ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্মার্ট ছেলে, দিল-দরিয়া মেজাজ। পেট ভরে ডিনারটা সেই খাওয়ালো।

একটা পেগ্ পেটে পড়তেই প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তরঙ্গতাটা এক ধাক্কায় আকাশে গিয়ে উঠল।

একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরী করে অ্যাল্‌বার্ট। শ' ছয়েক টাকা মাইনে পায়। ব্যাচিলার মানুষ, ফ্ল্যাটে থাকে, হকি-গল্‌ফ্-বেস্‌বল খেলে। প্রজাপতি জীবন কাটিয়ে বেড়ায়। নিজেই বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, তুমি?

এ ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা রাখতেই হয়। দু'টো ঢোঁক গিলে ক্রু সাহেব বলেছিল, প্ল্যাণ্টার।

—প্ল্যাণ্টার? তা হলে তো তুমি রীতিমতো বড়লোক হে! কিসের প্ল্যাণ্টার? টী?

—সিল্‌ক। বেঙ্গল সিল্‌ক।

—ওঃ—সিল্‌ক!—অ্যাল্‌বার্টের স্বর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল: খুব বড় ফার্ম বুঝি?

—তা একরকম মন্দ নয়।—বিনয় করে কথাটা বলতে গিয়েও আরো দুটো ঢোঁক গিলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে।

—ইট্ ইজ এ লাক্ দ্যাট আই মীট সো বিগ এ প্ল্যাণ্টার!—একটা

সিগারেট 'অফার' করে জানতে চেয়েছিল অ্যাল্‌বার্ট : কোথায় তোমার ফার্ম ?

মিথ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করলে আর ফিরে দাঁড়ানো কঠিন। তা ছাড়া মিথ্যের আর একটা সুবিধে এই যে সত্যের ভ্রূকুটি কোথাও থাকেনা বলে অবলীলাক্রমে যতদূরে খুশি চলে যাওয়া যায়—যত ইচ্ছে রঙের ওপর রঙের সোনালি বার্ণিশ চাপিয়ে দেওয়া চলে। হাওয়াতেই যদি প্রাসাদ গড়তে হয়, তা হলে একেবারে তাজমহল গড়াই ভালো; কারুকার্যে খচিত করে, হীরে জহরতের জেল্লা দিয়ে।

সুতরাং নিজের ফার্মের একটা মায়াময় বর্ণনা দিয়েছিল ক্রু সাহেব।

যতদূরে চাও গ্রীণ আর গ্রাণ। মাঝে মাঝে আখরোটের বন। (এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আখরোটের বন কেন মনে এসেছিল সে কথা আজো বলতে পারেনা ক্রু সাহেব।) এখানে ওখানে পাম্ গাছ—(দেশী তালগাছ আর বিলিতি পামের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট ছিলনা নিজের কাছে) আর ছোট ছোট ক্রুকলেট—কী চমৎকার টলটলে তার নীল জল। তাতে কার্প আর রুইমাছ কিলবিল করছে। (অবশ্য ক্রুকলেট বলতে মনে এসেছিল কাদাভরা কাঁদড়ের কথা, তার ভেতরে রাশি রাশি ব্যাং আর চ্যাংয়ের পোনা।) সেই মনোরম পরিবেশের মধ্যে তার ফার্ম। লাল ইঁটের বাড়িটি—আঃ—ইট ইজ এ ড্রিম!

শুনে, অ্যাল্‌বার্টের চোখ জল জল করে উঠেছিল।

—তোমার 'কার' আছে ?

—অবশ্য।

—হাউ লাভ্‌লি!—খানিকক্ষণ চোখ বুজে ক্রু সাহেবের স্বর্গীয় জগৎ-টাকে ধ্যান করেছিল আলবার্ট : ইট্ ইজ্ এ পিক্‌চার!

—যা বলেছ!—অ্যাল্‌বার্টের দেওয়া সিগারেটটার ধূমপান করতে

করতে ক্রু সাহেব আরো বলেছিল : রোজ ভোরে উঠে দেখবে দিগন্তে হিমালয়ান রেঞ্জের নীল রেখা। আর সূর্য ওঠবার আগেই সেদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস তোমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে।

এতখানি বর্ণনার মধ্যে যা কিছু সত্য লুকোনো আছে এইটুকুতেই। হিমালয়ান রেঞ্জ অবশ্য নয়, রাজমহলের পাহাড় ; কিন্তু বুনো হাঁসের ঝাঁক সত্যিই আসে, বিশেষ করে শীতের আমেজ লাগলে ভোরের আকাশ তাদের কণ্ঠকূজন আর পাখার শব্দে প্রায়ই মুখর হয়ে থাকে।

—বুনো হাঁস !—অ্যাল্‌বার্ট প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল : মানে গেম্ বার্ড ?

—তাই।

—প্রচুর পাওয়া যায় ?

—সারা বাংলা দেশে গেম্ গার্ডের এমন জায়গা আর নেই। আমার এরিয়ার মধ্যেই তো দু তিনটে বড় বড় বিল রয়েছে।

—তা হলে তো শিকার করতে যাওয়া যায় তোমার ওখানে।

—এনিটাইম। খুব খুশি হবো তুমি এলে। অবশ্য শীতকালে এলেই ভালো হয়—সেইটাই বুনো হাঁসের সীজ্‌ন কিনা।

—আর বলো না, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে—অ্যাল্‌বার্ট থামিয়ে দিয়েছিল লোভ জাগানো বর্ণনাটা। তারপর পকেট থেকে নোট বই বের করে বলেছিল, তোমার ঠিকানা ?

এইখানে আবার তিনটে ঢোঁক গিলে নিতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে। এর পর ইচ্ছে হয়েছিল রাশীকৃত মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যে পরিচয়টাও দিয়ে বসে। কিন্তু এ সম্পর্কে মনঃস্থির করবার আগেই অসীম বিস্ময়ে দেখতে পেল, নিজের অজ্ঞাতেই কখন সে সত্যিকারের নাম ধাম-ঠিকানা দিয়ে ফেলেছে।

—সুযোগ পেলেই তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করব আমি—ঠিকানা লেখা শেষ করে চোখ তুলে জানিয়েছিল অ্যাল্‌বার্ট।

ধ্বক্ করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। পরক্ষণেই আচমকা ধাক্কা খাওয়া একটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো অত্যন্ত দ্রুতবেগে দোলা খেয়েছিল বারকয়েক। শুক্‌নো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বলেছিল, আন্তরিক সুখী হবো।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অনুতাপ আর অস্বস্তির সীমা রইলনা যেন। তারপর গড়ের মাঠের খোলা হাওয়ায় চলতে চলতে ক্রমশ মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল—অস্বস্তিকর মানসিকতার ওপরে সান্ত্বনার লঘু প্রলেপ পড়তে লাগল একটা। মনে হয়েছিল মদের নেশার এই মুহূর্তগুলো কতদিন বেঁচে থাকবে অ্যালবার্টের স্মৃতির ওপরে? দুদিন পরেই ক্রমশ তা নিষ্প্রভ হয়ে আসবে, তারপরেই একটু একটু করে নিঃসীম বিস্মৃতির গভীরে যাবে হারিয়ে। সান্ত্বনাটা মনের মধ্যে ক্রমশ থিতিয়ে বসতে লাগল, তারপর এক সময়ে নিশ্চিত ভরসায় দানা বেঁধে গেল সেটা।

কিন্তু এক বছর পরে এমন করে যে পালে বাঘ পড়বে তা কে জানত? কে জানত, নেশা করলেও অ্যাল্‌বার্টের স্মৃতি সজাগ ও প্রখর থাকে, একটা ড্রিমল্যাণ্ডের আকর্ষণ এতদিন পরেও এমনভাবে হাতছানি দেয় তাকে?

এখন উপায়?

এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে; আত্মহত্যা করা চলে; আর নয়তো স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার সময় ফাঁকা মাঠের কোনো নির্জন জায়গায় সাবাড় করে দেওয়া চলে অ্যাল্‌বার্টকে।

কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয় তার।

হেমন্তের এই স্নিগ্ধ-সকালেও ক্রু সাহেবের জামার মধ্যে ঘাম গড়াতে

লাগল। দিনের বেলাতেও দু'টো কানে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বাজতে লাগল ঝিম্ ঝিম্ করে। কালই সে ভয়ঙ্কর ষোলোই তারিখ। কাল সকালেই অ্যাল্‌বার্ট এসে দর্শন দেবে বোয়ালমারী স্টেশনে। স্টেশনে না গিয়েও তাকে এড়ানোর উপায় নেই—রেশমের কুঠি বললে এ অঞ্চলের যে কোনো লোকই পথের হদিশ বাত্‌লে দেবে তাকে।

মার্থা বারান্দায় এল।

—মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী এত? ওটা কার চিঠি?

ছোঁ মেরে চিঠি তুলে নেবার আর্টটা মেয়েদের মজ্জাগত এবং সেটা এতই ক্ষিপ্রবেগে যে সামলে নেবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ক্রু সাহেব পেলনা।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে মার্থা ক্রু সাহেবের দিকে তাকালো। টানা টানা ভ্রু দুটি প্রসারিত হয়ে গেছে সীমাহীন বিস্ময়ে।

—এ আবার কী ব্যাপার? অ্যাল্‌বার্ট কে?

—ও—ও আমার এক বন্ধুর চিঠি—কান্না চাপবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করে জবাব দিলে ক্রু সাহেব।

—বন্ধু?

—হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

—কিন্তু—মার্থা আবার চিঠিটার ওপর দৃষ্টি ফেলল: স্টেশনে 'কার' পাঠাবার কথা লিখেছে।—জ্বালাভরা গলায় জানতে চাইল: কোন্ 'কার'টা পাঠাচ্ছ? বড়খানা, ছোটটা, না মাঝারিটা?

—ওটা—মানে, ওটা ও ভুল বুঝেছে—ক্রু সাহেব যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল: ভেবেছে আমার মোটর আছে।

—আর শিকারের নিমন্ত্রণটা?—মার্থার চোখে ইঁদুর ধরা বেড়ালের মতো খর শ্যেন দৃষ্টি।

—ওটা, বুঝলে না, ওটা—এই কথায় কথায় বলেছিলাম। মানে আমি ঠিক ওকে নিমন্ত্রণ করিনি—

—করোনি—না?—ইঁদুর-ধরা দৃষ্টিটাকে আরো শাণিত করে মার্থা বললে, ওটাও তোমার বন্ধু ভেবে নিয়েছে, কেমন?

মুখের ঘাম মোছবার জন্যে রুমালের সন্ধানে বুক পকেটে হাত দিয়ে ক্রু সাহেব রুমাল পেল না, পেল সেই কলাটা। সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বিহ্বলভাবে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

আশ্চর্য শান্ত গলায় মার্থা বললে, কাল সকালেই তো এসে পড়ছে। তাকে নিয়ে বুঝি জমিদারের জলায় হাঁস মারতে যাবে? ভালোই হবে—তুমি আর তোমার বন্ধু অ্যাল্‌বার্ট—তুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক হাঁকড়াবে জমিদারের লোক। প্যার্সিভ্যালের দিন আর নেই—সাহেব বলে তোমায় রেয়াত করবে এমন আশাও কোরো না।

—সে আমি কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারব—ক্রু সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিলে।

—তা না হয় হল। কিন্তু তোমার এই বন্ধুটির দায়িত্ব নেবে কে শুনি? গুড়ের চা আর বিচে-কলা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে হবে নাকি?

আর্ত অসহায় দৃষ্টিতে মার্থার দিকে তাকাল ক্রু সাহেব—যেন করুণা ভিক্ষা করলে। তারপর বললে, যা হোক একটা উপায় করতেই হবে মার্থা। মস্ত মানী লোক—খাঁটি লর্ড বংশের ছেলে।

—লর্ড বংশের ছেলে!—মার্থার তু চোখে রাশি রাশি জ্বালা ফুটে বেরুল: তোমার বন্ধু-বান্ধব তো লর্ড আর ব্যারণ বংশেরই হবে! গোল্ডার্স গ্রীণে তোমাদের কতবড় কারবার, কত বড় বনিয়াদী ব্যবসা: ক্যারুজ! তুমিও তো লক্ষপতি লোক। শুধু গুড় দিয়ে চা খেতে হয়—এই যা তুঃখ!

একটা বীভৎস মুখভঙ্গি করে মার্থা বিদায় নিয়ে গেল। আর দাঁড়ালোনা।

ঠাট্টা করল—অপমান করে গেল! করবে বই কি—সে অস্ত্র নিজেই যে ওর হাতে তুলে দিয়েছে ক্রু সাহেব। শহরের এক নেটিভ্ ক্রিশ্চানের মেয়ে মার্থা। প্রেম করবার সময় অনেকগুলো কথাই বাড়িয়ে আর বানিয়ে বলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে—দেয়ার ইজ্ নো ল—! বলেছিল, শুধু দিনকয়েকের জন্যে এখানকার কুঠিটা তাকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে; মাস ছয়েক বাদেই বাপ লণ্ডন থেকে তার প্যাসেজ্ পাঠিয়ে দেবে। তখন এখানকার সব কিছু বিক্রী-বাটা করে দিয়ে সে আর মার্থা গিয়ে জাহাজে উঠবে—তারপরে হোম্—সুইট হোম্! হ্যাপি ইংল্যাণ্ড্!

কিন্তু ষোলো বছর অপেক্ষা করেও যে প্যাসেজ্ আজও পায়নি ক্রু সাহেব, মাত্র সাত বছরেই তা কোথা থেকে পাবে মার্থা? ক্রু সাহেবের তবু আশা করবার অভ্যাস যায়নি, কিন্তু রূঢ় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে মার্থার। কখনো কখনো সন্দেহ হয় মার্থা বুঝি তাকে ঘৃণা করে!

আপাতত ও সব ভেবে আর লাভ নেই। মার্থার সমস্যাটা এই মুহূর্তে এত জরুরি নয়। এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি-অ্যাল্বার্ট আসবে। সর্বাগ্রে এক্ষুণি একবার কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখানে যাওয়া দরকার।

সাত

পুরোনো সাইকেলটায় চড়ে ক্রু সাহেব যখন জমিদার বাড়িতে পৌছুল, তখন সেখানে একটা হৈ চৈ চলছিল। পুলিশ। জটাধর সিংয়ের লাসটা আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখন এন্‌কোয়ারী।

দারোগা আসীন আছেন। কন্‌স্টেবল দুজন এমন ভঙ্গিতে লাঠি হাতে দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে যে আচমকা দেখলে কেমন খট্‌কা লাগে। মাথার লাল পাগড়ি দুটো উঁচু হয়ে আছে একজোড়া গিন্নী শকুনের গলার মতো; আর খাকী ইউনিফর্মের সঙ্গে একজোড়া গোঁফ, রক্তাভ চোখ, আর সতর্ক বসবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন দারোগা ফাঁসির হুকুম দেবেন এইবার।

দারোগার কাছ থেকে একটা ভদ্ররকম দূরত্ব বাঁচিয়ে কুমার ভৈরব-নারায়ণ। রক্তাক্ত শিরায় আকীর্ণ মোটা নাকটাকে কেমন ঘৃণাভরে কুঞ্চিত করে আছেন তিনি।

ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল, এল, এম্, এফ্—ব্র্যাকেটে 'পি', দাঁড়িয়ে আছেন থতমত ভঙ্গিতে। তার কারণ আছে। নিজের বিদ্যের পরিচয় জাহির করতে গিয়ে বলছিলেন, গ্রিভাস্ হার্ট, স্কাল্ ফ্রাক্‌চার হয়ে ব্রেইনে—কিন্তু কষে তাঁকে এক ধমক লাগিয়েছেন তলাপাত্র।

—থামুন মশাই, আর ওস্তাদী ফলাবেন না। আছেন ভেটিরিনারী সার্জন, তাই থাকুন। নাক গলাতে যাবেন না পুলিশের ব্যাপারে।

—ভেটিরিনারী সার্জন!—সবাই মনে করেছেন একটা চমৎকার রসিকতা, হো হো করে হেসে উঠেছেন স্বয়ং কুমার ভৈরবনারায়ণ পর্যন্ত। কিন্তু হাসতে পারেননি পান্নালাল নিজে। গত সপ্তাহে দারোগাকে তিন

পুরিয়া সিড্‌লিজ্‌ পাউডার দিয়ে দুটাকা দাম নিয়েছিলেন, তারই শোধ তুলছেন তারণ তলাপাত্র।

পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন ভৈরবনারায়ণের পেছনে। তুরীদের পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ তুলে ধমক খেয়েছিলেন কুমার বাহাদুরের কাছে, সুযোগ-সুবিধে পেলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আর একটু দূরেই কাছারীর সিঁড়ির ওপর নিঃসঙ্গ রঞ্জন বসে আছে দার্শনিকের মতো। তার মনটা এইমাত্র পরিক্রমা করে এসেছে আদিগন্ত মাঠ; সেখানে টিলার ওপব আহীরদের বস্তী, নিমগাছের ছায়া, যমুনা আহীরের অগ্নিগর্ভ চোখ আর—আর ঝুমরী। নাগিনী? না—ঠিক বলা হলনা। নতুন ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন পাঞ্চালী। দাবদগ্ধ 'বরিন্দে'র মাঠে ছড়িয়ে গেছে তার ক্রোধদাহ—জটাধর সিং আগামী কুরু-প্রান্তরের প্রথম বলি।

দারোগা বাইবেলের সলোমনের মতো ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। হাতে অবশ্য ন্যায়দণ্ড নেই, আছে একটা কপিয়িং পেন্‌সিল। সেইটে দিয়ে সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট লিখছেন, অন্যমনস্কভাবে সামনের দুটো দাঁতও খুঁটছেন এক টুকরো আলুর খোসার সন্ধানে। তারপর বিরক্ত ভাবে যখন মুখ খিঁচোলেন, তখন একটা বেগুনী দন্তরুচি বিচিত্র-ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল।

পঞ্চমবার তারণ তলাপাত্র জানতে চাইলেন, তা হলে খুনটা করল কে?

ভেটিরিনারী সার্জন ওত পেতেই প্রতীক্ষা করছিলেন যেন। খপ করে বলে বসলেন, সেটা জানবার জন্যেই তো আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে মশাই।

দারোগা চোখ পাকিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অকুস্থলে ঢুকলেন ক্রু সাহেব।

টু প্লাস্‌ টু—ইকোয়্যাল্‌ টু ফোর। স্ল্যাট এবং সাইকেল্‌—ইকোয়্যাল্‌

টু—ডি-এস্-পি—টি-এস্-পি নয় তো ? দারোগা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চাপ সরে যাওয়া স্প্রিংয়ের মতো। কন্‌স্টেবল্‌দের জুতোয় খটাস্ করে আওয়াজ উঠল প্যারেডের 'আ-টিন্‌শন্' ভঙ্গিতে।

কোঁচকানো নাকটাকে প্রসন্ন হাসিতে বিস্তৃত করে দিয়ে ভৈরবনারায়ণ বললেন, ঘাবড়াবেন না, ক্রু সাহেব।

—ক্রু সাহেব ? সে আবার কে ?—দারোগার স্বর শঙ্কিত : কোনো অফিসার-টফিসার নয় তো ?

—না, না, সে সব কিছু না, বাজে লোক—বিভূপদ ভৈরবনারায়ণের বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করে দিলেন।

—অঃ, বাজে লোক !—সলোমন আবার সিংহাসন গ্রহণ করলেন। নিজে বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেন কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ক্রু সাহেবের দিকে।

দেউড়ির পাশে সাইকেলটাকে নামিয়ে রেখে তখন স্মাইদ্ ক্যারু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। একবার সশঙ্ক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল।

ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, এসো সাহেব, এসো—

ক্যারু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল : এসব কী কাণ্ড ?

ভৈরবনারায়ণ বললেন, খুন। আমার পাইক জটাধর সিং খুন হয়েছে।

—খুন !—ক্রু সাহেবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল একবার, বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। মুহূর্তের জন্যে ঘোলাটে চোখের সামনে সব কিছু চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার মতো পাক খেলো একটা। তারপর আস্তে আস্তে ঘরবাড়িগুলো স্বাভাবিক হয়ে যখন যথাস্থানে ফিরে এল, তখন :

জলে ধুয়ে যাওয়া একটা ছবি। কাঁদড়ের কাদার তলে সবটা চলে

গিয়েছিল, শুধু একজোড়া পা কিছুতেই ঢাকা পড়েনি। অনেক কাদা আর মাটির চাঙাড় চাপাতে হয়েছিল তার ওপর। তারপর—

—বোসো, বোসো সাহেব। অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

সারা শরীরে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন চৈতন্য ফিরে এল। ও কিছু না। কাঁদড়ের কাদার তলায় একটা বাদামী কঙ্কাল ছাড়া কিছু আর পাওয়া যাবেনা এখন। তাও কি কোনো বর্ষার উচ্ছ্বাস এতদিনে টেনে নিয়ে যায়নি মহানন্দার গর্ভে, মহানন্দা থেকে মহাসমুদ্রের অতল লুপ্তিতে?

ক্রু সাহেব বসে পড়ল। কোথায় বসল জানেনা। ঠিক পেছনে একটা চেয়ার না থাকলে হয়তো ধরাশায়ীই হতে হত তাকে।

স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালেন দারোগা। তাকালেন ভৈরবনারায়ণের দিকে।

—ইনি কে?

—ক্রু সাহেব। এঁর বাপের রেশমের কুঠি ছিল। এখন আর ব্যবসা নেই—তালুকদারী করেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে নামটা—দারোগা একটা মুখভঙ্গি করলেন। ক্রু সাহেব বসে রইল চুপ করে।

আরো দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করবার পরে তলাপাত্র উঠলেন। কাপ তিনেক চা, রাশীকৃত খাবার, আর তিনটে ডাব খাওয়ার প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুলে বললেন, হুঁ, সোজা কেস্। ওই আহীরগুলোরই কাণ্ড। কয়েকটাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

—আপনার ওদের ঠিক চেনা নেই—খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না পান্নালাল।

—বারো বচ্ছর ক্রিমিন্যাল ঘেঁটে তবে এস্-আই হয়েছি মশাই, গোরু-

ঘোড়া ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে নয়।—পাল্টা জবাব দিলেন তারণ: কোনো চিন্তামণিকেই চিনতে বাকী নেই আমার। বসে বসে দাদের মলম তৈরী করুন, আমার জন্যে মাথা ঘামাবেন না।

দারোগা বিদায় নিলেন।

মর্মান্তিক অপমানে গর্জাতে গর্জাতে উঠে পড়লেন পান্নালাল। আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাঘেই শীত যাবে না। অসুখ-বিসুখের সময় একবার ডেকে পাঠালেই হয়। এমন ওষুধ প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করবেন যে আজীবন তা মনে থাকবে দারোগার। এবার আর 'সিডলিজ্‌ পাউডার' নয়—পাকা ব্যবস্থাই করে দেবেন।

বিভুপদকেও উঠতে হল—তাঁর ডাক খোলবার সময় হয়েছে। ভিড়টা পাত্‌লা হয়ে গেল একটু একটু করে। ভৈরবনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ক্রু সাহেব একবার নড়ে চড়ে বসল, আর রঞ্জন কাছারীর সিঁড়িতে বসে দার্শনিকের নিরাসক্তি নিয়ে একটার পর একটা লবঙ্গ চিবিয়ে চলল।

—তারপর, কী মনে করে ক্রু সাহেব?—ভৈরবনারায়ণ কী একটা ভাবছিলেন। সেই চিন্তার রেশ টেনে, কপালে গোটাকয়েক ভ্রূকুটি জাগিয়ে রেখেই ছড়িয়ে দিলেন প্রশ্নটা।

—নাঃ, কিছু না।—যা বলতে এসেছিল, বলতে পারল না স্মাইদ্‌ ক্র্যাক্রু। সব কিছুর বিপর্যয় হয়ে গেছে মনের মধ্যে। অ্যাল্‌ব্যার্টের ভয় নেই, সম্মানের ভয় নেই, মার্থার ভয়ও নেই। সব ভয় হারিয়ে গেছে একটা সীমাহীন ভয়ের অতলতায়। কাঁদড়ের কাদার তলা থেকে দুটো পা। বাকী শরীরটাকে দেখা যাচ্ছে না—শুধু মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঞ্চিত একরাশ হুকের মতো বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলিকে কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্করই মনে হয়েছিল!

অনেক 'রাজবহৃদ্ধত' বর্ষার দিন ঘন নীল মেঘের কজ্জলিত ছায়া ফেলেছে লালমাটির শিলীভূত রক্তসমুদ্রে ; মাটি কেটে কেটে বয়ে গেছে খর-খড়্গের মতো ধারালো জলপ্রবাহ। শুধু মাটিই কাটেনি, কেটেছে মাটির অনেক পঞ্জরাস্থিকেও। আর একটা মাত্র মানুষের কঙ্কাল। বিবর্ণ বাদামী রঙের মাত্র কয়েক টুকরো হাড়ে আজো কি কোনো স্মারক অবশিষ্ট আছে তার ?

—এমনিই দেখা শোনা করতে এসেছিলে তাহলে ?—আর একটি অর্ধমনস্ক প্রশ্ন ভৈরবনারায়ণের।

—অনেকটা তাই।—একটা ঢোঁক গিলল ক্রু সাহেব।

—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ?

—নাঃ।

—তোমার প্রজা-পত্তন ঠিক আছে সব ?

—এখনো আছে বলেই তো মনে হয়—সহজ হবার চেষ্টা করতে লাগল ক্রু সাহেব।

—এখনো আছে বটে। কিন্তু বেশি দিন থাকবে তো ?—আত্ম-জিজ্ঞাসার মতো করেই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করলেন ভৈরবনারায়ণ।

—কেন বলছেন একথা ?

—সাধে কি আর বলছি !—ভৈরবনারায়ণের গোরুর মতো প্রকাণ্ড মুখে যুদ্ধে-আহত ষাঁড়ের মতো একটা বীভৎস কাতরতা ফুটে বেরুল : চারদিকে আগুন জ্বলবার জো হয়েছে সাহেব। এইবেলা ঘর সামলাও, নইলে পরে আর সময় পাবে না।

—আপনারা যখন আছেন, তখন আমাদের আর ভাবনা কী !—ক্রু সাহেবের গলায় একটা চাটুকারিতার আমেজ ফুটে বেরুল : তা ছাড়া বড় গাছেই ঝড় লাগে। আমরা চুনোপুঁটি, আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—তাই কি ?—ভৈরবনারায়ণ হঠাৎ যেন অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ঠলেন। একবার আড়চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লবঙ্গ-গে সে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

—আপনার কী মনে হয় ?—ক্রু সাহেব জানতে চাইল।

—মনে হয়, সময়টা পাল্‌টে গেছে। আজকাল আর বড় দিয়ে আরম্ভ য়না। কচু গাছ দিয়ে লোক হাত পাকাতে সুরু করে, তারপর কুড়ুল সাতে আসে শাল-গাছের গায়ে।

—ঠিক বুঝলাম না কথাটা।

—আরো কি স্পষ্ট করে বলতে হবে ?—আবার রঞ্জনের দিকে াড়চোখে তাকালেন ভৈরবনারায়ণ : আজ জটাধর সিংয়ের মাথায় চাট পড়েছে। কিন্তু ওটা শুধু আরম্ভ—ওর লক্ষ্য আমার মাথা পর্যন্ত।

—এসব কথা কেন আপনি ভাবছেন ?—ক্রু সাহেব কুমার বাহাদুরকে াত্বনা দেবার চেষ্টা করল : জমিদারের পাইক-পেয়াদা কখনো কি ান হয়নি ?

—হয়েছে বই কি। কিন্তু আজকের ব্যাপার তা নয়। আজকাল চাষীদের পঞ্চায়েৎ বসছে কালাপুখ্‌রীতে। জয়গড় মহলের প্রজারা বড় বশি চড়া কথা বলতে শুরু করেছে।

—আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ?

—ভয় ?—আহত ষাঁড়ের মুখে ক্ষুধার্ত সিংহের হিংস্রতা ফুটে বেরুল : ামার পূর্বপুরুষ দিনাজপুরের মহারাজার পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ড়াই করেছিল কান্তনগরের যুদ্ধে। ভয় আমাদের রক্তে নেই। লাঠির োরে আমাদের জমিদারী, লাঠির জোরেই তা রাখব। তবে ঘর-শত্রু বিভীষণ যদি কেউ থাকে, তার ব্যবস্থাটা করতে হবে সকলের আগে।

গলাটা একটু চড়িয়েই শেষ কথাগুলো বললেন কুমার সাহেব, স্পষ্ট

শুনতে পেল রঞ্জন। দুটো দাঁতের পাটির মধ্যে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালো লবঙ্গটা।

ক্রু সাহেব বিচলিত হয়ে বললে, আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝবে পরে। এখন একটা কথা মনে রেখো। একটু একটু করে যারা কাজ শুরু করেছে, তারা ছোটদের দিকেই আগে নজর দেবে। হয়তো আমার আগেই এসে পড়বে তোমার পালা।

—ভেবে দেখব—ক্রু সাহেব উঠে পড়ল।

—চললে ?

—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে। কাল পরশু আসব।

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল ক্রু সাহেব। ক্লান্ত শিথিল ভঙ্গিতে তুলে নিলে পড়ে থাকা সাইকেলটা। না, অ্যাল্‌বার্টের কথা সে ভাবছে না। জটাধর সিংয়ের মৃত্যু যে ঝড়ের পূর্বাভাস বয়ে এনেছে তার কথাও না। শুধু সেই জলে-ধুয়ে যাওয়া ছবিটা। বাদামী হাড়গুলোকে এখনো কি কেটে কেটে নিঃশেষ করতে পারেনি সময়ের ঘুণেরা ?

—ঠাকুর বাবু ?

রঞ্জন চমকে উঠল। কুমার বাহাদুর ডাকছেন।

—মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে রয়েছে। চলুন, একটু পড়বেন।

আশ্চর্য কোমল গলার স্বর। প্রীতি আর দাক্ষিণ্যে স্নিগ্ধ। অপূর্ব অভিনয় করতে পারেন কুমার বাহাদুর; অমায়িক করুণায় মধুর হাসি হাসতে পারেন ছুরিতে শান দিতে দিতে।

—গীতা ?—নিজের গলার স্বরে বিস্ময়ের চমকটা সে চেষ্টা করেও রোধ করতে পারল না।

—হাঁ, বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ। কী যেন সেই : 'পশ্যামিদেবস্তবদেবদেহে'—

—চলুন—

অনুগত বিনয়ে উঠে দাঁড়ালো রঞ্জন।

সন্ধ্যা।

গীতা পাঠ শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বরূপ-দর্শন যোগের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কখন আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কুমার বাহাদুর। দুজন চাকর এসে প্রাণপণে দলাই-মলাই শুরু করেছে তাঁর হাত-পা। আর সেই ফাঁকে গীতা নামিয়ে রেখে উঠে পড়েছে রঞ্জন।

নিজের ঘরে এসে আলো জেলে দেখল টেবিলের ওপর একটা চিঠি। মিতার চিঠি। ভালোবাসার সেই প্রথম পর্বের মতো আজ আর নীল খামে চিঠি লেখেনা মিতা। পৃথিবীর মাটিটা বড় বেশি ধূলোয় আজ আকীর্ণ, তাই অম্লান আকাশের নীল আর চোখে পড়বার উপায় নেই। সেই নীলকে আবার খুঁজে পাবার জন্যেই তো এই ধূলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা; শান্তি আর পরিতৃপ্তির শয্যাতে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবার জন্যেই তো আজকের এই বিহ্বল জড়তা-ভঙ্গের দাবী।

নীল খাম নেই, তবু ছেলেমানুষি অভ্যাসটা আজো যায়নি মিতার। সেই কোণাকুণি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিচিত্র ভঙ্গি। কৈশোরের স্বপ্নরঙ্গিনী সংঘমিত্রা—মিতা। আজ সে মিতাই বটে। তার এই কর্মক্ষেত্রের নতুন উদ্দীপনা।

চিঠিটা খুলল। ঝুঁকে পড়ল তার ওপর।

"শোনো। প্রথমেই কাজের খবর দিই।

মুকুলদা তোমার চিঠি পেয়েছেন। বললেন, লোক এখনো এত কম যে ওখানে যাবার তেমন সুবিধেমতো কাউকে পাঠাতে পারছেন না।

তোমাকে ওখান থেকেই যতদূর সম্ভব তৈরী করে নিতে হবে। তবে দু এক সপ্তাহের মধ্যে হয়তো দাদাকে একবার পাঠানো যেতে পারে। দাদা গেলে কাজেরও সুবিধে হবে, তুমিও খুশি হবে নিশ্চয়। এ সম্বন্ধে পার্টিকুলারস্ উনি পরে তোমায় জানাবেন। তোমার সমিতির জন্য বইপত্রও দাদার সঙ্গে যাবে।

এবার তোমাকে একটা ইণ্টারেস্টিং ঘটনা বলি।

সেদিন সুতপাদি' এসেছিলেন।

সুতপাদি'কে নিশ্চয় ভোলোনি। আর ভোলবার কথাও তো নয়। তোমার যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে আছে, তাতে সুতপাদি'কে নিয়ে কত কথার জালই না তুমি বুনেছ! আমাদের নেতা বেণুদাকে তিনি ভালোবাসতেন, অথচ জীবনে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেন না। সুতপাদি'র ঠাকুরদার একটা আজগুবী খেয়াল, তিনি নাকি ওঁকে গোপীবল্লভের পায়ে নিবেদন করে দিয়েছিলেন।

এ নিয়ে তুমি তো খুব রোম্যাণ্টিক্ গল্প লিখেছ। কিন্তু জীবন কি তাই? সেদিনকার বিপ্লববাদের ভেতরে যে রঙ্ ছিল, সেই রঙের সঙ্গেই একাকার হয়ে ছিল এই দুঃখবিলাস। কিন্তু আজ রঙ্ নেই আর। এখন সুতপাদি' অন্য রকম।

খুব মোটা হয়ে গেছেন আজকাল—আগেই লিখেছিলাম তোমায়। বড় বড় মোটরে চড়ে প্রায়ই এখানে ওখানে সভা-সমিতির উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। চেয়ারে বসলে বেশ মানায় কিন্তু ওঁকে। চমৎকার বক্তৃতাও দিতে শিখেছেন। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে রাজনীতির এমন একটা সামঞ্জস্য করে নিয়েছেন যে ওঁর ক্ষমতার ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। সেদিন বৈদান্তিক সাম্যবাদের ওপর একটা বক্তৃতা করলেন 'আর্যরক্ষণ সভায়'। কাগজে করে অনেক সংস্কৃত শ্লোক টুকে এনেছিলেন।

ওসব কথা যাক। যা বলছিলাম। আমার কাছে এসেছিলেন কেন জানো? চমকে উঠো না, ওঁর নিজের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে।

হাঁ—ওঁর নিজের বিয়ে। বয়েস তো কম হলনা, কতদিন আর এমন করে প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে বেচারা? গোপীবল্লভের কথা ভাবছ? কিছু না। সুতপাদি' আজকাল শাস্ত্র পড়ছেন, কাজেই শাস্ত্রমতেই সব কিছুর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। খুব সম্ভব, তুলসী পাতায় গোপীবল্লভের নাম লিখে ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে। তা ছাড়া শাস্ত্রমতে গোপীবল্লভের স্ত্রী-ভাগ্য তো নেহাৎ মন্দ নয়—ষোলোশো রয়েইছে, সুতপাদি'কে ছেড়ে দিলে খুব বেশি অসুবিধে হবে না তাঁর।

কার সঙ্গে বিয়ে? সারদাবাবুর মেজ ছেলে রণদা চক্রবর্তীর সঙ্গে। রণদা চক্রবর্তী এখন এখানকার ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, গত বছর স্ত্রী মারা যাওয়াতে ভারী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ছিলেন। সুতপাদি' তাঁকে সারা জীবনের মতো সান্ত্বনা দেবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

আমাকে কিছু উপদেশও দিলেন। বললেন, কী হচ্ছে এসব পাগলামি? ওই সব ছোটলোক ক্ষেপিয়ে দেশ উদ্ধার হয় কোনোদিন? তা ছাড়া এ ভাবেই বা আছিস কেন? রঞ্জনকে আসতে বলে দে এবার, বিয়েটা সেরে নে। বারো বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা এ তোদের যে কী প্রেম, আমি বুঝিনা।

আমি বললাম—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বললাম:

'বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধু তীরে—'

কবিতা শুনে রাগ করে উঠে গেল। বললে, চুলোয় যা। কিন্তু বিয়েয় অবশ্য আসবি। আচ্ছা, সত্যিই কি আমাদের—"

চিঠির বাকীটুকু নিজের মনের কাছেও যেন লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। মিতা—তার সেই ছোট্ট মিতা, আজ আর হরিণের সঙ্গে ছুটোছুটি করে না, তার সময় নেই। কিন্তু হরিণের মতো তার মনটি নিজের ভেতর থেকে কখন যে গাঢ় দুটি নীল চোখ মেলে তাকায়, মিতা নিজেই কি তা জানতে পারে?

—বাবু!

রঞ্জন হঠাৎ চমকে উঠল। জানলার বাইরে থেকে ডাক আসছে।

—বাবু?

মেয়েলি গলা। বাইরের অন্ধকার বাগানে কে একটি মেয়ে এল এমন সময়ে?

—কে?

যে ডাকছিল, সে এগিয়ে এল জানলার কাছে। লণ্ঠনের আলো পড়ল দুটি প্রাণবন্ত চোখের ওপর, একখানা কালো স্মিত মুখশ্রীকে উদ্ভাসিত করে।

কালোশশী!

—কিরে, তুই এই বাগানে? এই অন্ধকারে?

—তোকে খবর দিতে এলাম।

—তুই আবার কী খবর দিবি? পরশুরাম এসেছে নাকি?

—না—না! আজ রাতে ফের পঞ্চায়েৎ বসবে কালা-পুখরীতে। তোকে যাবার কথা বললে সোনাই মণ্ডল।

—কিন্তু—অসীম বিস্ময়ে রঞ্জন বললে, এ খবর নিয়ে এলি কেমন করে?

কালোশশী মুখ টিপে হাসল, জবাব দিলে না।

—তুই এলি কেন ?

—ওরা তো কেউ এ বাগানে ঢুকে এমন করে খবর দিতে পারত না।

—তা পারত না। কিন্তু তোর এমন সাহস হল কী করে ? যদি পাইক-পেয়াদারা তোকে এই বাগানে ঢুকতে দেখতে পেত, কী হত তখন ?

—আমার ঝাঁপিতে তাজা সাপ থাকে বাবু, তাজা তার বিষ—কালোশশী হাসল।

—তা বটে।

রঞ্জন আর কথা বলতে পারল না। তাজা সাপকে যে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে দিনের পর দিন মাতাল করে নাচাতে পারে, পৃথিবীর কোনো সাপকেই তার ভয় নেই। বিষকন্যা হয়ে যে জন্মেছে, কোনো বিষই তাকে দহন করতে পারেনা কোনো দিন।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলনা। তার আগেই অন্ধকারের ভেতর আরো অন্ধকার একটা ছায়ার মতো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল কালোশশী।

আট

রাত্রে খেতে বসে আলিমুদ্দিন মাস্টার দেখলেন, বেশ বড় বড় পাকা মাছের টুকরো।

—এ মাছ কোত্থেকে এল ?

—শাহু পাঠিয়ে দিয়েছে জনাব। ধাওয়ারা আজ বিল থেকে বড় বড় দুটো রুই ধরেছিল।—ভৃত্য জিব্রাইল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলেন।

শাহু পাঠিয়েছে! সামান্য স্কুল-মাস্টারের ওপর ফতে শা পাঠানের কেন এই অযাচিত অনুগ্রহ ? হঠাৎ যেন খুলে গেছে সৌভাগ্যের দরজা। দামী হয়ে উঠছেন তিনি। মূল্য বেড়ে গেছে নিজের—আকস্মিক একটা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

কারণটাকে খুঁজে পেতে দেরী হলনা মনের মধ্যে। শাহুর বৈঠকখানায় সকালে সেই বক্তৃতার পুরস্কার এটা। 'পাকিস্তান হামারা'। মুসলমানের জন্যে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র—নতুন মাটিতে বিজয়ী ইস্‌লামী ঝাণ্ডার নবজন্ম। খুশি হবার কারণ আছে বইকি ফতে শা পাঠানের। আবার হয়তো চোখের সামনে স্বপ্ন দেখছে নতুন কোনো শাহী আমলের। পাকিস্তান এলেই আবার গিয়ে চড়াও হবে তখ্‌ত-এ-তাউসে, হাতে মাথা কাটতে পারবে হাজার হাজার মানুষের।

মাছের একটা টুকরো নাড়তে নাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন।

না, আর তা হতে দেওয়া যাবেনা, আর ফিরে আসবেনা সেই স্বর্ণযুগ। তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে শিকল খুলে যাবে সমস্ত মানুষের। সেখানে গরীবের বুকের রক্ত শুষে টাকার পাহাড়ে চড়ে

বসতে পারবেনা বখিলের দল, সেখানে কোরবানীর মাংস সকলে ভাগ করে খাবে, নাদানেরা প্রার্থীর দু হাত ভরে জাকাত দেবে, খুলে দেবে এতিমখানা, বিলিয়ে দেবে সর্বস্ব। সেখানে ইমানদার মানুষ হজরতের মতো পিঠ পেতে দেবে প্রাপ্য 'কোড়া'র হিসেব মিটিয়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু ফতে শা পাঠানেরা কি তাই চায়? জীবনের সমস্ত অসত্য—শোষণ, মিথ্যা, অন্যায়—সব 'না-পাক্'কে বর্জন করে এরা কি কামনা করে সেই সত্যিকারের পাকিস্তান?

যদি না চায়, তবে এদের সঙ্গেই আবার শুরু হবে নতুন করে লড়াইয়ের পালা। সে লড়াইয়ের জন্যে মন তৈরীই আছে আলিমুদ্দিন মাস্টারের। এতদিন ধরে সত্যাগ্রহের কঠিন দীক্ষা তো তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কোনো অন্যায় সহ্য করবনা, কোনো ফাঁকি বরদাস্ত করবনা। ইংরেজের কাছ থেকে দেশকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে তাকে ফের তুলে দেবনা ফতে শা পাঠানের হাতে। শাহী আমলের মোহ আর নেই, প্রতিষ্ঠা করব দীন-দুনিয়ার মানুষের রাজত্ব।

জিব্রাইল আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

—খাচ্ছেন না মাস্টার সাহেব? কী ভাবছেন?

—হাঁ, খাচ্ছি—ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়েই আবার একটি ছবি মনে এল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ ঠিকরে পড়ছে বাদিয়াদের পাড়ায়। দাওয়ার ওপর অদ্ভুত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে বসে আছে এলাহী।

—মেয়েটার গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে হুজুর।

—শাহুর ওখানে বাঁদীর কাজ করত, শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।

শাদা দাঁত বের করে কেমন বিশ্রী ভাবে হাসছে হোসেন। হাতের ধারালো হাসুয়াটা ঝক্‌ঝক্ করছে।

ধর্মবাপ! তাই বটে। হঠাৎ অসহ্য ঘৃণায় শরীরের মধ্যে মোচড়

খেয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। শান্‌কীতে এই মাছের টুকরোগুলো যেন একটা কুৎসিত ব্যাধির বীজাণুতে আকীর্ণ। মৃত্যুযন্ত্রণায় মলিন একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল দৃষ্টির সামনে। যেন অভিশাপ দিচ্ছে, যেন একটা প্রলয়ের সূচনা আসছে ঘনিয়ে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার উঠে পড়লেন।

—ওকি, খেলেন না?—ক্ষুব্ধ গলায় জানতে চাইল জিব্রাইল।

—না, খেতে পারছি না—সংক্ষেপে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—শরীর খারাপ?

—না, না, সে সব কিছু না। মুখ ধুতে ধুতে আলিমুদ্দিন আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—কিন্তু মাছটা বড্ড ভালো ছিল জী।—জিব্রাইলের স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল: তবে কি রসুই ভালো হয়নি?

—না, না, খুব চমৎকার হয়েছে। আমি এমনিই খেতে পারছি না—খড়মের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, তবু শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গুমোট গরম একরাশ তপ্ত বাষ্পের মতো জড়ো হয়ে আছে, শুলেও ঘুম আসবেনা। তার চাইতে বারান্দার এই তক্তোপোষটাতেই বসা যাক।

বেশ নির্জন জায়গায় বাসাটি। পেছনে একটা আমের বাগান ছাড়া বাকী দুদিকেই মাঠ। বাঁ পাশে একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর দশ বারোটা তাল গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার তলা থেকে কুমীরা বিল শুরু। এই অন্ধকারেও চোখে পড়ল—বিলের একফালি চকচকে জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে।

তক্তোপোষের ওপরে ছেঁড়া সতরঞ্চিটায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন আলিমুদ্দিন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে এল জিব্রাইল। খাটের তলা থেকে টেনে বের করলে গড়গড়াটা, কলকে চাপালো তার মাথায়, তারপর নলটা আলিমুদ্দিনের হাতে তুলে দিলে।

—মাস্টার সাহেবের মন-মেজাজ কি ভালো নেই ?

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে জিব্রাইল। ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায় ভালো করে, জেনে নিতে চায় মাস্টার সাহেবের মানসিক অবস্থাটা।

—একথা কেন বলছ ?—অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন আলিমুদ্দিন।

—না, তাই দেখছি—একটা চৌপাই টেনে নিয়ে সঠিক বুঝে নেবার জন্যে আসন নিয়েছে জিব্রাইল। বিদেশী মাস্টার সাহেবের দেখাশুনো করবার কর্তব্যটা এখানে যখন তারই, তখন সে দায়িত্বকে সে তো অবহেলা করতে পারেনা।

—কী হয়েছে তাহলে ? কারুর সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়া-ঝাঁটি ?

গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে আলিমুদ্দিন বললেন, মিথ্যে ওসব ভাবছ জিব্রাইল, আমার কিছু হয়নি ।

এইবার জিব্রাইল চুপ করল, আলিমুদ্দিনও চুপ করলেন। ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে কালো রাত্রির স্রোত তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। এই অন্ধকারেও পালনগরের বুরুজটা কালি দিয়ে মোছা একটা ছবির ঝাপসা ছাপের মতো দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণের কোণটায় যেখানে দু তিনটি আলো দপ দপ করে উঠছে, ওইটেই বাদিয়াদের গ্রাম। ওইখানে এলাহী বক্সের মেয়ে বিষের যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু কি ওখানেই ? আরো কত—কত সংখ্যাতীত, কত দৃষ্টি আর মনের অগোচর। এমনি করে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে বিষ-যন্ত্রণায়। কে তাদের সন্ধান রাখে ? আর—আর এদের বনিয়াদের ওপরেই কি গড়ে উঠতে পারে পাকিস্তান…গুলিস্তাঁ হামারা ?

সামনে মাঠের পথ দিয়ে তুজন লোক চলছিল লণ্ঠন হাতে। এই চুপ করে বসে থাকার বিরক্তিটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই যেন জিব্রাইল ডাকল : কে যায় ?

—জলিল আর রসিদ ধাওয়া।—একজন উত্তর দিলে। গলার স্বরটা জড়ানো।

জিব্রাইল বললে, দারু টেনে এসেছে ব্যাটারা।

—মদ ?—আলিমুদ্দিন চকিত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ, খুব খায়। জিব্রাইল ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে বললে, গোপালপুরের হাটে মাছ বেচতে যায়, সেখান থেকে পেট ভরে টেনে আসে। গোপালপুরের সরকারী দোকানটাকে ওরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে।

—সেকি কথা! মুসলমানের বাচ্চা!—উত্তেজিত শিরাগুলো মুহূর্তে উদ্যত হয়ে উঠল : ডাকো, ডাকো তো ওদের। কী অন্যায়! এদিকে পেট পুরে তুমুঠো খেতে পায়না, অথচ মদের বেলায়—

—এই জলিল, এই রসিদ মিঞা—হাঁক দিলে জিব্রাইল।

—এখন চেঁচিয়ে মরছ কেন মিঞা? মাছ নেই সঙ্গে—আবার জড়িত উত্তর এল দূর থেকে।

—শুনে যা ব্যাটারা। মাস্টার সাহেব ডাকছেন।

—কে ডাকছেন ?

—মাস্টার সাহেব, মাস্টার সাহেব। শিগ্‌গির আয় এদিকে—

লোক তুটো থামল। নিজের মধ্যে কী একটা আলোচনা করল চাপা গলায়। তারপর পেছন ফিরল। ধীরে ধীরে ভীরু পায়ে মাস্টারের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

—আদাব মাস্টার সাহেব!

—আদাব—

সংক্ষেপে প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোর দিকে তাকালেন আলিমুদ্দিন। হ্যাঁ, মুখ-চেনা মানুষ। মাছের বাঁক কাঁধে নিয়ে দ্রুতগতিতে এদের পথ দিয়ে চলে যেতে দেখেছেন বহু দিন। কিন্তু বিষণ্ণ আলোয় এমন করে এদের মুখগুলিকে দেখবার সুযোগ আগে তাঁর কখনো ঘটেনি।

একজনের বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। শাদা রঙ্ ধরেছে দাড়িতে। জটা-বাঁধা চুলগুলো লালচে; অতিরিক্ত জল ঘাঁটার স্বাক্ষর, অথচ চুলে কখনো তেল পড়েনি। কালিপড়া চোখের কোটরে বিষণ্ণ নির্বাপিত দৃষ্টি। আর একজনের বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মিশমিশে কালো রং—সারা গা ভর্তি থরথরে চুলকানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লণ্ঠনের আলোয়—কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে।

মাস্টারের সামনে লোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল বিনীত ভঙ্গিতে। স্পষ্ট দেখা গেল, নেশায় তাদের পা টলছে। অসহ্য ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলেন মাস্টার।

—তোরা মুসলমান ?

—জী।—লোক দুটো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তাকিয়ে রইল অবোধের দৃষ্টিতে।

—মদ খাস ?—আলিমুদ্দিনের স্বর কঠোর হয়ে উঠল।

—জী।—তেমনি অসংকোচ উত্তর এল।

—জী !—আলিমুদ্দিন জ্বলে উঠলেন: বলতে সরম লাগল না? মুসলমানের বাচ্চা হয়ে মদ খাস, গুণাহ্ হয় তা জানিস ?

নেশার ঝোঁকে তারা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর বয়স্ক লোকটা—জলিল—মাতালের হাসি হেসে জড়িত গলায় বললে, জী। কিন্তু সবাই খায়। থানার জমাদার সাহেব, শাহু—

মুখের ওপর প্রবল একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল কথাটা। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। এ প্রশ্নের এমন একটা উত্তর তিনি আশঙ্কাও করেননি। একবারের জন্য মনে হল, এ মানুষগুলোর অপরাধের বিচার করবার অধিকার সত্যি সত্যিই তাঁর আছে তো?

কিন্তু অবস্থাটাকে সহজ করে দিলে জিব্রাইল।

কষে একটা ধমক দিলে সে।

—মুখ সামলে কথা বল্ বেয়াকুবের দল। জমাদার সাহেব আর শাহু কী করে, সে খোঁজে তোদের দরকার কী?

জলিল একটু বিনীত হাসি হাসল: জী, সে তো ঠিক। তবে মাস্টার সাহেব জানতে চাইলেন, তাই বললাম।

গড়গড়ায় আর একটা টান দিয়ে নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, মদ খাস কিসের জন্যে?

—সারাদিন হাড়ভাঙা মেহন্নত করে তবে খাব কী জনাব?—পাল্টা প্রশ্ন এল রসিদের তরফ থেকে।

—কী খাব জনাব?—জিব্রাইল দাত খিঁচিয়ে উঠল: বলতে লজ্জা করে না? এদিকে পেটে ভাত নেই, ঘরের চালে খড় নেই, ওদিকে রোজগার সব ঢালা হচ্ছে গোপালপুরের আবগারী দোকানে! কেন, ওই পয়সা দিয়ে কিনতে পারিসনা ভাত-কাপড়, ছাউনি দিতে পারিসনা ঘরের চালে?

—ঘরের চাল!

হঠাৎ লোক দুটো সমস্বরে হা হা করে হেসে উঠল। অদ্ভুত ভয়ঙ্করভাবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে লহরে লহরে বয়ে গেল সে হাসির শব্দ; ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, গড়গড়ার নলটা

খসে পড়ল হাত থেকে। না—এ মাতালের হাসি নয়। একটা বুককাটা কান্না যেন হাহাকার করে বেরিয়ে এল খানিকটা অট্টহাসির ছদ্মবেশে।

—কী, অমন করে হাসছিস যে?

তীব্র গলায় আবার একটা ধমক দিতে চেষ্টা করল জিব্রাইল। কিন্তু সে হাসিতে এবার আর তারা দমে গেলনা, আবার খানিকটা ক্ষ্যাপার মতো প্রচণ্ড হাসি তরঙ্গিত হয়ে বয়ে গেল অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে।

—ঘর! ঘর বেঁধে কী হবে? আজ আছি, কালই চালা কেটে তুলে দেবে শাহু। কী হবে ঘর দিয়ে?

—চুপ!—বজ্রকণ্ঠে বললে জিব্রাইল।

—চুপ করেই তো আছি মিঞা। আমাদের তো জবান বন্ধ হয়েই আছে। শুধোলে, তাই জবাব দিলাম।

খানিকক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে লোক দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন, চুপ করো জিব্রাইল। যা বলবার আমি বলছি।

চোখ পাকিয়ে জিব্রাইল বললে, না সাহেব, বড্ড বাড় বেড়েছে লোকগুলোর। শাহুর নামে যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছে। একবার যদি কানে যায়—

কিন্তু মদের নেশায় ভয়ডর কেটে গেছে লোকগুলোর—মনের ওপর থেকে সরে গেছে আশঙ্কা আর আতঙ্কের সূক্ষ্ম আবরণটা। জীবনে পিছু হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে আর সরবার উপায় নেই। এবার হয় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নইলে হারিয়ে যাবে অতল একটা খাদের ভেতর।

—মূর্দাকে আবার গোরের ভয়!—তিক্ত কণ্ঠে বললে রসিদ।

জলিল সেই কথাটারই জের টানল: কানে গেলে কী করবে শাহু?

ঘর তুলে দেবে, এই তো? তাতে আর কী হবে? বানের পানিতে ভাসতে ভাসতে এসেছি, ভাসতে ভাসতেই চলে যাব। আর মিথ্যে ভয় দেখিয়োনা মিঞা। ব্যাগার খেটে গায়ের রক্ত জল করে দিলাম, জুতোর ঘা খেয়ে পিঠে আর জায়গা নেই কোথাও। কাকে ভয় করব দুনিয়ায়?

—ওই জন্যেই তো দারু খাই। নইলে বাঁচব কী করে?

আলিমুদ্দিন তেমনি তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে, কিছুক্ষণ যেন জিব্রাইলও একটা কথা বলবার মতো খুঁজে পেলনা। ভয়ের শেষ সীমান্তে এসে যে মানুষ নির্ভয় হয়ে গেছে, কেমন করে দমিত করা যাবে তাকে? কোন্ উপায়ে তাকে বশীভূত করা সম্ভব?

আলিমুদ্দিন নিজেকে সংহত করে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, তবু তো মুসলমান। মুসলমানের কী মদ খেতে আছে?

—আমরা কি মুসলমান?—তেমনি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল জলিল। লোকটার নেশা কি কেটে গেল নাকি?

—কী বলছিস উল্লুক?—জিব্রাইল নিজেকে সামলাতে পারলনা।

—সত্যি কথা শুনলে তোমাদের তো ভালো লাগেনা মিঞা। কান কট্‌কট্‌ করে। আমরা মুসলমান! তাহলে মস্‌জিদে আমরা ঢুকতে পাইনা কেন? কেন নামাজের সময় আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়?

—সে কি!—আলিমুদ্দিন চমকে উঠলেন।

—ইমাম সাহেব আমাদের দেখলে কেন মুখ ফিরিয়ে চলে যান?—আবার প্রশ্ন করল জলিল।

—কী বলছে এরা? এও কি সম্ভব? এ জিনিস আছে নাকি ইসলামের মধ্যে?—সীমাহীন বিস্ময়ে কলের পুতুলের মতো যেন কথাগুলো আবৃত্তি করলেন আলিমুদ্দিন, বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে।

অপরাধীর মতো নতনেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জিব্রাইল। তারপর বললে, এরা যে ধাওয়া।

—তাতে কী?

—এরা মাছ ধরে।

—বেশ তো।

মাটিতে একবার থুথু ফেলে জিব্রাইল বললে, কাছিমও ধরে। হারাম।

—তাতে এমন কী অপরাধ হল?

—অপরাধ হলনা? তোবা তোবা। আপনি বলছেন কী মাস্টার সাহেব?

রসিদ জ্বলে উঠল হঠাৎ।

—মাছ ধরবনা, কাছিম ধরবনা, তবে খাব কী? তোমরা খেতে দেবে? সে বেলায় তো কোনো চাচার দেখা নেই।

জিব্রাইল বললে, এই—খবর্দার!

—না, না, তুমি থামো।—ক্লান্ত অবসন্ন গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, ব্যাপারটা আমাকে একবার ভালো করে সব বুঝে নিতে দাও। সত্যিই কি এদের মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হয়না?

—না।

—হিন্দুদের ছোটজাতের মতো মুসলমান হয়েও এরা অস্পৃশ্য?

—ঠিক তা নয়, তবে—জিব্রাইল দ্বিধা করতে লাগল: তবে, ভেবে দেখতে গেলে অনেকটা তাই দাঁড়ায় বটে। তবে আমাদের আর দোষ কী বলুন, মোল্লাদের ফতোয়া তো মানতেই হবে।

—হ্যাঁ, মোল্লা সাহেবদের ফতোয়া!—রসিদ আবার বিকৃতমুখে বললে, হুকুম দিতে কোনো খরচা নেই। কিন্তু সব মিঞাকেই চিনি। আমাদের জবান দেখলেও তো গুণাহ্ হয়, কিন্তু আমাদের ধরা মাছ তরিবৎ করে জবানে তুলতে একটুও তো গুণাহ্ হয়না পীর সাহেবদের।

জিব্রাইল কী একটা বলবার জন্ম উদ্যত হয়ে উঠছিল। আলিমুদ্দিন বললেন, থামো। সব আমায় ভালো করে শুনে নিতে দাও। বলো রসিদ, আর কী বলবার আছে তোমাদের ?

—কী আবার বলব !—রসিদের মুখ আরো বিকৃত হয়ে উঠল: বললেই বা কে শুনতে যাচ্ছে আমাদের কথা ? আমরা মানুষ নই, মুসলমানও নই, আমরা জানোয়ার। তাই মরলে পরে সকলের সঙ্গে আল্লাতলীতে আমাদের জায়গা হয়না—আমাদের মুর্দাকে গোর দিতে হয় ভাগাড়ে। গোরু-ঘোড়ার মতো আমরা বাঁচি, তাই মরবার পরেও গোরু-ঘোড়া ছাড়া আমাদের আর ঠাঁই কোথায় ?

—ইয়া আল্লা !—আলিমুদ্দিন মাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন: এমন তো কখনো শুনিনি।

—শুনে লাভ কী মাস্টার সাহেব ? বেফয়দা সময় নষ্ট হবে।

—হুঁ !—আলিমুদ্দিন চুপ করে রইলেন। দুপুর থেকে পর পর এই দুটো ঘটনা যেন মনের মধ্যে মেঘের মতো এসে ছায়া ফেলছে। ম্লান করে দিয়েছে উদ্দীপ্ত উৎসাহটাকে—একটা কুয়াশার অস্বচ্ছ আড়াল টেনে নিষ্প্রভ আর বিবর্ণ করে দিচ্ছে পাকিস্থানের উজ্জ্বল স্বপ্ন-ছবিকে। সারা দীন-দুনিয়ার মানুষের যে আজাদ-পৃথিবীর ধ্যান তিনি করে এসেছেন এতকাল, একি তারই ভিত্তি ? নাকি এ কোনো চোরাবালির বনিয়াদ, যার ওপরে এক মুহূর্তও ভর সইবে না ?

—আচ্ছা, আমিই এসবের ব্যবস্থা করছি—একটা নিশ্চিন্ত প্রতিজ্ঞার মতোই যেন স্বগতোক্তি করলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার: এ চলবে না। কোনোমতেই না।

রসিদ ধাওয়া বললে, এবার আমরা চলি মাস্টার সাহেব। রাত হয়ে গেছে।

—একটু দাঁড়াও।—নিভে-যাওয়া গড়গড়ায় ব্যর্থ একটা টান দিয়ে নলটা নামালেন আলিমুদ্দিন : আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ইস্কুলে পাঠাও তোমাদের চ্যাংড়াদের ?

—ইস্কুলে! কী হবে ?

—কেন, লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে।

—খরচা কোত্থেকে আসবে জনাব ?

—সে ব্যবস্থা আমি করব—মুঠোর মধ্যে আকস্মিকভাবে যেন অবলম্বন করবার মতো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন আলিমুদ্দিন : ওদের বিনা পয়সায় পড়বার ব্যবস্থা করে দেব।

—কী হবে সময় নষ্ট করে ?—একটা নিরুত্তাপ অবজ্ঞা ফুটে বেরুল জলিলের গলায় : তার চেয়ে তখন বিলে মাছ ধরলে কাজ দেবে।

—না, তা হবে না।—আলিমুদ্দিন কঠিন হয়ে উঠলেন : আমি বলছি। কাল সকালে ধাওয়া পাড়ার সমস্ত ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দেবে।

—না সাহেব,সে মেহেরবানিতে আর দরকার নেই। আর আমরা মাছ ব্যাগার দিতে পারব না।

—মাছ ব্যাগার! কে চাইছে ?

—বাঃ, চিরকাল তাই তো হয়ে আসছে। বিনা উপকারেই ব্যাগার দিতে দিতে জান বেরিয়ে গেল, উপকার করলে আর রক্ষা আছে ?

—বলছে কী, জিব্রাইল ?—আলিমুদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে : এদের মাছও কি এই ভাবে নিয়ে নেওয়া হয় নাকি ?

জিব্রাইল অগ্নিবর্ষী চোখে লোকগুলোকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইল : না জনাব, সব কথা বড্ড বাড়িয়ে বলছে এরা। খাজনা তো ঠেকায় বছরে দু চারগণ্ডা পয়সা, কিছু দেবে না তার বদলে ? তোলা দেবে না জমিদারকে, থানার দারোগাকে ?

—তোলা!—জলিল দপ্ করে উঠল: ওকে তোলা বলে! আমাদের মুখের গরাস, পেটের ভাত কেড়ে নেওয়াকে বলে তোলা? এই তো হানিফের বড় ব্যাটাটা মর-মর, সরকারী দাওয়াখানার ডাক্তার সাহেব বললে, শহর থেকে ভালো ওষুধ না আনলে বাঁচানো যাবে না। আজ হানিফের জালে যখন এই বড় বড় দুটো রুই মাছ পড়ল, তখন বেচারা ভাবল, বাজারে গেলে অন্তত দুগণ্ডা টাকা পাবে। কিন্তু পেল কিছু? শাহুর পাইক এসে মাছ দুটোই তুলে নিয়ে গেল। আল্লার নাম নিয়ে পায়ে ধরে কাঁদল হানিফ, রোগা ব্যাটাটার দোহাই দিলে, লাথি মেরে মাছ কেড়ে নিয়ে গেল। এর নাম তোলা?

অসহ্য ক্রোধে জিব্রাইল হতবাক হয়ে রইল।

—মরবার পাখনা উঠেছে। এইবার জাহান্নামে যাবি।

—জাহান্নামে মোল্লারা তো আগেই পাঠিয়েছে। নতুন করে আর ভয় কী?—চটাং করে জবাব দিলে রসিদ। তারপর জলিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, চলো চাচা, রাত হয়ে গেল।

—হ্যাঁ চল্। আচ্ছা মাস্টার সাহেব, আদাব।

কিন্তু মাস্টার সাহেব সেই যে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন, একটা প্রত্যভিবাদন পর্যন্ত তিনি জানাতে পারলেন না। তীব্রতম আঘাত পড়েছে, সাপের বিষের মতো একটা দুর্বিষহ জ্বালা ধরেছে সর্বাঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যেন জ্বলে যেতে লাগল। এতদিন পরে, এইবারে মন যেন স্পষ্ট কণ্ঠে তাঁর কাছে উপস্থিত করল একটা নির্মম কঠিন প্রশ্ন: তাঁর সত্যিকারের স্থান কোথায়? ওই শাহুর বৈঠকখানায়, না নির্যাতিত এই অমানুষগুলোর বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে?

অস্বস্তিটাকে কাটাবার চেষ্টা করল জিব্রাইল।

—ওসব কথা কানে তুলবেন না মাস্টার সাহেব। মদের ঝোঁকে বলে গেল, কোনো মাথামুণ্ডুই নেই ওসবের। কাল সকালেই দেখবেন সোজা ঘাড় আবার নুয়ে পড়েছে মাটিতে। সামনে এসে ভুঁয়ে লুটিয়ে সেলাম বাজাবে তখন—এই বলে রাখলাম।

আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন না। অন্ধকার, কালি-ঢালা মাঠ। বিলের জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে। দূরে পাল-বুরুজের চূড়োটা যেন কবরখানার বুকের ভেতরে জেগে আছে নিঃসঙ্গ একটা অতিকায় জিনের মতো। সারি সারি তালগাছ সামনে কাঁদছে রাত্রির বাতাসে। সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, জট পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে চিন্তার তন্তুজাল। আবার কি নতুন করে ভাবতে হবে, আবার কি শুরু করতে হবে গোড়া থেকেই ?

গুলিস্তাঁ হামারা। কিন্তু কোন্ গুলিস্তাঁ ?

ধাওয়ারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে লণ্ঠনের আলো। এলাহী বক্স, ধাওয়ারা—সেইখানেই কি শেষ ? আরো কত—কত সংখ্যাহীন, কত অজস্র ?

আর তৎক্ষণাৎ একটা কথা মনে পড়ল বিদ্যুৎ-চমকের মতো।

—ওই মাছগুলো শাহুর ওখান থেকেই ভেট দিয়ে গেছে, না জিব্রাইল ?

আকস্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে জিব্রাইল বললে, জী !

সমস্ত পেটটা পাক দিয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাছ নয়, একটা মুমূর্ষু মানুষের বুকের মাংস যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছেন তিনি ! দ্রুতবেগে উঠে চলে গেলেন ভেতর দিকে।

বিহ্বল জিব্রাইল শুনতে পেল আলিমুদ্দিন বমি করছেন !

নয়

কালা-পুখ্‌রি নাম বটে, কিন্তু শাদা কালো কোনো পুকুরেরই এখন নিশানা নেই কোথাও। কোনো একদিন হয়তো ছিল, কিন্তু কবে মজে বুজে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে বরিন্দের এই ঢেউ-খেলানো মাটির সঙ্গে। তবু কালা-পুখ্‌রি নামের এই অঞ্চলটাই অপেক্ষাকৃত সমভূমি। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতা চোখে লাল ধূলোর ঝাপ্‌টা ছুড়ে মারে না, স্তব্ধ শূন্যতা মুখর হয়না ক্ষুধার্ত শকুনের কান্নায়। কিছু আম-কাঁটালের ছায়া আছে, কয়েক ঝাড় বাঁশ আছে; দু একটা নারকেল গাছও আছে—তবে ফলন ভালো হয় না, ডাবগুলো শাঁসে জলে পুরন্ত হয়ে ওঠবার আগেই কাঠবেড়ালীতে খেয়ে শেষ করে দেয়। কখনো কখনো আকন্দ ফুলের গন্ধ আসে, বুনো ভাঙের ঝোপে ঝোপে ঘোরে নেশাগ্রস্ত গিরগিটি, বসন্তের বাতাসে বাতাসে আকুল ভাঁট ফুলের বনে মরা মাটির স্বপ্নকামনার মতো রঙীন প্রজাপতির ছোপ লাগে।

আহীরদের পাড়ার সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে একটা। রুক্ষ, উত্তপ্ত, উদগ্র জীবন নয়—চিরপরিচিত বাংলাদেশের মধুমান বিশ্রান্তি। ভাং আর গাঁজার নেশায় রাত দুটো পর্যন্ত উদ্দাম আনন্দে গান গায়না এরা; বিকেলের আলো নেভবার সঙ্গে সঙ্গে যে রেড়ীর তেলের ক্ষীণ দীপ জ্বালায়, পাংশু তারাগুলো আকাশে শাণিত হয়ে ওঠবার আগেই সে প্রদীপ নিবিয়ে স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে এলিয়ে পড়ে এরা। স্বপ্নহীন? না—ঠিক বলা হল না। রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের ঘোরে নতুন চষা মাটির মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এরা স্বপ্ন দেখে—বোরো ধান

মঞ্জরীর ভারে ভেঙে পড়ছে, স্বপ্ন দেখে—মেঘে ছাওয়া আকাশের সীমায় সীমায় একাকার হয়ে গেল মেঘবরণ গমের ক্ষেত।

কিন্তু রাত্রির স্বপ্নের বুকে দিনের ধারালো আলো এসে বিঁধতে থাকে একটার পর একটা সাঁওতালী তীরের মতো। বাঘের থাবার মতো ক্ষেতের ফসলে হাত পড়ে মহাজনের—লোভ নামে জমিদারের। তাও সইছিল এতকাল—অসহ্য হয়ে উঠেছে এইবারে।

কালা-পুখ্‌রি এবং আশে পাশে আরো প্রায় ছোট বড়ো পনেরো খানা গ্রাম নিয়ে তুরীদের এলাকা। এই গ্রামগুলির দুপাশে দু হাজার বিঘে ধানী জমি। আর এই মাঠের মধ্য দিয়ে সরীসৃপ তির্যকতায় প্রবাহিত হয়ে গেছে কামারহাটির ডাঁড়া। একটি ছোট সরু খাল—গরমের দিনে শুকনো খট্‌খটে হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এক হাঁটু কাদার মধ্যে বাড়তে থাকে ব্যাং আর গজাল মাছের সংসার; কিন্তু ডাঁড়ার পরাক্রম দেখা দেয় বর্ষার সময়। হঠাৎ একদিন ঘোলা জলের স্রোত পাক খেতে খেতে ছুটে যায় তার ভেতর দিয়ে—শুকনো ঘাস পাতা আর শ্যাওলা তীরের মতো বয়ে যায় ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর বিলের দিকে।

এর আগে তুরীরা মাছ ধরত ডাঁড়ায়, নতুন ঘোলা জল বয়ে আসতে দেখলে খুশি হয়ে উঠত তাদের মন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে বছরের পর বছর ধরে ডাঁড়া নিচ্ছে সর্বনাশীর মূর্তি। নদীর নিচের দিকটায় বালি পড়ে পড়ে ক্রমশ তার ধারা খুঁজছে একটা নতুন মুক্তির মুখ—প্রতি বছর ডাঁড়া দিয়ে আরো বেশি, আরো বেশি করে জল নামছে। এখন বারোমাসই ডাঁড়ায় জল থাকছে, কোথাও কোথাও এক মানুষ পর্যন্ত। সন্দেহ হচ্ছে, ডাঁড়ার মধ্য দিয়েই নদী তার নতুন পথ কেটে নিতে চায়!

ফল হয়েছে মারাত্মক। ডাঁড়ার সংকীর্ণ খাতে অত অজস্র জল আর

ধরছে না, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বরবাদ করে দিচ্ছে দু হাজার বিঘে জমির ফসল। কিন্তু বিশাল হাঁসমারী আর ফিরিঙ্গিপুর বিলের জলকরের লোভে জমিদার ভৈরবনারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়, আকন্দ আর ভাঁট ফুলের গন্ধে সমাকুল ঘুমন্ত গ্রামগুলিতে তাই এসে লেগেছে আহীরপাড়ার আগ্নেয় উত্তাপ।

শুধু আহীরপাড়া নয়। প্রত্যক্ষ ইন্ধন এসেছে জয়গড় মহল থেকে।

রাজবংশীরা কিষাণ সমিতি গড়েছে সেখানে। ভৈরবনারায়ণের তরফ থেকে এক একটা ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুনের ফুলকি। এক আই, এ আর এল, এম, এফ পাশ ডাক্তার নগেন সরকার বাঁকা বাঁকা কথা কইতে শিখেছে জমিদারের লোকের সঙ্গে। ইস্কুল বসিয়েছে চাষাদের ভেতরে। শুধু তাই নয়। ভৈরবনারায়ণের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুরের অন্নপ্রাশনে একটি বেগার আসেনি জয়গড় মহল থেকে, আসেনি এক মুঠো বাড়তি নজরাণা। নগেন সরকারের কিষাণ সমিতি ঠিক করেছে—ন্যায্য পাওনা-গণ্ডার একটি পয়সা বেশি দেবেনা জমিদারকে।

সেই নগেন ডাক্তার কাঁচা মাটির এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো রাস্তায় বাইশ মাইল ভাঙা সাইকেল চালিয়ে এসেছিল কালা-পুখ্‌রিতে। পঞ্চায়েতের পরামর্শটা তারি। তারপর—

তারপরেই কালা-পুখ্‌রিতে ধূমায়িত হয়েছে অগ্নি-সম্ভাবনা।

সোনাই মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে হয়েছে আজকের বৈঠকের আয়োজন। রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছেনা এখন, অন্ধকার উঠোনটায় আরক্তিম হয়ে আছে মাটিতে পোঁতা তিনটে মশালের আলো। নগেন ডাক্তার উপস্থিত থাকতে পারেনি, কী একটা বিশেষ কাজের তাড়ায় ফিরে

গেছে জয়গড়ে। মশালের আলোয় ভূতের মতো ত্রিশ চল্লিশটি মানুষ রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

ঝম ঝম করছে রাত। কোনো বাঁশঝাড়ের ঘুণে ছিদ্র করা বেণুরন্ধ্র থেকে এলোমেলো হাওয়ায় উঠছে বেসুরো বাঁশির স্বর। এই চৈত্র মাসেও আমগাছগুলোতে কখনো কখনো ঝপ ঝপ করে বাদুড় পড়ছে, কচি আমের কড়ার সন্ধানেই কিনা কে জানে। বাতাসে বাতাসে মশালের শিখাগুলো দুলে দুলে চঞ্চল ছায়া নাচিয়ে যাচ্ছে, আর মানুষগুলি তলিয়ে বসে আছে স্তব্ধতার মধ্যে। যেন কোনো দেবমন্দিরের সামনে এসে একটা বিচিত্র পবিত্রতার প্রভাবে তারা অভিভূত হয়ে গেছে, কারো মুখে কোনো কথা আসছে না।

—ধূ—ধূ—ধুম্—

কোথায় একটা হুতুম প্যাঁচা ডাকল। ইন্ধন ফুরিয়ে গিয়ে দপ্ করে নিবে গেল একটা ম্লান মশাল। উঠোনের চঞ্চল আলোটা আরো বিবর্ণ পিঙ্গল হয়ে উঠল। তখন যেন হঠাৎ কথা খুঁজে পেয়ে নড়ে চড়ে বসল একজন।

—ঠাকুরবাবু তো এখনো এলনা।

সকলের মনে ওই একটি জিজ্ঞাসাই জমে উঠেছিল এতক্ষণ ধরে। তাই কয়েক মুহূর্ত জবাব দিলেনা কেউ। তারপর আর একজন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, কালোশশী খবর দিতে গেছে।

—রেখে দাও তোমার মেয়েমানুষের কারবার। তারপর আবার কালোশশী!—প্রথম লোকটি বললে অবজ্ঞাভরা গলায়।

—না, ঠিক যাবে কালোশশী। কথার খেলাপ করবেনা।

—কী করে বুঝলে? বিশ্বাস আছে নাকি ওকে?

—অবিশ্বাসের কী হল? কালোশশী সব পারে—বিড়িতে একটা

জোরে টান দিয়ে, আগুনটাকে একেবারে আঙুলের কাছাকাছি নামিয়ে এনে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে দ্বিতীয়জন।

—কেন রং ধরেছে বুঝি চোখে?—আবহাওয়াটা এতক্ষণে সহজ হয়ে আসছিল। তারই সুযোগ নিয়ে চাপা গলায় টিপ্পনি কাটল কোনো তৃতীয় জন।

—সামলে ভাই সামলে—আর একটি কণ্ঠ।

—ওর ঝাঁপিতে তাজা তাজা গোখরো আর চন্দ্রবোড়া থাকে। বিষ দাঁত কামায়না কালোশশী। ছেড়ে দিলেই কিন্তু ছোবল মারবে—তৃতীয় জন আবার বললে রসানি দিয়ে।

দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সোনাই মণ্ডল। ভাবছিল, না স্বপ্ন দেখছিল সেই বলতে পারে। হঠাৎ মুখ তুলে চাপা গলায় ধমক দিলে একটা।

—এই, কী হচ্ছে এসব? হাসি-মস্করার সময় নাকি এখন?

মুহূর্তের মধ্যে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সমাবেশের ওপর। ঠিক কথা—অন্যায় হয়ে গেছে। দেবমন্দিরের পবিত্রতার মাঝখানে বসে সুযোগ নিয়েছি অন্যায় প্রগল্‌ভতার।

আবার চারদিকে ঝম ঝম করে বেজে চলল বরেন্দ্রভূমির লাল মাটির ওপরে ঘনীভূত রাত্রি। বেসুরো বাঁশি বাজতে লাগল ঘুণে-কাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কচি আমের অম্লরসে মুখের স্বাদ বদল করে বাদুড় উড়ে চলল নতুন কোনো খাদ্যের সন্ধানে।

একজন উঠে পড়ল।

—মশাল নিবে গেছে। যাই, আর একটা জ্বালিয়ে আনি।

ছিঁড়ে যাওয়া কথার সূত্রটায় আর একবার জোড় লাগল। আলোচনার সূচনা যে করেছিল, সে এতক্ষণে তিক্ত গলায় বললে, না—

মেয়েমানুষের ওপরে ভরসা করে বসে থাকাই অন্যায় হয়ে গেছে। নিজেদের কাউকে পাঠালেই ভালো হত।

কালোশশীর তরফে যে ওকালতি করছিল এবারে নীরব হয়ে রইল সে। তার নিজের মনেও বোধ হয় খটকা বেধেছে একটু। সত্যিই তো, কী বলা যায় কালোশশীর মতিগতি? কোন্ দিকে যেতে হয়তো কোথায় চলে গেছে নিজের খেয়ালে। কোন্ পদ্মবিলের ধারে সাপ ধরতে গিয়ে হয়তো নিজের সাপের ঝাঁপির ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তালগাছের তলায়; ঘুমের মধ্যে শুনছে কানে কানে প্রেমের চাপা ফিসফিসানির মতো নতুন-ধরা কোনো কাল-নাগের গর্জানি। তার নতুন প্রেম।

যে উঠে গিয়েছিল, সে আর একটা নতুন মশাল জ্বেলে নিয়ে এল, পুঁতে দিলে নিবে যাওয়া মশালটার জায়গায়। তাজা আর তেজী আলোয় উঠোনটা আভাসিত হয়ে উঠল নতুন করে।

—তাই তো, ঠাকুরবাবুর আসতে বড্ড দেরী হচ্ছে।—উদ্বিগ্ন মন্তব্যটা ছেড়ে দিলে একজন।

—ও আর আসবেনা। মিছিমিছি বাবুদের কথায় ভুলে এতখানি রাত জাগাই সার।—একটা মস্ত হাই তুলে গামছার খুঁটে দু ফোঁটা চোখের জল মুছে নিলে প্রথম লোকটি। তার গলায় বিস্বাদ বিরক্তিটা এবার স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে পড়ল, এতটুকুও আর চাপা রইল না।

—মাধো!—কড়্কড়্ করে যেন বাজ ডেকে উঠল সোনাই মণ্ডলের গলায়—সারা সভাটার ওপর দিয়ে আতঙ্কের চমক বয়ে গেল একটাঃ গরজটা আমাদেরই। আর অত বাবুগিরি থাকলে জমায়েতে আসতে নেই।

মাধো অথবা মাধব কিন্তু বশ মানল না। এবার আরো তিক্ত গলায় বললে, আমাদের বাবুগিরি তুমি কোথায় দেখছ মোড়ল? সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, এখন তিন প্রহর রাত হতে চলল। এখনো দেখা নেই। ডাক্তারবাবু তো উস্কানি দিয়ে সরে পড়ল, ঠাকুরবাবু হয়তো নাক ডাকিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ! মাঝখান থেকে সারারাত বসে বসে আমরা মশা তাড়াচ্ছি।

—দু ক্রোশ ঘাঁটা পার হয়ে আসতে হবে ঠাকুরবাবুকে। চারটিখানি কথা নয়।

মাধব তাচ্ছিল্য-মাখানো স্বরে বললে, তাতিয়ে দেবার বেলায় তো বাবুদের হামেশা গাঁয়ে পা পড়ে আর কষ্ট করার বেলায় বুঝি নয়? তখন আমরা।

সোনাই মণ্ডল আবার ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে, মাধো!

—অত ভয় দেখাচ্ছ কিসের? সত্যি যা তা মুখের ওপর বলব—তীব্র উত্তর এল মাধবের।

—আঃ, থাম্ থাম্ মাধব—

—কেন বাজে বক্‌বক্ জুড়ে দিলি?

—আরে বাপু, ভালো তো আমাদেরই হবে!

কথায় গতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠছে সবাই। পাঁচ সাতটি কণ্ঠে আবহাওয়াটাকে লঘু করে তোলবার প্রয়াস মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু শয়তান চেপে বসেছে মাধবের মাথায়। মাধব বললে, আমরা তো এসব ঝামেলার ভেতর পা বাড়াতে চাইনি। কী হবে খামোকা জমিদারকে ঘাঁটিয়ে? অসুবিধে হচ্ছে, জমিতে জল ঢুকছে? বেশ তো, না পোষায় উঠে যাও এখান থেকে। নতুন জমিদারিতে গিয়ে পত্তনি নাও। কিন্তু বাবুরা সব এটা-সেটা বুদ্ধি সেঁধিয়ে দেবে মগজে, আর কাজের

বেলা কারো টিকিটি দেখবার জো নেই যা খুশি তোমরা করো, আমি আর নেই এসবের ভেতরে।

—হতভাগা, উজবুক, বলছিস কী এসব ?—দাঁতে দাঁত চেপে বললে সোনাই মণ্ডল।

—যা বলছি, পাকা কথাই বলছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আর আমি নেই। জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে ধনে-প্রাণে যাব, তখন ডেকেও জিজ্ঞেস করতে আসবে না বাবু-ভাইয়েরা।

—এই, চুপ কর্।

—কী বলছিস যা তা ?

—এ তো বেইমানি !

সমাবেশের মধ্য থেকে আবার বিমিশ্র গলায় কলরব উঠল।

—কী, বেইমানি!—এবার গর্জে উঠল মাধব, সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ—এত করলাম তোমাদের জন্যে আর এখন হয়ে গেলাম বেইমান! বেশ, সেই কথাই ভালো। তোমরা যা খুশি তাই করো। ডাঁড়ায় বাঁধ বাঁধো, জমিদারের সঙ্গে মারামারি করো, ভিটে-মাটি শুদ্ধু উচ্ছন্নে যাও, তোমাদের দলে আমি নেই। এই আমি তোমাদের পঞ্চায়েত ছেড়ে চললাম, আর কোনোদিন আমায় ডেকোনা।

—মাধো—মাধো—

—বেইমান—

—মাধো—

কিন্তু এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না মাধব, একটি ডাকেরও সাড়া দিলে না। এক গাছা লাঠি পড়েছিল হাতের কাছে, সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল বাইরে অন্ধকারের মধ্যে।

আচমকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন ঘূর্ণি হাওয়া বয়ে গেল একটা।

চক্ষের নিমেষে ভেঙে চূরে একাকার করে দিয়ে গেল সমস্ত। ক্রোধে, বিস্ময়ে আর নিরাশায় সভা মূক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর আত্মস্থ হয়ে, আগুনঝরা গলায় সোনাই বললে, যাক।

—কী সাংঘাতিক মানুষ!

—যাবার জন্যেই ছটফট করছিল। ফাঁক পেয়ে পালিয়ে গেল।

—যাবেই তো। এসব কাজে কি আর সমান বুকের পাটা থাকে সকলের!

—ও আসবে কেন আমাদের ভেতর। ওর ছেলে শহরে গিয়ে কোন্ সাহেবের আর্দালি হয়েছে, ওর এখন মেজাজ গরম। নেহাৎ গাঁয়ে থাকে বলেই লজ্জায় পড়ে এসেছিল।

—বেইমান!

সোনাই মণ্ডল একবার তাকালো সভাটার দিকে। নতুন আনা মশালটার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তার মাথার পাকা চুলগুলোকে আরো বেশি সাদা দেখালো। চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল দুখণ্ড কাচের মতো।

—চুপ, সব চুপ!—অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে নির্দেশ দিলে। তার গলার আওয়াজেই যেন চমকে উঠে আবার ধূ-ধূ-ধূম্ করে আতঙ্কিত জবাব দিলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হুতুম প্যাঁচাটা।

ফোঁস ফোঁস করে সাপের মতো কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলল সোনাই মণ্ডল, যেন অনেকক্ষণ ধরে দম আটকে ছিল তার। ভাঁজ করা হাঁটু দুটোকে সে মুঠো করে চেপে ধরলে অসহ্য ক্রোধে, হাতের কাছে মাধবের গলাটা থাকলে পিষে যেত ওই মুঠোর মধ্যে।

—সব বেইমানের বিচার হবে একদিন, তার দেরী নেই। কিন্তু—কাচের মতো চোখ দুটোকে বরিন্দের মাঠে জনশ্রুতির স্কন্ধকাটার সন্ধানী চোখের মতো তীক্ষ্ণতর করে সে সভাটার ওপর আর একবার বুলিয়ে

নিলে : তোমাদের কারো যদি অমনি করে পালাবার মতলব থাকে, তা হলে এই বেলা সরে পড়ো। কোনো বেইমানের জায়গা নেই এখানে।

একসঙ্গে মাথা নিচু করে রইল সকলে। মাধবের অপরাধ যেন তাদের সকলকে স্পর্শ করেছে, নিজেদের মনের মধ্যে তাকিয়ে তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ শুরু করল। যেন খুঁজে দেখতে চাইল কোথায় লুকিয়ে আছে ভীরুতা, তলিয়ে আছে মিথ্যে, সঞ্চিত হয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতার কালো কলঙ্ক।

একটা টর্চের আলো সভার ওপর দিয়ে পিছলে গেল।

—কে—কে—কে ?

সকলের হয়ে যেন সহস্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোনাই মণ্ডল। যাদের কাছে লাঠি ছিল, নিতান্ত অবচেতন একটা প্রেরণাতেই তারা লাঠিগুলো ধরল মুঠো করে।

—আমি রঞ্জন।

—ঠাকুরবাবু!

—ঠাকুরবাবু এসেছে!

—শালা মাধব থাকলে বুঝতে পারত—

—ব্যাটা বেইমান—

কিন্তু অতগুলো গলার কল-কাকলি কোনো স্পষ্ট অর্থ নিয়ে পৌঁছে দিলে না রঞ্জনের মনের কাছে। মৃদু হেসে সে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে : রাত একটু বেশি হয়ে গেল। তা আমার দোষ নেই। খেয়ার মাঝি ঘুমুচ্ছিল, একঘণ্টা লাগল তাকে ডেকে তুলতে। সে যাই হোক, এখন তা হলে আমাদের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

সোনাই মণ্ডলের পাশেই ঝুপ করে বসে পড়ল রঞ্জন।

—একটু দাঁড়ান ঠাকুরবাবু, আর একটা মশাল জ্বেলে আনি—তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল একজন।

কিন্তু কালোশশী ?

জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলেছিল রঞ্জনের পাশাপাশি। যতক্ষণ না বিপজ্জনক অঞ্চলটা পার হয়েছে, ততক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি। শুধু অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে দুটো ছায়ার মতো খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি পথ কেটেছে।

তারপর দূরে যখন জমিদার-বাড়ির আলোটা ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল, দুপাশে রইল শুধু মাথা-সমান-উঁচু বেনা ঘাসের বন, প্রকৃতি ছাড়া দুজনের মাঝখানে কিছুই আর জেগে রইল না, তখন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল রঞ্জনের। অন্ধকারে আরো অদ্ভুত মনে হতে লাগল রহস্যময়ী কালোশশীকে, চারদিকে ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ঝিঁঝিঁ করতে লাগল রক্তের মধ্যে।

—কালোশশী ?—রঞ্জন ডাকল।

জবাব দিল না কালোশশী। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

—কালোশশী ?—রঞ্জন আবার ডাকল।

—কী বলছ ?—যেন ঘুমের ঘোর ভেঙে তাকালো মেয়েটা। রঞ্জনের মনে হল, হাল্‌কা মেঘের আবরণে ঢাকা দুটো ম্লান নক্ষত্রের মতো চকচক করে উঠল কালোশশীর চোখ।

—ঘরে ফিরবি না তুই ? সারা রাত ঘুরবি পথে পথে ?

—ঘর ?—অন্ধকারে কালোশশীর মুখ দেখা গেল না, শুধু কানে এল চাপা একটা হাসির শব্দ।

—তোর মরদ রাগ করবে না ? লক্ষ্মণ ?

কালোশশী আবার হাসল কিনা কে জানে, কিন্তু হাসির শব্দটা এবারে আর শুনতে পাওয়া গেল না। মৃদুকণ্ঠে বললে, না রাগ করবে না। রাগ করার মতো হালই নেই তার।

—সে কি ! কেন ?

—সে এতক্ষণ মদ খেয়ে গোপালপুরের ভুঁইমালী পাড়ায় গিয়ে পড়ে আছে।

—ওঃ !—রঞ্জন চুপ করে গেল। একটা প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল নিজের মধ্যে। কালোশশীর জন্য কি তার সহানুভূতি বোধ করা উচিত ? উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা কি কালোশশীর মনে সঞ্চার করে কোনো গৃহবধূর আর্তি, কোনো পুরলক্ষ্মীর আকুলতা ? অথবা ওদের দাম্পত্যজীবন কি শুধু কিছুক্ষণের জন্য একটা জৈব-বন্ধন, তারপরেই দুটো সমান্তরাল রেখা ? কোনো দিন কেউ কারো সঙ্গে মিলবে না, এগিয়ে যাবে নিজেদের নির্বিঘ্ন গতিপ্রবাহে ?

তাই তো স্বাভাবিক। দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। লক্ষ্মণ সর্দারের সঙ্গেও আজ আর সুর মিলছে না। এমন কত আসবে, কত যাবে। তাজা সাপ নিয়ে খেলা ভালোবাসে কালোশশী। আজ হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়েও তার খেলা শেষ হয়ে গেছে, তাই কি নিজেই তাকে সে ছুড়ে দিয়েছে গোপালপুরের মদের দোকানে, ভুঁইমালীদের পাড়ায় ?

হঠাৎ মনে পড়ল। দিনকয়েক আগে সাইকেলে করে আসবার সময় পথের মধ্যে যখন দেখা হয়েছিল কালোশশীর সঙ্গে, তখন বলেছিল, ভারী বিপদে পড়েছে পরশুরামের জন্য ; সে-সম্পর্কে একবার আলাপ করতে আসবে রঞ্জনের কাছে।

—হ্যাঁ রে, পরশুরামের খবর কী ?

—পরশুরাম ?—কালোশশী চমকে উঠল একবার।

—তোকে এখনো শাসাচ্ছে নাকি ?

—নাঃ!—কালোশশী একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

—তোর আশা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ?

কালোশশী আবার চোখ তুলল। আবার হালকা মেঘের আড়াল থেকে চকচক করে উঠল দুটি বিষন্ন নক্ষত্র।

—তা তো জানিনা। তবে তীরে বিষ মাখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার খোঁজে। কুঁচিলার বিষ, গোখরো সাপের বিষ।

—কী সর্বনাশ!—রঞ্জন ভয়ানক চমকে উঠল: আর তুই রাত-বিরেতে এমন করে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াস ? ভয় করে না তোর ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না কালোশশী। তারপর মাঠ থেকে উঠে-আসা একটা আচমকা হু হু করা হাওয়ায় আল্‌গাভাবে একটা কথা ছেড়ে দিলে: না ভয় করে না। কী হবে ভয় করে ?

—তার মানে ? মরতে ভয় নেই তোর ?

—নাঃ!—আবার আর একটা হু হু হাওয়ায় কালোশশীর কথাটা উড়ে চলে গেল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসও কি মিশে গেল তার সঙ্গে ?

—এসব আবার কী কথা রে ? তোর হল কী ?—রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কালোশশী। তারপর—

অন্ধকারে রঞ্জন এইবারে আর তার চোখ দুটোকে দেখতে পেল না। নক্ষত্রের আলোটা মেঘের আড়ালে বুঝি একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে। কেউ জানলনা, কখন কোথা থেকে কয়েক বিন্দু জল এসে জমেছে কালোশশীর চোখের কোনায় কোনায়।

—আচ্ছা বাবু, আমাকে একবার শহরে নিয়ে যাবে ?

একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন ।

—হঠাৎ আবার শহরে যাবার সখ হল কেন তোর ?

—কী জানি, বলতে পারি না—ধরা গলায় কালোশশী বললে, আর ভালো লাগে না এমন করে। সারাজীবন খালি কি সাপ ধরেই বেড়াব? শহরে হয়তো সাপ নেই—সাপ ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করবে না সেখানে। এই সাপের ঝাঁপি ফেলে দিয়ে দিনকয়েক নিজের খুশি-মতো ঘর বাঁধব সেখানে।

—কী বলছিস তুই ?

কালোশশী তেমনি ধরা গলায় বললে, আর ভালো লাগে না এমন করে। তুমি আমায় নিয়ে চলো বাবু।—জল-ভরা যে চোখ দুটোকে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের মতো কী ঝিকিয়ে উঠল : আমি তোমার কাছে থাকব, তোমার সব কাজ করে দেব। সত্যি বলছি বাবু, আমি আর সাপ ধরব না! সাপ ধরতে আর আমার ভালো লাগে না।

এতক্ষণ ধরে জমাট মেঘে বর্ষণ নামল এইবারে। হু হু করে বন্যার মতো অজস্র ধারায় কেঁদে ফেলল নাগমতী বেদের মেয়ে।

রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে একটার পর একটা রক্তের ঢেউ এসে সমুদ্র-গর্জনের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। কী বলতে চায়, কী বলতে চায় কালোশশী ? এই অন্ধকার ভরা মাঠের মধ্যে, হু হু করা বাতাসের এই আকুলতায়—কোন্ বনস্পতির ছায়া-স্বপ্নে নীড়ের কামনা উতরোল করে দিয়েছে বনহংসীর বুকের রক্তকে ?

—কালোশশী !—রঞ্জন ডাকল। নিজের গলার স্বরেই চমকে উঠল সে।

কিন্তু কোথায় কালোশশী! চক্ষের পলকে একটা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে রাত্রির অতলান্ত গভীরতায়।

—কালোশশী!

না, কালোশশী কোথাও নেই। বিহ্বলের মতো সামনে তাকালো রঞ্জন। খানিকদূরে একটা আলেয়া এগিয়ে আসছিল তার দিকে, ডাক শুনে যেন থমকে দাঁড়ালো, তারপর দপ করে নিবে গিয়ে মিলিয়ে গেল নিশীথ-সমুদ্রের একটা বুদ্বুদের মতো।

দশ

দিন সাতেক পার হয়ে গেছে।

এক পশলা জোরালো বৃষ্টি ঝরে গেছে 'বরিন্দে'র লাল-মাটির ওপর। কাঁচা সড়কের ওপর এঁটেল কাদায় গোরুর গাড়ির 'ডহ্' সৃষ্টি হয়েছে এক আধটা। কাঁদড়ের স্থির ঘোলাটে জলে অল্প অল্প তিরতিরে স্রোত এসেছে। দু-চার আঙুল জল জমেছে ফেটে চৌচির শুকনো 'নয়ানজুলী'র ভেতরে, কোথা থেকে প্রাণ পেয়েছে শুকনো কয়েকটি কলমীলতা—তিন চারটি পাতা নিয়ে ভীরু মাথা মেলে দিয়েছে ওই জলটুকুর ওপরেই। মাটির বুকের ভেতর থেকে শীর্ণ কয়েকটি সবুজ আগুনের শিখার মতো ঘাসের অঙ্কুর উঠছে এদিকে ওদিকে।

আর মুশ্কিল হয়েছে আউশ ধান নিয়ে। প্রায় একমাস ধরে টানা খরা চলছিল, এইবার আসছে জোরালো বর্ষার পালা। প্রথম প্রথম কাজল মেঘ থম্ থম্ করে ওঠে, ঘনিয়ে আসতে চায়—কিন্তু 'বরিন্দের' প্রচণ্ড পাগলা হাওয়ায় ঠিক জমাট হয়ে বসতে পারে না; একটা কালো রাজহাঁসের পাখা যেমন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শেয়ালে, তেম্নি ভাবে বাতাসের ঝাপটায় শতচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দিকে দিকে।

কিন্তু ক'দিন আর? এক সময়ে ঠিক জড়ো হয়ে আসবে, একজোড়া শক্ত লোহার কবাটের মতো আড়াল করে ফেলবে আকাশকে। পূবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে জ্বলতে থাকবে লাল বিদ্যুৎ, বাজ পড়বে গুম্ গুম্ করে—এক একটা আকাশ ছোঁয়া তালগাছের বুককে দু ফাঁক করে দিয়ে মাটির তলায় পালিয়ে যাবে সর্বনাশা আগুন। তারপর বৃষ্টি—বৃষ্টি। এক নাগাড়ে চলতে থাকবে—দু দিন, তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন। তারও

পরে কোথায় কতদূরে গঙ্গা, কোথায় বা মহানন্দা! পাগলের মতো জলের তোড় ছুটবে মালিনী নদী দিয়ে—মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় একাকার করে দিয়ে জন্ম হবে 'চাফালে'র। সে তো সায়র!

এদিকে ধান পেকে উঠছে। ওই সর্বনাশা জলের ঢল নামবার আগে কাটতে না পারলে কম্‌সে কম সাত-আট হাজার বিঘের ধানই বরবাদ। একেই তো পোকাধরা এবারে, তার পরে ঢল নেমে এলে—

তিন চারজন মাতব্বর গোছের কৃষক জড়ো হয়েছিল আলিমুদ্দিনের দাওয়ায়। আলোচনা তারাই করছিল।

আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদেরি দোষ। এত দেরী করে রোও কেন?

—করব কী জনাব। আগে পানি না পড়লে ক্ষেতে লাঙল দিয়ে কী করব! তা ছাড়া মাটিও তো দেখছেন। ভিজলে মাখন, নইলে পাথর।

সলিম মুন্‌সী শাদা দাড়িটার মধ্যে হাত বুলিয়ে নিলে কয়েকবার।

—সত্যি দিনকাল যেন বদ্‌লে যাচ্ছে। আগে, ফাল্গুনের আগেই জল নামত—এখন ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই নামতে নামতে চোতের শেষ। এমনি চলতে থাকলে পহেলা ফসল আর চাষার ঘরে উঠবে না।

জোনাবালি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজও আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানা ঘন কালো জলভরা মেঘ উঠে এসেছে। একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে গুর্ গুর্ করে। নাঃ—এল বলে। বেশি দেরী নেই আর।

জোনাবালি বললে, আব্বাজানের মুখে শুনেছি, আগেকার আমলে ক্ষেতে ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন নবাব আর জমিদাররা। বৃষ্টি না হলে পাছে চাষার কষ্ট হয়, এজন্যে পুকুর কাটিয়েছিলেন বরিন্দের চারদিকে। আর এখন? নেবার কুটুম সব—একটা আধলা দেবার বেলা কেউ নেই।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল আলিমুদ্দিনের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখেছি বটে। মাঠে ঘাটে চারধারেই তো ছোট বড় অনেক পুকুর আছে। ওইগুলোর কথাই বলছ বুঝি?

—জী।

—তা তোমরা কেন ওসব পুকুর থেকে সেচের ব্যবস্থা করে নাও না?

—পানি কই জী, শুধু তো পানা আর কাদা।

—নিজেরা কাটিয়ে নিলেই তো পারো।

—বাপ্স!—সভয়ে সলিম বললে, অত পয়সা কোত্থেকে আসবে চাষার ঘরে? আর সবাই মিলে-জুলে যদি কাটিয়েও নিই—শাহু কি আর রক্ষা রাখবে তা হলে! দেওয়ানী নয় হুজুর, ঠেলে দেবে ফৌজদারীতে। নইলে একশো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে তিন হাত নাকে খত টানতে হবে শাহুর সদর কাছারীর সামনে।

—বটে—বটে!

—জী। তবে আর বলছি কী?

—হুঁ!—আলিমুদ্দিন ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। দিনের পর দিন একটার পর একটা অবাঞ্ছিত আঘাত আসছে, আর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে—এ তিনি চান নি—এ তিনি চান না। দুই আর দুইয়ে চারের মতো যাকে অত্যন্ত সরল আর তরল বলে ধারণা জন্মেছিল, দেখা যাচ্ছে তা অত সহজ নয়। অনেক দিন ধরে কঠিন হাতে লাঙলের আঁচড় কাটতে হবে, বেছে বেছে ভেঙে ফেলতে হবে অনেক সর্বনাশা মাটি-পোকার বাসা, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে হবে পাথরের মতো শক্ত অনেক মাটির চাঙাড়। তারপর:

তারপর: এই মাটিতে পাকিস্তানের ফসল। গরীবের দুনিয়া।

বাজার করে ফিরল জিব্রাইল। কাঁধে ধামা।

—মুরগী পাওয়া গেল না জনাব। বলছে মড়ক লেগেছে। মাছও নেই। যা সামান্য মাছ ধরেছিল ধাওয়ারা, তা শাহুর তোলায়—

—থাক্। তরকারী এনেছ তো ?

—তা এনেছি। আলু, পেঁয়াজ, কলাইশাক।

—ব্যাস্ ব্যাস্, ওতেই চলবে।

জিব্রাইল ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কী ভেবে থেমে দাঁড়াল।

—জী, একটা কথা। শাহু ডেকে পাঠিয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতেই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আলিমুদ্দিন। লোকটাকে যেন সহ্য করতে পারছেন না আর। নিতান্তই কাজের খাতিরে যেতে হয়, তাই যাওয়া। নইলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বৈঠকের ভেতরে সকলের সামনেই একটা নির্মম থাবা দিয়ে লোকটার মুখোস ছিন্নভিন্ন করে দেন তিনি।

—ডাক কেন ?

—বিকেলে ভারী জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার সঙ্গে তাই নিয়ে আলাপ করবেন।

—এখুনি যেতে হবে ?—গলার স্বরে তাঁর একটা চাপা বিদ্রোহ প্রকাশ পেল।

—জী হাঁ। এখুনি।

হুকুম! সারা শরীরের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। পালনগরে শাহুর ইস্কুলে না হয় মাস্টারীই নিয়েছেন, তাই বলে কোনো দাসখৎ তো লিখে দেননি তিনি। হুকুম করে করে ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা হাতছানি দিয়ে ডাকলেই যে দৌড়ে গিয়ে শাহুর নাগরা জুতোর নিচে পোষা কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়তে হবে—স্বীকার করে তো নেননি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি। তিনি মাস্টার। স্বাধীন বিবেক নিয়ে পথ চলাই তাঁর কাজ—যা সত্য তাকে ঘোষণা করাই তাঁর দায়িত্ব।

তাঁর নৈতিক কর্তব্য ছাত্রদের কাছে—দেশের কাছে ; শিক্ষক শুধু খোদার বান্দা—দুনিয়ার মালিক ছাড়া কারো কাছেই সে মাথা নত করতে জানেনা।

গড়গড়া টানছিলেন আলিমুদ্দিন, একটা টান দিয়ে সরিয়ে দিলেন নলটা। তিক্ত স্বরে বললেন, কিসের ওয়াজ ?

—লীগের একটা মজলিস হবে বলছিলেন—জিব্রাইল ভেতরে চলে গেল।

সলিম মুন্‌সীর মনে পড়ল : হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই বটে। আমাদের গাঁয়েও ঢোল পড়েছে।

জোনাবালি বললে, আচ্ছা মাস্টার সায়েব, কী হবে লীগ দিয়ে ?

অন্য সময় হলে পরমোৎসাহে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বসতেন আলিমুদ্দিন। উদ্দীপনা জেগে উঠত মনের ভেতর, দপ দপ করে জ্বলে উঠত চোখ। বলতেন ইস্‌লামের কথা, তার আদর্শের কথা, দুনিয়ার তামাম গরীবের বেহেস্ত্‌ গুলিস্তাঁ পাকিস্তানের কথা। কিন্তু সাতদিন ধরে কেন যেন তেমন করে আর জোর পাচ্ছেন না মনে।

হ্যাঁ—পাকিস্তান চান বই কি। কিন্তু এই বনিয়াদের ওপর ? ফতেশা পাঠানদের ওপর ভর দিয়ে ? না।

তবু—লীগ, লীগ। কায়েদে আজমের নির্দেশ। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা।

আলিমুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা ভাইসাহেব সব, আমি তা হলে চলি। বিকেলে সভায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে লীগের কথা। তোমরা এসো।

—জী, আসব।

দু পা বাড়িয়েছেন আলিমুদ্দিন, এমন সময় পেছন থেকে ভীরু কণ্ঠের ডাক এল : জনাব !

তাকিয়ে দেখলেন, সলিম।

—কিছু বলবে মিঞা সাহেব ?

—এই বলছিলাম—সলিম একটা ঢোঁক গিললে, আমরা পুকুর-টুকুর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছিলাম, সেগুলো যেন আর শাহুকে—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে থেমে গেল।

—কেন ?—আলিমুদ্দিন ভ্রুকুঞ্চিত করলেন : আমি তো ওকথাটা গিয়েই বলব ভাবছিলাম। একাজ তো শাহুরই করা উচিত। প্রজাকেই যদি না বাঁচালো, তা হলে কিসের জমিদার! আর তা ছাড়া ফসল ভালো হলে জমিদারেরই তো লাভ—বাকী-বকেয়া কিছু পড়ে থাকবে না প্রজার কাছে।

—ফসল ভালো না হলেও বাকী-বকেয়া কোনোদিন থাকে না শাহুর কাছে। বাদিয়াপাড়ার পাইকেরা আছে।—জোনাবালি বললে, তাই ফসল ভালো না করলেও শাহুর চলবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি দেখব—আলিমুদ্দিন দ্রুত পা চালালেন।

না, আর কথা বলবার সাহস সেই—আলোচনা জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ নেই একবিন্দু। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী রাঙা মাটির ঢেউ খেলানো বরেন্দ্রভূমির প্রান্তরে তিনি দাঁড়াবেন কোথায়, কোন্‌খানে পা রাখবেন? সমস্ত মাঠটাই যেন আলাদ, খরিশ আর চিতি বোড়ার গর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—কতকাল আর নাগ্‌রা জুতোর নিচে চেপে রাখা যাবে এই বিবরগুলো?

ধুলো-ভরা পথটায় এখন এলোমেলো কাদার ছোপ। কোথাও কোথাও মাটি পিছল, চলতে হয় পা টিপে টিপে। সন্ত্রস্ত সতর্ক পায়ে চললেন আলিমুদ্দিন। দূরে দূরে ধানসিঁড়ি জমির ওপর সবুজ গাঢ় সবুজ রঙের ধান; তার ভেতর দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে

মালিনী নদী। যেন সবুজ ইস্‌লামী পতাকায় ঝকঝক করে উঠছে রজতশুভ্র চন্দ্ররেখার দীপ্তি।

মাটিতে ছড়ানো ওই যে সবুজ পতাকা, ওই পতাকা তুলে ধরবে মাটির মানুষেরাই। ওই চাঁদের আলো গলানো নদীর রেখা, ও তো মাটির মানুষেরই চোখের জল। শাহুর নাগরা জুতোর তলায় আর এ পতাকাকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেওয়া যাবে না। একে বাঁচাতে হবে— বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু কী করে?

অসহায়ভাবে মনের মধ্যে যেন একটা উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পারবেন? সাহস হবে তাঁর শাহুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে এই মানুষগুলোকে এককাট্টা করতে? সব মানুষকে খোদার আইনে ভাগ করে দিতে পারবেন তার পাওনা মাটি, তার মেহনতী ফসল, তার সাচ্চা ইমান?

—আদাব মাস্টার সাহেব। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—কে?—চমকে উঠে তাকালেন আলিমুদ্দিন। এলাহী বক্স— বাদিয়াপাড়ার মাতব্বর।

—কী হয়েছে এলাহী?

—আমার বেটিটা বুঝি আর বাঁচল না মাস্টার সাহেব।—এলাহীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পা দুটো শক্ত হয়ে গেল, যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন আলিমুদ্দিন মাস্টার: কী হয়েছে?

—কাল রাত থেকে খুব চেঁচামেচি করছে, আর বেজায় জ্বর। সরকারী দাওয়াখানা থেকে ওষুধ নিয়ে তো আসছি, কিন্তু—এলাহী কথা বলতে পারল না।

দেশ-সেবার প্রথম হিড়িকে অনেক কিছুই করেছিলেন আলিমুদ্দিন—

এমন কি বছর খানেক কম্পাউণ্ডারীও। এলাহীর হাত থেকে ওষুধের শিশি আর প্রেস্‌ক্রীপ্‌শনটা তুলে নিলেন কৌতূহলবশে।

—কী ওষুধ দিলেন ডাক্তার, দেখি ?

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ পড়ল প্রেস্‌ক্রীপ্‌শনের দিকে। তারপরেই চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

—এই ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার ?

এলাহী সভয়ে বললে, জী।

ভয়ঙ্কর গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদের ডাক্তার না এল, এম, এফ ?

—কী জানি হুজুর, অতশত বলতে পারবনা।

—এসো আমার সঙ্গে।

ডান দিকে বাঁক নিলেন আলিমুদ্দিন। ভুলে গেলেন, শাহুর আহ্বানে তিনি চলেছিলেন বিকেলের জরুরি ওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ভুলে গেলেন তাঁরই হাতে-গড়া মুস্‌লিম লীগের আজকে একটা স্মরণীয় অনুষ্ঠান।

দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন আলিমুদ্দিন। রক্তের মধ্যে অসংযত চাঞ্চল্য, কোথায় যেন নিঃশব্দ বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে একটা। পায়ের একটা কড়ে আঙুলে যেন ছোবল লেগেছে বিবর-ছিদ্রিত বরিন্দের মাঠে লুকোনো কোনো একটি নাগশিশুর। এলাহী বক্স সভয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিন্তু ডিস্‌পেন্‌সারী পর্যন্ত আর যেতে হলনা। পথেই দেখা হল সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকারের সঙ্গে। সাইকেলে করে বেরিয়েছেন রুগী দেখতে।

—ডাক্তার সাহেব!—আলিমুদ্দিন ডাকলেন।

—এই যে, কী খবর মাস্টার সাহেব ?—সাইকেলে চলতে চলতেই জবাব দিলেন ডাক্তার।

—একটা দরকারী কথা আছে, নামুন।

ডাক্তার নামলেন। হাসলেন এক গাল।

—বিকেলে মিটিংয়ের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ,সে আমার মনে আছে।

—না, মিটিং নয়।—আলিমুদ্দিন হাতের প্রেস্‌ক্রীপ্‌শনটা মেলে ধরলেন: এইটে।

—কিসের প্রেস্‌ক্রীপ্‌শন?—বিস্ময় ফুটল ডাক্তারের স্বরে।

—আপনারই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো।—মনোযোগ দিয়ে একবার চোখ বুলোলেন ডাক্তার: রাজিয়া খাতুন—চব্বিশ বছর, ম্যালেরিয়া। সিন্‌কোনা মিক্‌শ্চার। কী হয়েছে তাতে?

—না, কিছু হয়নি।—থমথমে গাঢ় গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু রাজিয়া খাতুনের কেসটা কি সম্পূর্ণ শুনেছেন আপনি?

—কী আবার শুনব? জ্বর হয়েছে—ম্যালেরিয়া!—তাচ্ছল্যভরে ডাক্তার বললেন, ওতেই সেরে যাবে।

—যদি না সারে?

আলিমুদ্দিনের জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন খোদাবক্স খন্দকার। লোকটার হাল-চাল এমন যে—যেন জেরা করতে এসেছে! যেন সাক্ষাৎ সিভিল-সার্জন এসে উপস্থিত হয়েছেন ডিস্‌পেন্‌সারী ইন্‌স্‌পেক্‌শনে।

—না সারে, মরবে। সবাইকে বাঁচাবার গ্যারাণ্টি দিয়ে কেউ ডাক্তারী করতে আসে না মিঞা সাহেব।

—তা আসে না। কিন্তু রোগটা জেনে ওষুধ দেয়।

ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। অপমান করছে তাঁকে—মূর্খ বলছে প্রকারান্তরে। অহেতুক অনধিকার চর্চ্চা।

খোদাবক্স বললেন, নিজের কাজ নিজে করুন মিঞা সাহেব, আমার কাজটা আমাকেই ছেড়ে দিন।

—না।—আলিমুদ্দিন হঠাৎ পথ আটকে দাঁড়ালেন। আগুন-ঝরা গলায় বললেনঃ না। মানুষের জীবন নিয়ে কেন আপনারা এই ছিনিমিনি খেলেন, তার কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে।

—কৈফিয়ৎ!—বাঁকা ঠোঁটে জ্বালা-ভরা হাসি হাসলেন ডাক্তারঃ আপনি আমার মনিব নন। কৈফিয়ৎ দিতে হয় দেব সিভিল সার্জনকে, নইলে শাহুকে। আপনাকে নয়।

শাহু! আলিমুদ্দিনের মাথার মধ্যে যেন একটা আগুনের চাকা পাক খেতে লাগল। শাহুই বটে! মনে পড়ল, খোদাবক্স খন্দকার সম্পর্কে শাহুর চাচাতো ভাই।

—পথ ছাড়ুন—খোদাবক্স বললেন।

—না, জবাব দিয়ে যেতে হবে।

—জবাব?—ডাক্তারের খুন চেপে গেল। অপমান! আরো বিশেষ করে এলাহী বক্সের সামনে! বাঁ হাত দিয়ে আলিমুদ্দিনকে একটা ধাক্কা দিয়ে ডাক্তার বললেন, সরে যান।

ধাক্কাটা হয়তো একটু জোরেই লেগেছিল। অথবা ধাক্কা নয়—বিস্ফোরকের মুখে আগুন দেবার জন্যে ওইটুকু মাত্রই বাকী ছিল হয়তো। মাথার মধ্যে আগুনের চাকাটার আবর্তন আরো দ্রুত, আরো ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। সাত দিনের সঞ্চিত জ্বালা বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

প্রকাণ্ড একটা ঘুষির ঘায়ে ধূলোর ওপর গড়িয়ে পড়লেন খোদাবক্স খন্দকার। আর্তনাদ করে উঠল এলাহী।

—এ কী করলেন মাস্টার সাহেব!

একটা ক্লান্ত বন্য জন্তুর মতো নিশ্বাস ফেলছিলেন আলিমুদ্দিন। দুটো

চোখে যেন সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হয়েছে তাঁর। জবাব দিলেন না—দাঁড়িয়ে রইলেন স্থাণুর মতো।

ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঝাড়লেন গায়ের ধূলো। হায়নার মতো এক সার দাঁত বের করে যেন হাসলেন মনে হল। সে দাঁতের ওপর রক্তের একটা আবরণ নেমে এসেছে।

—আদাব, পরে বোঝাপাড়া হবে—সাইকেলটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার—মিলিয়ে গেলেন ঝড়ের বেগে। চাকার তলা থেকে একরাশ লাল কাদা ছর্ ছর্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল দু পাশে।

—আরো অনেক, অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল—এলাহী।

—মাস্টার সাহেব?

—অ্যাঁ?—যেন ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

—এযে ভারী বিশ্রী হয়ে গেল।—ভয়ে ভয়ে জড়ানো গলায় এলাহী বললে।

—হ্যাঁ, তা হল।—আলিমুদ্দিন মাস্টার ফিরে এলেন নিজের মধ্যে। ছিঃ ছিঃ—করলেন কী! এতদিনের এত শিক্ষা, এত আত্ম-সংযমের শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম! একটা সামান্য তুচ্ছতার আঘাত সইতে পারলেন না, ভেঙে পড়লেন টুকরো টুকরো হয়ে! একটা সামান্য পোকার ওপরে করলেন শক্তির এমন জঘন্য অপব্যবহার!

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, এসো এলাহী।

—কোথায়?

—তোমার বাড়িতে। তোমার মেয়েকে একবার আমি দেখব। যদি দরকার হয় আমার বাড়িতে এনে চিকিৎসা করব ওর। তোমার আপত্তি নেই তো?

—আপনার বাড়িতে!

—হাঁ, আমার বাড়িতে। আমি একবার শেষ চেষ্টা করব এলাহী।

এলাহী এবার ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল: মাস্টার সাহেব!

বিরক্ত গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, চলো, চলো। বেশি দেরী কোরোনা। আমার আবার সময় নেই, এখুনি সোজা শাহুর বাড়িতে দৌড়তে হবে।

ফতেশা পাঠান গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। ঘন ঘন পাক দিচ্ছিলেন কাঁকড়া-বিছের লেজের মতো গোঁফজোড়ায়। মামলাটা অত্যন্ত জটিল—কোনো দিকেই রায় দেওয়া সহজ নয় তাঁর পক্ষে। খোদাবক্স খন্দকার তাঁর নিজের আত্মীয়, তার অপমানের আঁচটা তাঁরও গায়ে লাগে। অন্য সময় হলে এতক্ষণে দুটো পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বেঁধে আনতেন মাস্টারকে, জুতোর ব্যবস্থা করতেন তাঁর কাছারী বাড়ির সামনে। কিন্তু মাস্টারের গায়ে হাত দেওয়া সহজ নয়। গ্রামের লোকের মনে জনপ্রিয়তার এমন একটা জায়গা করে নিয়েছেন মাস্টার, যে বেশি কিছু করতে গেলে ঘটনাটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তা ছাড়া আপাতত যেমন করে হোক ওই লোকটাকে তাঁর মুঠোর মধ্যে রাখা চাই। অনেক উপকার হবে—অনেক কাজ হবে। অফুরন্ত সুযোগ আসছে। প্রজাদের ভেতরে ঘনিয়ে-আসা অসন্তোষের স্রোতকে উল্টো পথে চালিয়ে দেবার প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে ওই মাস্টার। তারপর ওই বশ-না-মানা সাঁওতালেরা। কিছুতেই জব্দ করতে পারেনি—ওই খাজনা-না-দেওয়া তীর-শানানো মানুষগুলো তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধে আছে কাঁটার মতো। সব শেষে কুমার ভৈরবনারায়ণ—পাশাপাশি বাস করা কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এক ঢিলে শুধু দুটো

নয়—এক ঝাঁক পাখি বধ করবার প্রতিশ্রুতি। একটা কাঁচা কাজের ভেতর দিয়ে এতখানি ভবিষ্যৎকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

গোঁ গোঁ করতে করতে খোদাবক্স বললেন, এর যদি ব্যবস্থা না করেন, তা হলে আমি আদালতে যাব।

—আহা-হা দাঁড়াও, ছেলেমানুষি করছ কেন?—বিপন্ন স্বরে বললেন ফতে শা।

—ছেলেমানুষি!—খাঁচার ভেতরে খোঁচা-খাওয়া একটা বানরের মতো মুখ খিঁচোলেন ডাক্তার: রাস্তার মাঝখানে আমায় ঘুষি মারল, দাঁত দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। তার ওপর মানহানি! আপনি একে ছেলেমানুষি বলবেন ভাইজান!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—দেখছি! আঃ—কী মুশ্‌কিল!—আবার গোঁফের প্রান্ত ছুটো পাকালেন শাহু।

—আমি আপনাকে বলে রাখছি—ডাক্তার চৌকির ওপরে একটা হিংস্র কিল মারলেন:—বলে রাখছি—কিন্তু বলাটা শেষ হলনা। তার আগে বারান্দায় চটির শব্দ উঠল। ঘরে ঢুকলেন আলিমুদ্দিন।

—আদাব মাস্টার সাহেব, আসুন, আসুন—কেমন যেন থতমত খেয়ে স্বাগত জানালেন শাহু। ডাক্তার আগ্নেয় চোখ ছুটোকে ঘুরিয়ে দিলেন দেওয়ালের আরেক দিকে।

আলিমুদ্দিন শাহুর অভিবাদনের কোনো জবাব দিলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে।

—মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে খোদাবক্স ঘাড় ফেরালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে না পেরে হতভম্বভাবে মুখটাকে আধখানা ফাঁক করে রইলেন ফতে শা।

আলিমুদ্দিন বললেন, ভারী অন্যায় করে ফেলেছি—ঝোঁকের ওপর মাথা ঠিক ছিলনা। মাফ করুন।

ফতেশাই স্বাভাবিক হয়ে এলেন আগে।

—বাঃ, তবে তো চুকে-বুকেই গেল। কী বলো খোদাবক্স?

খোদাবক্স হাঁড়ির মতো মুখে বসে রইলেন।

দু হাত জুড়ে নাছোড়বান্দা আলিমুদ্দিন বললেন, বলুন, মাফ করলেন? আর তা ছাড়া আমার এই অন্যায়ের জন্যে শাহু যদি কিছু জরিমানা করেন, তাও দিতে রাজি আছি আমি।

এবার খোদাবক্সের হয়ে শাহুই তাড়াতাড়ি কথা কয়ে উঠলেন: আরে না—না, সে কী কথা! এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। কখনো কখনো মানুষমাত্রেরই মাথা গরম হতে পারে ওরকম। এর জন্যে এত ঝামেলা করবার কী আছে। খোদাবক্স তো আমার ভাই হয়, ওর তরফ থেকেই আমি বলছি—আপনি নিজে যখন মাফ চাইলেন, সেই সঙ্গেই সব চুকে-বুকে গেল।

—হ্যাঁ, তা হলে চুকে-বুকেই গেল। আর এ নিয়ে ঝামেলা করবার কী আছে?—শাহুর কথাগুলোরই কেমন একটা পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার, তার ভেতরে একটা ব্যঙ্গের খাদও মেশানো রইল কিনা, বোঝা গেল না। কিন্তু তার পরেই ছটফট করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার: আমি যাই ফতে ভাই। ভালুক গাঁয়ে আমার তিন চারটে রুগী আছে।

ডাক্তারের সাইকেলের শব্দ অনেকদূর মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কথা কইলেন না কেউ। তারও পরে শট্‌কার নল তুলে একটা টান দিলেন ফতে শা, একবার নড়ে-চড়ে বসলেন আলিমুদ্দিন। কী যে ঠিক বলা উচিত, খুঁজে পেলেন না শাহু; আর আলিমুদ্দিন যেন তলিয়ে রইলেন নিজের মধ্যেই।

তার পর :

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ল শাহুর। মনে পড়ল, খোদাবক্স আসবার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি।

—হঁ্যা, সকালে আপনার চাকর জিব্রাইলকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়েছিলাম। পাননি ?

—পেয়েছিলাম।—অন্যমনস্কভাবে মাস্টার জবাব দিলেন।

—এলেন না তো।

—আসব মনে করেছিলাম, সময় পাইনি।

—ও:।—শাহু একটু চুপ করে রইলেন : লীগের নামে খুব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদা উঠেছে, আরো উঠবে মনে হয়।

—খুব ভালো কথা!—নিজের অজ্ঞাতেই একটা উৎসাহের উত্তাপ অনুভব করলেন আলিমুদ্দিন।

—আজ বিকেলে তাদের জমায়েত হবার ঢোল দিয়েছি। আপনি তাদের লীগের উদ্দেশ্য, তার কাজ—সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। তা ছাড়া কাল সন্ধ্যেয় আমার এক ভাই ইস্‌মাইলও এসেছে সিরাজগঞ্জ থেকে। সে তো সব কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। ওদিকে তারা খুব কাজ করছে, এখানে যে এতদিন কিছু হয়নি, শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। সেও কিছু বলবে।

—বেশ তো।—এতক্ষণে আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—সকালে আপনাকে ডেকেছিলাম—একটু অনুযোগভরা স্বরেই শাহু বললেন, ইস্‌মাইলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। আপনি এলেন না--সে শিকারে বেরিয়ে গেল। ফিরতে অনেক দেরী হবে।

—আচ্ছা, বিকেলেই আলাপ হবে না হয়।—আলিমুদ্দিন ক্লান্তভাবে একটা হাই তুললেন : আর কোনো কথা আছে ?

—না, এই জন্যেই ডাকছিলাম।

—তা হলে আমি এখন উঠি শাহ্। আমার এখনো খানা-পিনা হয়নি।

—বলেন কি—এত বেলায়!—শাহ্ চমকে উঠলেন: তা হলে এখানেই—

—নাঃ, থাক থাক। জিব্রাইল বসে থাকবে। আদাব তা হলে—

আলিমুদ্দিন উঠে পড়লেন: বিকেলে তা হলে জমায়েতের সময়েই দেখা হবে।

কিন্তু বিকেলের জমায়েতে যা ঘটল, তার জন্যে আগে থেকে কারু মনে এতটুকুও আশঙ্কা ছিল না। শুধু ঝড়ই এলনা—বজ্রও ভেঙে পড়ল আকাশ থেকে।

এগারো

রেশমের কুঠির শ্রীহীন কম্পাউণ্ডটার মাঝখানে দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্রু সাহেব।

দৃষ্টিটা আকাশের দিকে। একটা বিশাল কালো কম্বলের কয়েকটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কালো মেঘের টুকরো। চারদিকের পোড়া মাটি থেকে একটা ভাপ উঠছে খানিক তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। শুকনো কলাপাতার মতো মরা ঘাসের রঙ। জলহীন খানা-ডোবার ফাটলে ফাটলে একরাশ শুঁটকি মাছের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে জীওল মাছের ঝাঁক; তিন হাত মাটির নিচে শক্ত খোলার ভেতরে পা-মুখ গুটিয়ে নিয়ে যোগমগ্ন আছে 'তুরা'র দল—সাঁওতালেরা এখনো ওদের সন্ধান পাবে না।

কিন্তু কবে?

একটা অদ্ভুত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ক্রু সাহেব। দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ জুড়ে ছুটে আসবে মহানন্দা-পুনর্ভবা-আত্রাইয়ের জল, দাম ঘাসের শীষকে বারো হাত লম্বা করে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ খেলবে সীমাহীন 'চাফালে চাফালে'? আর চাফাল থেকে সেই জল বয়ে আসবে এই শুকনো কাঁদড়ের সংকীর্ণ খাত দিয়ে—বয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মাটির তলায় সন্তর্পণে পুঁতে রাখা বাদামী রঙের সেই হাড়গুলিকে?

খুন। সে খুন করেছে।

নিজের হাত দুটো চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরল ক্রু সাহেব। যেন মণিবন্ধের হাড়দুটো তার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই আঙুল-গুলো অসহায়ভাবে কাঁপছে থর থর করে—তাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার। দিনের পর দিন—বছরের পর বছরগুলি মনের যে অন্ধকার

সংকীর্ণতায় স্তরে স্তরে মাকড়শার জাল বুনেছিল—জটাধর সিংয়ের খুন সেই জালটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তখনো মার্থা আসেনি জীবনে, তখনো আরম্ভ হয়নি এমন একটা শান্ত-নিরীহ অহিংস অধ্যায়। পার্সিভ্যাল ক্যারুর উদ্দাম রক্ত ধমনীতে সেদিন মাতলামি করে ফিরেছে। কালো মায়ের তপ্ত কামনার সঙ্গে বাপের মত্ত লালসার প্রেরণায় সেদিন—

একটার পর একটা উল্কা ঝরে-পড়া সেপ্টেম্বরের রাত্রে—চামড়ার মতো পুরু নীরেট অন্ধকারে—হাওয়ায় শিরশিরানিলাগা ঘন বেনাবনের মধ্যে। বার কয়েক দপ দপ করে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বেজে উঠেই—হঠাৎ একটা ফাটা ফুটবল-ব্লাডারের মতো চুপ্‌সে থেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। হাতের তলায় সেটা স্পষ্ট টের পেয়েছিল স্মাইদ্ ক্যারু; টের পেয়েছিল কেমন করে শরীরের উত্তাপ নিবে গিয়ে তা ক্রমশ শীতল আর আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকে।

—হ্যালো স্মাইদ্!

কোথায় যেন বিস্ফোরণ ঘটল ডিনামাইটে। উৎক্ষেপে যেন দোলা খেয়ে উঠল পায়ের তলায় মাটিটা।

—হ্যালো স্মাইদ্!

ভগবানের ভুল হতে পারে, শয়তানের ভুল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু অ্যাল্‌বার্টের নয়! তিব্বতের কোনো পাহাড়ী গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকলেও সে ঠিক আবিষ্কার করে ফেলত। প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে থাকলেও ডুবুরী হয়ে ঠিক গিয়ে চেপে ধরত অ্যাল্‌বার্ট।

ফোড়ার মধ্যে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার রুগীকে হাসতে বললে কেমন দেখায়, সেটা অভিব্যক্ত হল ক্রু সাহেবের মুখে। একটা প্রাণান্তিক মোহিনী হাসি হেসে বললে, হ্যালো অ্যাল্‌বার্ট!

—অনেক খুঁজে আসতে হল—পিঠের ওপর একজোড়া বন্দুকের ভারে কুঁজো হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যাল্‌ব্যার্ট বললে, সে রীতিমতো অ্যাড্‌ভেঞ্চার—একেবারে মঙ্গোপার্কের মতো।

—মঙ্গোপার্কের পরিণামটা তোমারও ঘটলে আমি বেঁচে যেতাম—মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে বললেও বাইরে দেঁতো হাসিটা বজায় রাখতেই হল ক্যারুকে : কিন্তু আজকে তো তোমার—

—না, আমার আসবার প্ল্যান ছিল আগামী কাল সকালে। কিন্তু শিকারের লোভে মনটা এমন ছটফট করছিল যে একটা দিনও আর দেরী করতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া ভাবলাম, তোমাকে একটা সার-প্রাইজ্‌ও দেব, তাই—

—কিন্তু তোমার তো খুব কষ্ট হল। যদি কাল সকালের ট্রেনে আসতে তা হলে এসব ট্রাবল হত না—এতক্ষণে একটা আশ্বস্ত আত্ম-প্রত্যয়ের স্বর ফুটল ক্যারুর গলায়। সত্যিই তো, কালকের ট্রেনে যদি অ্যাল্‌বার্ট আসত, তা হলে কী হত কে বলতে পারে? কে বলতে পারে একখানা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেত না, একটা রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে আনত না অ্যাল্‌বার্টকে? একটা রাত্রি—একটা সম্পূর্ণ রাত্রি ছিল তার হাতে। সে রাত্রিটিতে কী হতে পারত আর কী যে হতে পারত না—তা তো অ্যাল্‌বার্টের জানার কথা নয়!

—একটা মন্দ অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হল না!—কাঁধের ওপর দুটো বন্দুকের ভার বয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যাল্‌বার্ট তাকালো নিজের ট্রাউজারের দিকে। পা থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত লাল-কালো কাদায় একাকার; চকচকে জুতো জোড়ার আভিজাত্য একরাশ কাদার প্রলেপে চাপা পড়ে গেছে। নিম্নাঙ্গটা করুণ চোখে লক্ষ্য করে অ্যাল্‌বার্ট বললে, ট্রাব্‌লও অবশ্য দিয়েছে কিছু কিছু।

—তাই তো, ছিঃ ছিঃ—সখেদে জানালো ক্রু সাহেব; কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটা হিংস্র উল্লাস সাড়া দিয়ে বললে, বেশ হয়েছে। যেমন অকারণে ভূতের মতো পরের ঘাড়ে এসে চেপে বসতে চাও, উপযুক্ত একটা শিক্ষা হয়েছে তার। শুধু কাদা কেন, কাঁদড়ের ভেতর তুমি ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকলেই আমি সত্যিকারের খুশি হতাম।

পাকা বারো মাইল পথ ঠেঙিয়ে এখন অ্যাল্‌বার্টের প্রায় নাভিশ্বাস। শুধু কাঁধের ওপর দুটো বন্দুক ঝুলছে তাই নয়—হাতে একটা আধমণী স্যুটকেস। ক্যারুর প্ল্যান্টেশনের স্বপ্ন-স্বর্গে আসবার খেশারত ইতিমধ্যেই অনেকখানি দিতে হয়েছে অ্যাল্‌বার্টকে। মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়ে ঘুমুবার আশায় গল্পের যে লোকটি খাটিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর সারা দুপুর যাকে সেই খাটিয়া পিঠে বেঁধে মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় ছুটতে হয়েছিল পলাতকা গোরুর পিছে পিছে—অ্যাল্‌বার্টের সেই দশা এখন।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

—কি হে স্মাইদ্, এখন কি এখানে ঠায় দাঁড় করিয়ে রসালাপ করবে, না তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু বসতে দেবে?

—ওহো—সো সরি!—চোখ কান বুজে হেডিস্ কিংবা লিম্বোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো ক্রু সাহেব বললে, এসো, এসো। ওই আমার কুঠি।

কুঠি নয়—ভয়াবহ জঙ্গল। কালো জাগুয়ারের মতো থাবা পেতে বসে আছে মার্থা ক্যারু! ও ক্রাইস্ট্—ও হোলি শেফার্ড, এই মহা-সংকটে নিরীহ মেষশাবক ক্রু সাহেবকে রক্ষা করো প্রভু! ইহুদীদের অমন ক্রুশের ঘা সইতে পেরেছে, আর মার্থার দাঁতের ধার একটু সহ্য করতে পারবে না? হে মানবপুত্র, ইচ্ছে করলে তুমি সব পারো!

ধরা ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেমন কিছুক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে খেলা করতে

থাকে, তেম্‌নি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, সহজ আন্তরিকতায় অ্যাল্‌বার্টকে আহ্বান এবং স্বাগত জানালো মার্থা।

পাছে অ্যাল্‌বার্ট আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্থা তার স্বাভাবিক গলা-বাজানো শুরু করে, এই ভয়ে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হতে চাইল ক্রু সাহেব। বেশ শক্ত করে, আঁটঘাট বেঁধে।

—খুব বড় ঘরের ছেলে অ্যাল্‌বার্ট।

মার্থা সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—ওর এক কাকা লর্ড। আর্ল অফ—আর্ল অফ—সাহায্যের আশায় স্মাইদ্‌ এবার কাতর দৃষ্টিতে তাকালো অ্যাল্‌বার্টের দিকে।

অ্যাল্‌বার্ট তখন ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কর্দমাক্ত জুতোটার ফিতে খুলছিল। মাথা না তুলেই ক্রু সাহেবের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলে: আর্ল অফ ব্রেটনব্রুকশায়ার, নর্থ এক্সিটার।

ব্রেটনব্রুকশায়ার—নর্থ এক্সিটার! গালভারী শব্দ দুটো বোমার আওয়াজের মতো ক্রু সাহেবের নিজের কানেই ভয়াবহ শোনালো। এই দুটো প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর নামের কী প্রতিক্রিয়া মার্থার ওপরে ঘটে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্য ক্রু সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে।

না, লক্ষ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চমক লেগে রইল মার্থার মুখে চোখে। গোল্ডার্স গ্রীণে কোনো এক 'ক্যারুজ'-এর অবাস্তব একটা কল্পমূর্তি নয়; অ্যাল্‌বার্টের মধ্যে সার আছে, ভার আছে। গলার টাই-পিন, জামা আর হাতের বোতাম খাঁটি সোনার; বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আংটিটায় সবুজাভ একটুকরো পাথর ঝলমল করছে—হীরে হওয়াই সম্ভব; ধুলো-কাদায় মাখা বেশ-বাসে স্পষ্টই সচ্ছলতার ছাপ;

আপাতত পুরু একটা কাদার প্রলেপের নিচে ঢাকা পড়লেও জুতো-জোড়া যে খাঁটি পেটেণ্ট লেদারের, তাতেও সন্দেহ নেই।

মেয়েদের জন্মগত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে মিনিট তিনেকের মধ্যে এতগুলো জিনিস আবিষ্কার করল মার্থা। আরো আবিষ্কার করল—অ্যাল্‌বার্টের চুলের রঙ সোনালি, গায়ের বর্ণ তুষার-শুভ্র, মার্থার হাতের 'ক্যাটস্ আই' পাথরটার মতো চোখের তারা।

আর পাশাপাশি ক্যারু? কালো মায়ের নির্ভুল কালো ছেলে পার্সিভ্যালের এতটুকু চিহ্ন কোনোখানে খুঁজে পাওয়ার জো নেই।

একচোখে বিরাগ আর একচোখে বিমুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে মার্থা বললে, হাতমুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন মিস্টার ফিলিপসন—আমার চা এখনি তৈরী হয়ে যাবে।

জুতোটার তত্ত্বাবধান করতে করতে মাথা না তুলেই অ্যাল্‌বার্ট বললে অনেক ধন্যবাদ।

আর্ল অফ ব্রেটনব্রুকশায়ার, নর্থ এক্সিটার—শব্দ দুটোকে কানের মধ্যে ভরে নিয়ে চায়ের সন্ধানে চলে গেল মার্থা।

শুধু ক্রু সাহেব দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ হয়ে। এখনো সামলে নেয়নি অ্যাল্‌বার্ট, এখনো ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একটু পরে? মিথ্যার বালির বাঁধটা ধ্বসে একাকার হয়ে গেছে; কোন্ অলৌকিক উপায়ে এখন আল্‌বার্টকে দেখানো যাবে সারি সারি ফলন্ত আখরোটের বন, টলটলে নীল জলের নদীতে কার্পের ঝাঁক, ছবির মতো পামগাছের সারি? কোন্ ইন্দ্রজাল দিয়ে সৃষ্টি করা যাবে পার্সিভ্যালের সেই জম্‌জমাট রেশমের কুঠি—একখানা নয়, দু-দুখানা মোটর গাড়ি?

ক্রু সাহেবের কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে লাগল।

জুতোটাকে ছুড়ে ফেলে অ্যাল্‌বার্ট ক্লান্তভাবে শরীরটা মেলে দিলে।

—আঃ।

ক্রু সাহেব অপেক্ষা করতে লাগল বলির পশুর মতো।

—কী বিশ্রী কাদা এদিককার! উঠতে চায় না কিছুতেই।

—হাঁ, এঁটেল মাটি।—সভয়ে জবাব দিলে ক্রু সাহেব। যেন মাটিটা তারই হাতে তৈরী—সেই অপরাধে কৈফিয়ৎ দিয়ে নিচ্ছে একটা।

—পথে খানা-খন্দলও খুব।

—বর্ষায় জল আসে।—ফিস্‌ফিসে গলায় ক্রু সাহেব জানাল।

—বোসো না, দাঁড়িয়ে আছো কেন?—সহজ অন্তরঙ্গতায় অ্যাল্‌বার্ট বললে।

বসতে ভয় করে! কেমন শক্তিহীন হয়ে পড়বে, ইচ্ছে করলেই উঠে পালাতে পারবে না। তবু বসতেই হল। শরীরের কোথাও একবিন্দু জোর নেই, যেন সাতদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে এই মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

যে ঘরটায় দুজনে বসেছে—এটাই ক্রু সাহেবের ড্রয়িং রুম। পার্সি-ভ্যালের আমলে ঝলমল করত শ্রী-সমৃদ্ধিতে, মেজেতে ছিল দু ইঞ্চি পুরু রং-বেরঙের ছবি আঁকা কাশ্মীরী কার্পেট; ছিল সোফা-সেটি, গদী-মোড়া চওড়া চওড়া বেতের চেয়ার। এখন সে কাশ্মীরী কার্পেট কুঠিবাড়ির কোনো ছাত-ফাটা অন্ধকার ঘরে একরাশ ধুলোর লজ্জায় বিলীন হয়ে গেছে; সোফা-সেটি কোন্ মন্ত্রবলে ডানা মেলে উড়ে গেল ক্যারু সাহেবের নিজেরই তা ভালো করে জানা নেই। ভাঙা বেতের চেয়ারগুলিতে ছারপোকার বংশ খেয়েদেয়ে আরশোলার আকার ধারণ করছিল—মার্থা তাই সেগুলোকে বাড়ির পেছনের আস্তাকুঁড়ে বিদায় করেছে।

সিমেণ্টের চটা-ওঠা মেজেতে এখন খানকয়েক কাঁটাল কাঠের চেয়ার; শুধু সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে ঘরে টিঁকে আছে—বার্মা সেগুনের একখানা বার্ণিশ-ওঠা ভারী টেবিল; একটা জীর্ণদশা হ্যাটর্যাক্। দেওয়ালে ফাটা

কাচের ফ্রেমে বিবর্ণ কয়েকখানা ছবি—ঔপনিবেশিক ইংরেজের রুচি-মাফিক খানকতক শিকারের চিত্র, ক্যাভাল্‌রি চার্জের একটা রোমহর্ষক ব্যাপার, রঙ্ জ্বলে-যাওয়া সোনালি ফ্রেমে একখানা পঞ্চম জর্জের ছবি, তার তলায় ল্যাটিন হরফে গড্ সেভ দ্য কিং। আর আছে সবুজ ফ্রেমে ওভ্যাল্‌শেপের বড় একখানা ব্রেজিলিয়ান আয়না—পারা উঠে গিয়ে তার ভেতরে ফুটেছে বসন্তের ক্ষতাঙ্কের মতো একরাশ বিন্দুচিহ্ন—কাচের ওপর কুয়াশার মতো একটা ঝাপসা আবরণ।

গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে টানা-পাখার শূন্য হুকে মাকড়শার জাল পর্যন্ত কিছুই দৃষ্টি এড়াল না অ্যাল্‌বার্টের। মৃদু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল। একটা সিগারেট দিলে ক্রু সাহেবকে, একটা নিজে ধরালো।

স্তব্ধতা। কী বলা যাবে কেউ খুঁজে পেল না খানিকক্ষণ।

তবু অ্যাল্‌বার্টই নীরবতা ভাঙল।

—এখানে তোমরা কতদিন আছো?

—প্রায় চল্লিশ বৎসর।—বলতে গিয়ে ক্রু সাহেব সিগারেটের গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল।

কিন্তু আর যাই হোক, নিষ্ঠুর নয় অ্যাল্‌বার্ট। বন্দুক দেখেই যে পাখি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তার ওপর অকারণ আরো দুটো একটা টোটা খরচ করবার প্রবৃত্তি নেই তার। আর তা ছাড়া মদের নেশা। সেই নেশার ঝোঁকে নিজের অতৃপ্ত কামনাগুলোর ওপর কল্পনার রঙ্ ফলিয়েছিল স্মাইদ্। তার দোষ নেই।

সুতরাং অ্যাল্‌বার্ট সমস্ত জিনিসটাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

—তোমাদের বাড়িটা একটু পুরোনো হলেও নেহাৎ খারাপ নয়।

—হুঁ।

—বেশ খোলামেলা। চারদিকে চমৎকার মুক্ত প্রকৃতি।

ঠাট্টা করছে নাকি? ক্রু সাহেব বুঝতে পারল না। একবারের জন্যে মাথা তুলেই চোখ নামিয়ে নিলে।

—শহর থেকে এখানে এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি। আঃ—কী মিষ্টি এই মাঠের হাওয়া! দূরের গাছপালাগুলোকেও কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

ঠাট্টা? ক্রু সাহেব একটা ঢোঁক গিলল। যদি ঠাট্টাও হয়—তবু কী অদ্ভুত কৃতিত্ব অ্যাল্‌বার্টের! ছুরি যদি চালিয়েও থাকে, তার আগে ব্যবহার করেছে মর্ফিয়া—বেদনা বিন্দুমাত্র টের পাবার উপায় নেই!

—হুঁ।

—এই সব কুঠিবাড়ির ওপরে একটা আশ্চর্য মোহ আছে আমার। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন ক্যাস্‌লগুলোতে গেলে এইরকম একটা অপূর্ব অনুভূতি টের পাই। বাড়ি আর বিচিত্র প্রকৃতি মিলে যেন একটা ঘুমন্ত অতীতকে জাগিয়ে তোলে। বর্তমানটাকেই কেমন অবাস্তব বলে বোধ হতে থাকে তখন।

কাব্য করছে নাকি অ্যাল্‌বার্ট? না ব্যঙ্গকাব্য?

এবার সাহসে ভর করে ক্রু সাহেব সোজা তাকিয়ে দেখল। না—ব্যঙ্গের চিহ্নও কোথাও নেই। নিজের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে গেছে অ্যাল্‌বার্ট, হারিয়ে গেছে নিজের ভাবনার গভীরে। চোখ দুটোতে একটা মুগ্ধ তন্ময়তা। সে কি এই বাড়ির প্রভাবেই? না—ইংল্যাণ্ডের সেই অতীতের ঘনছায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন অতিকায় ক্যাস্‌লগুলির স্বপ্ন-স্মৃতিতে?

দিগন্তের সবুজ গাছগুলি ছাড়িয়ে আরো দূরে সঞ্চার করে ফিরল অ্যাল্‌বার্টের দৃষ্টি।

—আচ্ছা, আকাশের কোলে ওই যে নীল মেঘের মতো রেখা—ওটাই কি হিমালয়ান রেঞ্জ ?

—ওর নাম—তি—তিন পাহাড় !—বাংলাদেশের ভূগোল সম্পর্কে অ্যাল্‌বার্টের জ্ঞানটা খুব মারাত্মক নয়, এমনি প্রত্যাশা করে ক্রু সাহেব বললে, তা হিমালয়ান্ রেঞ্জই বলতে পারো বই কি !

—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো। ঠিক যেন একটা মোষের পিঠের মতো মনে হচ্ছে।

—হুঁ !

—আচ্ছা, মাউন্ট্ এভারেস্ট্ দেখা যায়না এখান থেকে ? আর কাঞ্চনজঙ্ঘা ? স্নো ভিউ ?

এতবড় মিথ্যে কথা কী করে বলা যায় আর ? জবাব দিতে হল, না।

—তবুও এও মন্দ নয়।—হাতের সিগারেটটার কথা ভুলে গিয়ে অ্যাল্‌বার্ট পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল।

—চা এসেছে।

বীণার ঝঙ্কারের মতো শোনাল মার্থার গলা, চমকে দুজনেই ফিরে তাকালো। মার্থার এ গলা ক্যারু সাহেব সর্বশেষ শুনেছিল জীবনের পূর্ব-রাগ পূর্বে। তারপর এতকাল ধরে ফাটা-কাঁসরের পালাই চলে এসেছে।

শুধু তাই নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে নিজের ভোল বদলে ফেলেছে মার্থা। কোন্ ফাঁকে বিগত কোনো ক্রিস্‌মাসের একটা ভালো পোষাক তুলে রেখেছিল, সেইটে পরে এসেছে, গালে মুখে পড়েছে প্রসাধনের একটা লঘু প্রলেপ। হঠাৎ যেন দশ বছর আগেকার কিশোরী মার্থা নবজন্ম লাভ করেছে।

আরো আছে। পুরোনো কাঠের বাক্সটা থেকে কী করে খুঁজে এনেছে সে আমলের একটা আর্দালীর পোষাক। চাপিয়েছে রাজবংশী

চাকরটার গায়ে। দু একটা জায়গায় পোকায় কেটেছে বটে, তবু তো মন্দ দেখাচ্ছে না একেবারে!

চাকরটা সামনে টেবিলের ওপর একটা কাঠের ট্রেতে করে চা আর খাবার রাখল। কোথায় পেল মার্থা চিনির চা—কেমন করে এল শাদা রুটি, একটুখানি মাখন, দুটো ডিম? বিহ্বল হয়ে ক্যারু সাহেব বসে রইল।

ক্ষুধার্ত অ্যাল্‌বার্ট গোগ্রাসে রুটি ডিম গিলতে লাগল, আর মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলতে লাগল মার্থার ওপরে।

কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, না আরো কিছু? আজ ক্যারুর মনে হল, দশবছর আগে কিশোরী মার্থা সত্যিই সুন্দরী ছিল তা হলে! হোক নেটিভ ক্রীশ্চানের মেয়ে, তবু ফর্সার দিকেই তার গায়ের রঙ, চোখের তারা দুটো আশ্চর্য গভীর—মুখে একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা। আরো আশ্চর্য, মার্থার বাঁ গালে একটা ছোট তিল যে আছে—সেটাও কেন এতদিন তার চোখ পড়েনি?

—তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? চা খাবে না?

সম্ভাষণটা ক্যারুর প্রতি। এবার আর বীণা বাজল না, ফাটা কাঁসরের রেশটা অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়া গেল।

—হ্যাঁ, এই যে নিই—থতমত খেয়ে একটা চায়ের কাপ কোলের দিকে টেনে নিলে ক্রু সাহেব।

খাবার শেষ করে রুমালে মুখটা মুছে নিলে অ্যাল্‌বার্ট। মার্থাকে পরিতৃপ্ত স্বরে জানালো, অশেষ ধন্যবাদ।

মার্থা হাসল। ক্রু সাহেবের আবার মনে হল অদ্ভুত শাদা ওর দাঁতগুলি!

মার্থা বললে, এই পাড়াগাঁয়ে যখন এসে পড়েছেন, তখন এ কষ্টটুকু করতেই হবে। এখানে এ ছাড়া আর কিছুই তো পাওয়া যায় না।

বেশ ভালো ইংরেজি বলে তো মার্থা। সহজ, সুন্দর, চমৎকার নির্ভুল উচ্চারণ। হাঁ—হাঁ, মনে পড়েছে। মিশনারী বাপের মেয়ে—দার্জিলিংয়ের কী একটা স্কুল থেকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছিল বটে। আর এই মার্থাকে এতকাল ভুলে ছিল স্মাইদ্ ক্যারু—ভুলে ছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে। গোল্ডার্স গ্রীণে ক্যারু কম্পানির জাগ্রৎ স্বপ্নে এতদিন এই বাস্তব জগৎটা কোন্‌খানে হারিয়ে গিয়েছিল ?

ক্যারুর কালো হাতের পাশে ধব্‌ধবে শাদা একখানা হাত অ্যাল্‌বার্টের। সে হাতের কড়ে আঙুলে চকচক করছে ঈষৎ হরিৎ একখণ্ড পাথর—হীরেই নিশ্চয়। সোনালি রঙের চুলে ঝকঝক করছে বিকেলের সোনালি আলো। এই-ই পার্সিভ্যালের সত্যিকারের স্বজাতি, তার সগোত্র। আপাদমস্তক এমন একটা অনন্যতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে এর পাশাপাশি কালো মায়ের কালো ছেলে এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। যেন অবচেতন মনে হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে, অমন করে তাকে পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে কেন সেদিন চলে গিয়েছিল পার্সিভ্যাল ক্যারু !

—আপনি কখনো যান নি ইয়োরোপে ?—মার্থার প্রতি অ্যাল্‌বার্টের একটা উজ্জ্বল প্রসন্ন প্রশ্ন।

—নাঃ—মার্থার দীর্ঘশ্বাস।

—যাবেন একবার। দেখে আসবেন।—মার্থাকে অ্যাল্‌বার্ট বলে চলল, যদি আগে থেকেই খবর দেন, আমিও না হয় সহযাত্রী হবো। তারপর আমাদের ওখানে দু চারদিন আতিথ্য নিয়ে আসবেন।

ক্যারু সাহেব চুপ করে বসে রইল। এ আলাপের মধ্যে তার আজ কোথাও স্থান নেই, সে যেন একান্তই অনাহূত, অবাঞ্ছিত আগন্তুক। এখানে অ্যাল্‌বার্ট পার্সিভ্যালের সগোত্র—আর মার্থা ? মার্থা যেন হঠাৎ

দশ বছর আগে তার কুমারী জীবনে ফিরে গেছে,—পরিচ্ছন্ন, কমনীয় একটি বিদুষী মেয়ে। গোল্ডার্স গ্রীণের স্বপ্ন না দেখালে যে মার্থাকে কোনদিন জয় করা যেত না।

ক্যারু শুনে যেতে লাগল।

—যাবেন এক্সিটারে। দেখে খুশি হবেন।

—কী আছে দেখবার ?—মার্থার সাগ্রহ প্রশ্ন।

—সেণ্ট্ পিটারস্ ক্যাথিড্রাল। আটশো বছর আগেকার।

—আর ?

—আর জয়স্তম্ভ। উইলিয়াম দি কঙ্কারার তৈরী করিয়েছিলেন।

এক্সিটার। চোখ বুজে মার্থা দেখতে লাগল।

—ওখান থেকে কিছু দূরেই ব্রেনক্রকশায়ার। সেইখানে আমাদের বাড়ি ক্রকশায়ার হল। ছবির মতো একেবারে। বড় বড় পপলার গাছের ছায়া। হনিসাক্লে ঢাকা বাড়িগুলি। পপিতে আলো করা বাগান, রাশি রাশি পাকা আপেল আর হট্-হাউস ভরা স্ট্র বেরি।

ক্রু সাহেব যেমন করে তার প্ল্যাণ্টেশনের গল্প বলেছিল, এ কি তাই ? ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারল এই মুহূর্তে মার্থা আর অ্যাল্‌বার্টের মধ্যে সে যেন কোথাও নেই। একটা অনধিকারীর মতো সসম্ভ্রমে অনেকখানি দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঠের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে আসবার আগেই উঠল ঝিঁঝিঁর ডাক। কুঠিবাড়ির কব্জাভাঙা জানালা বাতাসে আর্তনাদ তুলতে লাগল পেত্নীর কান্নার মতো।

মার্থা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আলো জ্বেলে আনি।

আশ্চর্য চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল সে। আটশো বছর আগেকার সেণ্ট্ পিটারস্ ক্যাথিড্রাল তাকে হাতছানি দিচ্ছে, ডাক পাঠিয়েছে

উইলিয়াম দি কঙ্কারারের সিটাডেল। হনিসাকলের আবরণে ঢাকা বাড়িগুলির চারপাশ থেকে তার রক্তে হয়তো সাড়া দিয়েছে দীর্ঘকায় পপলার-বীথির মর্মর স্বর।

অ্যাল্‌বার্ট আবার একটা সিগারেট ধরালো।

আর স্মাইদ্ ক্যারু শুনতে পেলো মাঠের ওপারে ডেকে উঠছে শেয়াল।

বারো

দারোগা তারণ তলাপাত্র সগৌরবে আহীর পাড়ায় গিয়ে পৌছুলেন।

বেশ সমারোহ করেই এসেছেন। বিশ্বাস নেই লোকগুলোকে এক একটার চেহারা দেখলে হৃৎকম্প হয় দস্তুরমতো।

রিভলভার নিয়েছেন, সঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড্ গুলি। এ-এস্-আই বদরুদ্দিনের সঙ্গে বন্দুক। তা ছাড়া বন্দুকধারী দুজন কনস্টেবল, জন আষ্টেক চৌকিদারও।

কনেস্টবল আর চৌকিদারদের আগেই রওনা করে দিয়েছিলেন; তারা যখন গ্রামের কাছাকাছি এসেছে, তখন সাইকেল নিয়ে তিনি আর বদরুদ্দিন এসে ধরেছেন তাদের। তারপর সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এসে ঢুকেছেন আহীরপাড়ায়।

নিমগাছের ছায়ার নিচে বড় একখানা আটচালা ঘর। আট দশটা মহিষ চরছে আশে পাশে। বরেন্দ্রভূমির মাঠের মহিষ। নিরীহ দুর্বল জীব নয়; বিশাল বপু—মাথার ওপর খরশৃঙ্গে আতঙ্কজনক সম্ভাবনা।

দারোগা বললেন, ওগুলো কী?

বদরুদ্দিন বললেন, মোষ স্যার।

তারণ চটে উঠলেন।

—মোষ যে তা আমিও জানি। আমি কি গোরু যে আমায় মোষ চেনাতে এসেছেন? সে কথা বলছি না। মানে, ওগুলো গুঁতোয় কিনা?

বদরুদ্দিন সন্দিগ্ধ চোখে অতিকায় প্রাণীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, কী করে বলব স্যার, আমার সঙ্গে তো ওদের আলাপ নেই।

তারণ একবার কট্‌মট্‌ করে তাকালেন বদরুদ্দিনের দিকে।

বললেন, আলাপ থাকলে কি আর থানার এ-এস্‌-আই হতেন? ওইখানেই বাঁধা থাকতেন।

—কী বলছেন স্যার?—বদরুদ্দিনের চোখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—না, কিছুনা।—তারণ সাম্‌লে নিলেন। লীগের মন্ত্রীত্ব—কাউকে চটানো ঠিক নয়। সব ভাই-বেরাদারের দল। কখন পেছন থেকে চুক্‌লি খেয়ে দেবে—তারপরেই ভবিষ্যতের পথটি একেবারে বন্ধ। আর কিছু না হোক, ট্রান্সফার তো নির্ঘাৎ। দুর্ঘটনা হিসেবে সেটাই কি কম মর্মান্তিক! এটা জেলার একটা বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল্‌ থানা—একদল অত্যাচারী জোতদারও আছে। সুতরাং প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারে থানাটা অনেকের কাছেই লোভনীয়। পট্‌ করে যদি সদরের কাছাকাছি কোথাও বদ্‌লি করে দেয়, তা হলে বসে বসে বেলপাতাই শুঁকতে হবে খালি।

সুতরাং তারণ মৃদু হাসলেন: একটু রসিকতা করলাম আপনার সঙ্গে।

—ওসব রসিকতা আমার সঙ্গে করবেন না স্যার, আমার ভালো লাগে না—হাঁড়ির মতো মুখ করে জবাব দিলেন বদরুদ্দিন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন দু'জনে। একটু পেছনে পেছনে আসছে চৌকিদার আর কনস্টেবলেরা। দিন দুই আগে কী করে একটা খাসি বাগিয়েছিলেন দারোগা, সেই সম্পর্কে সরস আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। সুতরাং একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।

একজন চৌকিদার বলছিল, তুমি বুঝি ভাগ পাও নাই চৌবেজী?

চৌবে ঘৃণাভরে জবাব দিলে, হামি গোস্‌-উস্‌ খাইনা—ব্রাহ্মণ আছি।

—সব ব্রাহ্মণকেই চিনা আছে হে—দ্বিতীয় চৌকিদার মিটি মিটি হাসল।

চৌবে কানে আঙুল দিলে, ছিঃ ছিঃ—উ সব মত্ বোলো।

দ্বিতীয় কনস্টেবল বামাচরণ বাঙালি। ক্লাশ এইট্ পর্যন্ত বিদ্যা। একটা সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স আছে তার। থানায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে এল-সি—লোকে তাকে সম্মান করে মুহুরীবাবু ডাকে—চৌবের মতো পাহারাওলা সাহেব বলে না। কিন্তু এই সমস্ত জরুরি ব্যাপারে তার পদমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যায়—পট্টি-পাগড়ী এঁটে তাকেও বেরিয়ে পড়তে হয় বন্দুক কাঁধে করে। নিতান্ত অতৃপ্ত বিরক্তির সঙ্গে বেরোয় বামাচরণ—পোষাকে না হোক, অন্তত মুখের চেহারায় টেনে রাখতে চেষ্টা করে একটা গাম্ভীর্যের মুখোস; বিছিয়ে রাখতে চায় আভিজাত্যের আবরণ।

সুতরাং বামাচরণ কিছু বললে না, শুনে যেতে লাগল।

তৃতীয় চৌকিদার বললে, মিছাই খালি দারোগার দোষ দেছেন। উ জমাদারটাই কি কম ঘুঘু হে? হামার দুই দুইটা রাওয়া মোরগা বেমালুম প্যাটত্ সান্ধাই দিলে!

—এই চুপ চুপ। শুনিবা পাবে। থামি গেইছে।

সত্যিই থেমে গেছেন তারণ। মোষগুলোর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

—বদরুদ্দিন মিঞা?

—বলুন স্যার।

—সামনে মোষ।

বদরুদ্দিন বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছি স্যার। আমার চোখ আছে, একজোড়া চশমাও আছে।

—হুঁ!—দারোগা গম্ভীর হলেন: গুঁতোবে নাকি?

—কিছুই বলা যায়না স্যার!—বদরুদ্দিন পরম তৃপ্তিতে হাই তুললেন একটা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে লক্ষ্য করতে লাগলেন তারণ। এই শৃঙ্গী প্রাণীগুলো সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত—এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত দারোগা হয়েও এদের সম্পর্কে তাঁর একটা ভয়াবহ বিভীষিকা। কারণ আছে। ছেলেবেলায় একবার একটা এঁড়ে গোরু তাঁকে গুঁতিয়ে নর্দামায় ফেলে দিয়েছিল—সেই থেকে জীবগুলোকে আদৌ পছন্দ করেন না তিনি।

—তা হলে দাঁড়ান, পেছনের ওদের আসতে দিন—দারোগা বললেন।

—ওরা কী ভাববে স্যার? মোষের ভয়ে এগোতে পারছেন না আপনি?—একটা চিম্‌টি কাটলেন বদরুদ্দিন।

—তা বটে।—দারোগা উত্তেজনা বোধ করলেন। কাপুরুষতার এ রকম অপবাদ সহ্য করা অসম্ভব। কোমর থেকে খুলে নিলেন রিভলভার।

—ওকি স্যার, রিভলবার আবার কেন?

—তেড়ে এলে গুলি করব।

—আপনি যে হিন্দু স্যার—বদরুদ্দিন টিপ্পনি ছাড়লেন: আপনার আবার ধর্মে বাধবে যে।

—না, বাধবে না। গোরু মারলে পাপ হয়, কিন্তু মোষ মারলে কী হয়, তা শাস্ত্রে লেখা নেই—সন্তর্পণে অগ্রসর হলেন তারণ।

কিন্তু মোষগুলো লক্ষ্যই করল না তাঁদের। যেন লক্ষ্য করবার যোগ্য বলেই মনে করল না। প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে মাটি থেকে কী একরাশ চিবিয়ে চলল তারা।

—যাক—বিপদের সীমানা পার হয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দারোগা: একটা সমস্যা মিটল। কিন্তু যা বলছিলাম। সামনের ওই আটচালাটা কার বলুন তো?

বদরুদ্দিন জবাব দিলেন, যমুনা আহীরের।

—যমুনা আহীর !—দারোগা কপাল কোঁচকালেন : যেন চেনা চেনা ঠেকছে নামটা।

—হাঁ স্তার। দাগীর খাতায় নাম আছে।

—হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু কী জাতের ?

—ডেঞ্জারাস্। পাঁচ সাতটা হাঙ্গামায় জড়িয়েছে এ পর্যন্ত। একবার একটা খুনের দায়েও পড়েছিল—কিন্তু জালে পড়েনি, ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

—এবার আর বেরোবেনা, গলা টিপে ধরব—ভয়াবহ একটা মুখ করলেন তারণ তলাপাত্র : জটাধর-মার্ডারের ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে, কী বলেন ?

—কিছুই অসম্ভব নয় স্তার। চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

তারণ আবার থামলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, জোয়ান বুঝি খুব ?

—বিরাট।—এতক্ষণে বদরুদ্দিনের মুখেও চিন্তার ছাপ পড়েছে : আকারে-প্রকারে ওই মোষগুলোর মতোই হবে। আর মেজাজও প্রায় ওই রকম।

—তা হলে দাঁড়ান। ওদের আসতে দিন। যে রকম লোক বললেন, হঠাৎ যদি ঝাঁপিয়ে টাঁপিয়ে পড়ে, গোলমাল হতে পারে একটা। কী বলেন ?

—নিশ্চয়—এবার বদরুদ্দিনও সমর্থন জানালেন। মোষ সম্পর্কে তারণের মতো তাঁর অহেতুক স্নায়বিক দুর্বলতা নেই বটে, কিন্তু যমুনা সম্পর্কে কোনো বিশ্বাস নেই তাঁরও। বিশেষ করে কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছেন—একটু শান্তিপূর্ণ ভাবেই ঝামলা মিটিয়ে ফেলাই পছন্দ করেন তিনি। বন্দুক একটা সঙ্গে এনেছেন বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে না হলেই আন্তরিক সুখী হবেন।

তারণ একটা সিগারেট ধরালেন।

—বুঝলেন বদরুদ্দিন মিঞা, এরিয়াটা এমনিতে মন্দ নয় কিন্তু এই সব লোকের জন্যেই যা কিছু গোলমাল।

—সে তো ঠিক কথা স্যার। কিন্তু ব্যাপার কী, জানেন ?—বদরুদ্দিন 'সাদী'র একটা বয়েৎ আওড়ালেন : গোটা কয়েক কাঁটা না থাকলে কি আর গোলাপ ফুল ফোটে ?

গোলাপ না হোক, গোলগাল পাকা ফল তো বটেই। কিন্তু কাঁটা বড্ড বেশি। মাঝে মাঝে তারণ তলাপাত্রেরও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আজ পনেরো বছর দারোগাগিরি করে অনেক পোড় খেয়েছেন —কিন্তু বুকের ধুকপুকুনি থামেনি এখনো।

চৌকিদার আর কনস্টেবলের দলটা এসে পড়ল।

তারণ এদিক ওদিক তাকালেন।

—লোকজন কাউকে তো দেখছি না। সব গেল কোথায় ?

—কাজে-কর্মে গেছে হয়তো। মোষ চরাতেও যেতে পারে।

—হুঁ! ডাকো তো দেখি কেউ—

চৌকিদারেরা মুখিয়েই ছিল। তিন চারজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : যমুনা—যমুনা হে—

যমুনা এলনা—দোর গোড়ায় দেখা দিলে একটি মেয়ে।

ঝুমরি। রূপের সঙ্গে কঠিন একটা নিষ্ঠুরতা মেশানো। রূপোর কাঁকন পরা শক্ত বাহু। জ্বালাধরা চোখ। নাগিনী।

দোরগোড়ায় পুলিশ দেখে একটা চমক খেলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে।

দারোগা মেয়েটার দিকে তাকালেন—কিন্তু চোখের ওপর চোখ রেখেই নামিয়ে নিলেন মাটিতে। দৃষ্টিটা যেন সহ্য করা যাচ্ছে না। অতসী কাচ। প্রতিফলিত—কেন্দ্রিত সূর্যের আলো।

—কে মেয়েটা ?—মুখ ঘুরিয়ে বদরুদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন তারণ।

জবাব দিলে বামাচরণ। অভিজ্ঞ গম্ভীর গলায় বললে, ওর মেয়ে—ঝুমরি। বছর খানেক আগে একটা মারামারির ব্যাপারে একেও থানায় আনতে হয়েছিল স্যার। রেকর্ড আছে।

—হুঁ। বাঘের বাচ্চা বাঘ—নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্বীকারোক্তি করলেন দারোগা।

নির্নিমেষ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। দারোগার হয়ে বদরুদ্দিনই প্রশ্ন করলেন—তোর বাপ কোথায় রে ?

—শো গেয়া।

—শো গেয়া! বামাচরণ ঝাঁঝিয়ে উঠল: আমরা এতগুলো লোক এই ঠাটা-পরা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঠায় পুড়ছি আর তিনি শো গেয়া! ডাক, ডাক—

—ব্যাটা য্যান্ লাটসায়েব হছে!—একজন চৌকিদার ফোড়ন কাটল। এই মহল্লায় রাতে তার চৌকি দিতে হয় না—তা ছাড়া সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীও আছে। সেই ভরসায় আরও জোরের সঙ্গে সে তার বক্তব্য পেশ করল: ডাকি উঠাও জলদি!

মেয়েটা ঘরের ভেতরে চলে গেল।

প্রখর ধারালো চেহারা। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিনতা একটা। চোখ দুটো অদ্ভুত জ্বলন্ত। দারোগা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্য। ইস্পাত। নাগিনী।

শশব্যস্তে যমুনা আহীর প্রবেশ করল।

—দারোগাবাবু, জমাদারবাবু! গোড় লাগি। তো রোদে কাঁহে দাঁড়াইয়ে আছেন ? আইয়ে বৈঠিয়ে—

বারান্দায় রাখা খাটিয়া আর চৌপাইগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

করে সে আহ্বান জানাল দলটাকে। সাইকেল নামিয়ে রেখে দারোগা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহের ভারে কঁ্যাচ্ ক্যাচ্ করে একটা আর্তনাদ জাগল খাটিয়ায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য আতিথ্য নেওয়া নয়, কর্তব্য। যমুনার বিশাল দেহটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে একবার রিভলভারের বাঁটটা স্পর্শ করলেন দারোগা—যেন আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে নিলেন। তারপর বার করলেন পকেট থেকে তাঁর নোটবই আর কপিয়িং পেন্সিলটা।

—তোমার নাম?

—যমুনা আহীর হুজুর।

—পেশা?

—হামরা আহীর হুজুর। দহি, ক্ষীর, ঘী তৈয়ার করি, বেচি।

—আর কিছু করো?—দারোগা নোট বই থেকে মুখ তুললেন। সন্তর্পণে এগোতে হবে এইবার, আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে কাজের কথায়। টোকা দিয়ে দেখা দরকার।

—আর কী করব হুজুর? মহিষ-টহিষ চরাই—সরল উত্তর দিলে যমুনা আহীর।

—কিছু করো না—না?—রিভলভারের বাঁটের ওপর আলগোছে বাঁ হাতটা ফেলে রেখে দারোগা বললেন, এই মারামারি, খুন-জখম?

আধ হাত জিভ কেটে যমুনা বললে, না।

—না? থানার খাতা কিন্তু অন্য রকম বলে।—দারোগা আর একটা সিগারেট ধরালেন: তা ছাড়া চেহারাও তো তেমন সুবিধে নয় বাবু। ভালোমানুষ বলে তো মনে হয় না।

—দেখছেন না, ব্যাটার চোখ কি রকম লাল?—বদরুদ্দিন দারোগাকে আর একটু আলোক-দানের প্রয়াস করলেন।

—চোখের আর দোষ কী আছেন হুজুর ?—যমুনা আপ্যায়নের হাসি হাসল : হামি থোড়া থোড়া গাঁজা পী।

—গাঁজা পী ? দারোগা ভ্রূকুটি করলেন : সে গুণটাও আছে তা হলে ! আর দারু ?

—মিল্‌নেসে থোড়া থোড়া ও ভি পী।

—কোনোটাই বাকী নেই স্যার। সব পী করে পিপে হয়ে আছে ! একেবারে সর্বগুণান্বিত—বদরুদ্দিন আবার সংশোধনী জুড়ে দিলেন। দারোগা অত্যন্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। না—সন্দেহ নেই। এ লোকটা জটাধরকে খুন যদি নাও করে থাকে, খুন করার যোগ্যতা রাখে নিশ্চয়ই।

—জটাধর সিংকে চিনতে তুমি ?

একটা চকিত সতর্কতার আভা খেলে গেল যমুনার মুখের ওপর। আস্তে ঢোঁক গিলল একবার।

—কে জটাধর সিং ?

বদরুদ্দিন খিঁচিয়ে উঠলেন : ন্যাকামি হচ্ছে—না? জটাধরকে চেনো না ? কুমার ভৈরবনারায়ণের বরকন্দাজ ?

—কুমার সায়েবের বরকন্দাজ তো ঢের আছে হুজুর। কে জটাধর সিং ?

—আহা, ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানো না ?—তারণ ভেংচি কাটলেন : একেবারে কেষ্টর জীব! যে লোকটা বিলের মধ্যে খুন হয়েছে, জানো তাকে ?

—না।

—এখন তো জানবেই না।—দারোগা ক্রূর হাসি হাসলেন, আর একবার ছুঁয়ে নিলেন রিভলভারটা, ভালো করে দেখে নিলেন নিজের

দলটাকে : আমিও তারণ তলাপাত্র, জানিয়ে ছাড়ব। যাক—তোমার ঘর খানাতল্লাস করব।

—করুন হুজুর।

—ঢুকুন বদরুদ্দিন সাহেব—ভালো করে খোজ-খাঁজ করুন।

বদরুদ্দিন বিব্রত বোধ করলেন। এ দারোগার অন্যায়। নিজে স্বার্থ-পরের মতো নিরাপদে বসে থেকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন বাঘের গর্তের ভেতর! বিশ্বাস নেই—এ লোকগুলোকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হাতের নাগালে পেলে যে কোনো সময় ঘাড়ের ওপর একখানা দা বসিয়ে দিতে পারে।

—আপনিও চলুন না স্যার—

—আপনি গেলেই যথেষ্ট হবে—সিগারেটটায় টান দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বললেন দারোগা।

বদরুদ্দিন বিপন্নমুখে তাকালেন এদিক ওদিক।

—বামাচরণ এসো, চৌবে, তুম্ ভি আও।

কিন্তু সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মিলল শুধু লোহার তার দিয়ে গাঁটে গাঁটে জড়ানো দুখানা অতিকায় লাঠি।

দারোগা বললেন, লাঠিদুটো নিয়ে চলুন। রক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেলেছে হয়তো। কিন্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করলে কিছু না কিছু ট্রেস্ পাওয়া যাবেই।

—আর লোকটা? ছেড়ে যাবেন?

—পাগল!—দারোগা এবার খাপ থেকে রিভলভারটা বের করলেন, যমুনা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা গেল।

—গ্রেপ্তার!—যমুনা কিন্তু ভয় পেল না। অল্প একটু হাসল: কেন হুজুর?

—জটাধর সিংয়ের খুনের দায়ে। চৌবে, পাকড়ো ইস্‌কো।

একটা সন্ত্রস্ত প্রস্তুতি পড়ে গেল। কিছু যেন আসন্ন হয়ে আসছে। কোনো দুর্ঘটনা, কোনো দুর্যোগ। এক্ষুণি ভয়ংকর কিছু একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। যমুনা আবার হাসল। নিরুত্তরে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে চৌবের দিকে।

হাতকড়া পরালেন বদরুদ্দিন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন দারোগা। মনে হল, যেন বুকের ওপর থেকে একতাল পাথর নেমে গেছে—কেটে গেছে একটা ভয়ানক ফাঁড়া। এত সহজে এমন প্রকাণ্ড মানুষটাকে গ্রেপ্তার করা যাবে—এ যেন কল্পনাও ছিল না।

দারোগা বললেন, চলুন বদরুদ্দিন মিঞা। এবার আর দু চারটাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। এ রকম সাস্‌পেক্টেড্ আর কে কে আছে বলুন তো?

প্রজ্ঞাবানের গম্ভীর গলায় বামাচরণ বললে, দুখীরাম আহীর, ঢুণ্ডি আহীর, গণশা আহীর—

—চলুন, দেখা যাক একে একে।

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। যমুনাকে নিয়ে নেমে এলেন দাওয়ার বাইরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ঝুমরি। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা। চন্দ্রবোড়া সাপের মতো সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষাক্ততা; শানানো ইস্পাতের মতো দীপ্তির সঙ্গে ঘাতনের ইঙ্গিত।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে যমুনা একটু হাসল।

—হাজতে চললাম বেটি। কবে আসব ঠিক নেই। ভৈঁসাগুলোকে দেখিস ভালো করে।

ঝুম্‌রি কথা বলল না। শুধু অতসী কাচের মতো চোখের অগ্নিদৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর—

তারপর দারোগা যেই কয়েক পা এগিয়েছেন, অমনি তীব্র তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড গলায় একটা শিসের আওয়াজ করল সে। রোদে পোড়া মাঠের ওপর দিয়ে সেটা সাইরেনের মতো দূর-দূরান্তে ভেসে গেল।

আর সভয়ে দারোগা দেখলেন এক মুহূর্তে মাথা তুলেছে শান্ত নিরীহ মহিষের পাল। তাদের চোখগুলোতে আদিম অরণ্যের অমার্জিত বন্য হিংসা। লেজ আকাশে তুলে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাত আটটা ছুটে আসছে তাঁদের দিকেই।

গুলি করবার সুযোগ পেলেন না কেউ—হয়তো সাহসও হল না। দুই লাফে বদরুদ্দিন নিমগাছটায় উঠে পড়লেন—তাঁর তৎপরতা দেখলে বানরও লজ্জা পেত তখন। চৌকিদারদের একজন শিংয়ের গুঁতোয় ছিটকে পড়ল—বাকী সব যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তারণও হাতের সাইকেলটা ছুড়ে ফেলে গোটা কয়েক লাফ মারলেন, তারপর আবিষ্কার করলেন, একটা পাঁকে ভরা দুর্গন্ধ ডোবার মাঝখানে গলা পর্যন্ত তলিয়ে আছেন তিনি।

আর সেই অবস্থায়, বিস্ফারিত চোখ মেলে তারণ দেখতে পেলেন—বহু দূরে বেনা ঘাসের বন ভেঙে তীব্রগামী তীরের মত একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

সে যমুনা আহীর!

কিন্তু ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ করে চলন্ত পাহাড়ের মতো ওটা কি এগিয়ে আসছে এদিকে? মোষ? চক্ষের পলকে পচা ডোবার ভেতরে ডুব মারলেন তারণ তলাপাত্র।

তেরো

—একবার জয়গড়ে আসুন, খুব জরুরি দরকার।

নগেন ডাক্তার খবর পাঠিয়েছে।

দুপুরে সাধারণত চাকরী থাকে না। এই সময়ে গীতোক্ত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার ভৈরবনারায়ণ বিশ্রাম-শয্যায় গা এলিয়ে দেন। এই বিশ্রাম পর্বটা ভয়াবহ। জাহাজের মতো একখানা সুবিশাল খাটে বপুষ্মান কুমার বাহাদুর পড়ে থাকেন একটি ব্রহ্মদেশীয় শিশু-হস্তীর মতো। দুবেলা কুস্তি-করা দুজন ছাপরাই চাকর তখন সশব্দে তাঁর অঙ্গসেবা করতে থাকে। মহিষ স্নান করাবার দৃশ্য তার চোখে পড়েছে—ডলন-মলনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আধ মাইল দূর থেকে; কিন্তু কুমার বাহাদুরের অঙ্গ-মর্দনের ধকল একদিন সহ্য করতে হলে বুনো মোষও জেলী মাছ হয়ে যেত। যণ্ডা জোয়ান দু দুটি পালোয়ানের মুখ দিয়ে ফেনা ছুটতে থাকে; মাথার ওপর বায়ান্ন ইঞ্চি পাখার প্রচণ্ড ঘূর্ণন সত্ত্বেও তাদের গা দিয়ে দরদর করে নামতে থাকে কাল-ঘাম।

রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি—সন্দেহ কী! সকালে-বিকেলে অন্তত কয়েক হাজার লোক হাত বুলিয়ে আসে কাশীর বিশ্বনাথের মাথায়। অবশ্য হাত বুলিয়ে কিছু তারা হাতাতে পারে কিনা কে জানে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বসে বসে দিতে হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। সে-হিসেবে ভৈরব নারায়ণ নিশ্চয় দেবাংশসম্ভূত। বিশ্বনাথের কাছে কিছু নগদ বিদায় মেলে না, এখানে অন্তত রাজসেবায় দুটি প্রবল-মল্ল প্রতিপালিত হচ্ছে।

বারোটা থেকে পাঁচটা—এইটুকুই সব চেয়ে মূল্যবান সময়। সাময়িক-ভাবে ঘটোৎকচের দানবীয় নিদ্রা। তারপর পাঁচটায় চা—তার মধ্যে

ফিরে এলেই চলবে। তখন কুমার বাহাদুরের চার পাশ ঘিরে বসবে স্তাবকের দল—ডাক্তার, পোস্টমাস্টার,সদর-নায়েব, সুমারনবীশ। ঘোড়ায় চড়ার গল্প, ভৌতিক কাহিনী, কান্তনগরের যুদ্ধের ইতিহাস, লাট-সাহেবের একখানা আস্তো খাসির রাং খাওয়ার জ্বালাময়ী বর্ণনা। সেই সময় তাকে হাসতে হবে, হেঁ হেঁ করতে হবে—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। তার আগে পর্যন্ত আপাতত ছুটির পালা।

কুমার বাহাদুরের অঙ্গ মর্দন চলতে থাকুক, এই ফাঁকে তার জয়গড় ঘুরে আসা দরকার।

ঘরটায় একটা তালা দিলে, তারপর বারান্দা থেকে সাইকেলটা নামিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন।

আবার সেই ধান-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কুমারীর অকলঙ্ক সিঁথির মতো শুভ্র পথের রেখা; অগণিত পদ্মকোরকের মতো তুঁষের হিরণ্ময় পাত্রে ঘন ক্ষীরের মতো জমে-আসা ধান। দূর-দূরান্তব্যাপী হরিতের ওপর হিরণ্যের দ্যুতি পড়েছে—আর কদিন পরেই পাকতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এবার পোকার উপদ্রব আছে, কিছু নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া আকাশে কালো মেঘেরও আনাগোনা চলছে—যদি জল আসে তা হলে এদের অর্ধেক ডুবে যাবে এমন আশঙ্কাও জেগেছে লোকের মনে।

দু ধারে ধান ক্ষেতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সে চলল। হালকা ধুলোর ওপর সাপের রেখা, আর মানুষের পদচিহ্নের ওপর চাকার দাগ টেনে চলল সাইকেল।

এই ক্ষেতটা পার হলে তিন চারটে শিমূল গাছ এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে— ; ওইখান দিয়ে ত্রিভুজের একটা কোণের মতো ভৈরবনারায়ণের এলাকার মধ্যে খানিকদূর ঢুকে গেছে ফতে শা পাঠানের জমি। দুজনের মধ্যে ওটা নিয়েই লাঠালাঠি আর ঝামেলা।

এই সীমান্ত-রেখার ওপারে পর পর সাঁওতালদের কয়েকখানা ছোট ছোট গ্রাম—ফতে শাহুর অবাধ্য প্রজার দল। টুল্কু আর ধীরুয়া সাঁওতালের জন্মভূমি।

মাঠ পার হয়ে শন-ঘাসের বন ঠেলে চলতে চলতে মনে পড়ছিল দিন কয়েক আগে এখানেই সাঁওতালদের বুনো-শূয়োর মারতে দেখেছিল সে। আরো মনে পড়ল সাঁওতালদের ওখানে নাচ দেখবার এবং মাংস-ভাত খাওয়ার একটা নিমন্ত্রণও ছিল তার। সেদিন সেটা রক্ষা করবার সুযোগ হয়নি—একদিন এসে চুকিয়ে যেতে হবে তাকে।

—আদাব বাবু।

তাকিয়ে দেখল, পাশের আল্ দিয়ে একদল মুসলমান চাষী এগিয়ে আসছে। সম্ভাষণটা তাদেরই।

—হাজী সাহেব যে! খবর কী?—প্রসন্ন মুখে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল রঞ্জন: জিয়াফৎ আছে নাকি কোথাও?

দলটি তখন রাস্তার সামনে এসে পড়েছে। সকলের আগে আগে জামান হাজী—এ তল্লাটের তিনিই সামাজিক নেতা। সম্পন্ন চাষী। প্রায় একশো বিঘে জমি রাখেন, খান চারেক গোরুর গাড়িও আছে। অল্প-সল্প ইংরেজী জানেন—হজ ঘুরে এসেছেন দু দুবার।

মধ্যবয়সী লোক—মুখে একটি প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকে। হেসেই বললেন, না, জিয়াফৎ নয়।

—তবে এত সেজে গুজে চলেছেন কোথায়? আজ তো কোনো পরব নয়।

সাজ গোজের ঘটা সকলেরই একটু আছে,—সন্দেহ নেই। কারো মাথায় শাদা ধব্ধবে গোল টুপি, কারো বা রাঙা টকটকে ফেজ। শাদা পায়জামার ওপর হাজী সাহেব কালো রঙের একটা লম্বা কোট পরেছেন,

পায়ে চকচকে জুতো। বাকী সকলের কারো ফর্সা পাঞ্জাবী, কারো জাপানী-আদ্দির জামা, পাট-ভাঙা লুঙ্গি আর পায়জামা। বেশ সমারোহ করেই বেরিয়েছে দলটা।

হাজী সাহেব বললেন, একটা মিটিং আছে আমাদের।

—মিটিং ? কিসের মিটিং ?

—লীগের।

—লীগের কাজকর্ম এ তল্লাটেও আছে নাকি ?—রঞ্জন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এতদিন ছিল না—এইবারে হচ্ছে।—হাজী সাহেবের হাসিটা এবারে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ল ; ফুটে বেরুল একটা আন্তরিক প্রসন্নতা।

—সে তো বেশ কথা। কিন্তু মিটিংটা হচ্ছে কোথায় ?

—শাহুর কাছারীতে। কাল ঢোল দিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে।

—শাহুর কাছারীতে!—রঞ্জনের স্মৃতি আবার সজাগ হয়ে উঠল : আলিমুদ্দিন মাস্টারও আছেন নিশ্চয় ?

—তিনিই তো গোড়া। তাঁর চেষ্টাতেই সব হচ্ছে।—কৃতজ্ঞতার রেশ লাগল হাজী সাহেবের গলায় : খুব এলেমদার লোক।

—হাঁ, আমার আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে—রঞ্জন বললে, আচ্ছা আপনারা যান। ওদিকে আবার আপনাদের দেরী হয়ে যাবে।—রঞ্জন সাইকেলে উঠল।

—আপনি কোথায় চললেন ?

—যাব একটু জয়গড় মহলে।

—আদাব—

—নমস্কার—

শন ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে আবার এগিয়ে চলল সে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার! হাঁ—বার তিনেক নানা উপলক্ষে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কথাবার্তার সুযোগও ঘটেছে কিছু কিছু। তীক্ষ্ণধী, বিচক্ষণ লোক। চাপা ঠোঁট—মুখের ওপর একটা শান্ত কাঠিন্য। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, অনেকগুলি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি তাঁর আয়ত্ত।

তিনিই লীগের সংগঠনের কাজে মন দিয়েছেন! খুব চমৎকার কথা। দেশের প্রতিটি সম্প্রদায় আত্ম-সচেতন হোক, নিজের মর্যাদাকে ফিরে পাক; মুক্তি লাভ করুক সব রকমের হীনম্মন্যতার পীড়ন থেকে। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে! জাতির এক একটি অঙ্গ যদি শক্তিলাভ করতে পায়, তা হলে তার সমগ্র দেহের পূর্ণ জাগরণে আর কতখানি দেরী হবে?

পৃথক্ জাতীয়তা—পৃথক্ সংস্কৃতিবোধ? হোক—কোনো ক্ষতি নেই। অন্তত বাঙালি মুসলমান যে প্রধানত দীক্ষিতের সন্তান—এ ঐতিহাসিক সত্যকেও ভুলে যাওয়া চলে। আর সংস্কৃতি! অন্ধের মতো চোখ বুজে না থাকলে মানতেই হবে সত্যপীরের পাঁচালী আর মাণিকপীরের গানের মধ্য দিয়েও তার ব্যবধানের সীমাটাকে কোনোদিন একেবারে মুছে ফেলা যায়নি। এমন কি, "দীন-ইলাহী"র ঐক্য মন্ত্র যিনি দিয়েছিলেন, সেই সম্রাট আকবরের সময়েও আগ্রা সহরে মস্‌জিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল—এমন কথা ইতিহাস বলে।

সুতরাং পৃথক্ জাতিতত্ত্বে আপত্তি নেই। ইস্‌লাম জাগুক। শুধু আসন্ন বন্যার ওই মেঘগুলোর মতো একটি জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা দুর্দান্ত মানবতা যখন খাদ্যবস্ত্র-মুক্তি-সংস্কৃতির আকুলতায় ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো প্রশ্ন তুলবে:—'কংখাম'—তখন নিজেদের

অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যে তাকে প্রতিবেশী কিরাত-পল্লী দেখিয়ে দেবেনা তো এর উদ্গাতারা? তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার মতো পর্যাপ্ত সংস্থান এদের আছে তো?

সেইখানেই ভয়। তার সে ভয় যে একেবারে অমূলক নয়—তারও আভাস দেখা গেছে নানাভাবে। অন্যকে অবিশ্বাস করা নয়—আত্ম নিজেকে বিশ্বাস করতে পারাই সব চেয়ে বড় কাজ।

হয়তো আলিমুদ্দিন মাস্টার তা পারবেন।

জয়কালী মন্দিরের বট গাছটা সাইকেলের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দিগন্ত থেকে সামনে এগিয়ে এল।

এই জয়কালীর মন্দির থেকেই সম্ভবত জয়গড়। গড় হয়তো কোনোদিন ছিল—হয়তো 'পাল-বুরুজে'র গড়খাই এরই সীমান্ত-রেখা। গ্রামের পূব-দক্ষিণ জুড়ে ইংরেজী 'এল্' হরফের মতো অজগর জঙ্গলে ছাওয়া একটা জাঙ্গালও আছে বটে—হয়তো গড়ের প্রাচীরের ধ্বংসশেষ। জয়কালীর পুরোনো মন্দির এখন একটা মাটি ঢাকা ইঁটের পাঁজা—গ্রামের লোক কিছু খরচপত্র করে একটি ছোট মন্দির তুলে দিয়েছে তার পাশে।

পেছনে একটা বড় বট গাছ—তার তলায় একখানা পঞ্চমুণ্ডী আসন। বাংলা দেশে 'ডায়াকির' যুগে যখন সারা উত্তরাঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ অরাজকতার স্রোত বয়ে গিয়েছিল—সেই সময়ে কোনো দস্যুপতি ওই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তার পাশে একটা মজা-দীঘি—ওর ভেতরে সন্ধান করলে নাকি এখনো একশো আটটি নরবলির কঙ্কাল-করোটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্বল স্নায়ুর মানুষ আজো নাকি রাত-বিরেতে বিভীষিকা দেখে এই পঞ্চমুণ্ডী আসনের আশপাশে।

নির্জন মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, আজ আবার নতুন করে এক তন্ত্রসাধনার সূত্রপাত হয়েছে এই জয়গড়ে। এও কত নরবলি দাবী করবে কে বলতে পারে সে কথা!

গ্রামে ঢুকতে গোরুর গাড়ির 'লিক'-আঁকা একটা মেটে রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আর একটা বাঁক ঘুরতেই খানিকটা উঁচু ডাঙার ওপর ছোট একটি মহুয়া বন। আর এই মহুয়া বনটির পরেই নগেন ডাক্তারের বাড়ি।

বাড়ির বাইরের ঘরে ডিস্‌পেন্‌সারী। ছোট ডিস্‌পেন্‌সারী— যৎসামান্য আয়োজন। একটা বার্ণিশবিহীন চেয়ারে বসে এবং সাম্‌নে কাগজ-পত্র আর ডাক্তারী ব্যাগরাখা টেবিলটার ওপরে পা তুলে কী যেন পড়ছিল নগেন ডাক্তার।

বারান্দায় সাইকেল তোলার শব্দে বই সরাল নগেন, পা নামালো। সাদরে ডাকল, রঞ্জনদা? এসো—এসো—

রঞ্জন ঘরে ঢুকে নগেনের মুখোমুখি একটা চেয়ার নিয়ে সশব্দে বসে পড়ল।

সামনে ঝুঁকে পড়ল নগেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললে, আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তা হলে?

—পেয়েছি।—রঞ্জন হাসল: কিন্তু যত তাড়া আমায় দিয়েছিলে, তোমার মধ্যে সে তাড়া তো দেখছি না। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনো হচ্ছিল। কী পড়ছিলে?

নগেন হাসল লজ্জিতভাবে—গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। এত ভালো কর্মী, এমন দৃঢ়ব্রত, তবু একটা অপূর্ব শান্ত কমনীয়তা আছে ওর ভেতরে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ—তবু এখনো ছেলেমানুষি চেহারা। দেখলে মনে হয় আঠারো উনিশের বেশি বয়েস হবে না।

সলজ্জ গলায় নগেন বললে, একটা লিটারেচার পড়ছিলাম।

—কী লিটারেচার ?

—আমাদের ডাক্তারীর। বিলিতী ওষুধের কোম্পানি পাঠিয়েছে।—নগেনের চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে উঠল: কিন্তু এ দিয়ে আমরা কী করব ? এ সব পেটেণ্ট ওষুধ প্রেস্‌ক্রীপশন করবে শহরের ডাক্তারেরা—মোটা দাম দিয়ে কিনে খাবে শহরের লোক। তা ছাড়া এদের অধিকাংশই ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে।

রঞ্জন বললে, তোমার প্রথম কথাটা বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টা পেঁায়াটে রয়ে গেল। ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে কেন ?

নগেন বললে, মেডিসিন তৈরী করতে ভুলে যাচ্ছে ডাক্তাররা—এদের ওপরেই বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। তার ফল কী দাঁড়াচ্ছে জানো ? কম্পাউণ্ডিং করে দিলে যার দাম পড়ত বারো আনা, পাঁচ টাকা দিয়ে তার পেটেণ্ট ওষুধ কিনে খেতে হচ্ছে লোককে।

রঞ্জন হাসল: পৃথিবীতে দেখছি সমস্যার আর অন্ত নেই। কিন্তু ও কথা যাক—ওসব আমার পক্ষে একেবারে অনধিকার চর্চা। এখন বলো দেখি, এমনভাবে হঠাৎ তাড়া কেন ?

নগেন বললে, বলছি সব। কিন্তু এখানে নয়। চলো ভেতরে। অনেকগুলো দরকারী পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, এখন দেড়টা। চারটের মধ্যে আমায় ছেড়ে দিতে হবে—মৃদু হেসে বললে, নইলে আমার চাকরী যাবে, জানো ?

—যাওয়াই ভালো—নগেনও হাসল: নাও, ভেতরে চলো।

বাড়িতে মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। তবু পাড়াগাঁয়ের নির্ভুল পরিচ্ছন্নতা ঝকঝক করছে সব জায়গায়। উঠোনে ঢেঁকি আছে,

তার পাশে লাউ মাচা। পেছনের প্রাচীর ঘিরে বড় একটা বাতাবী গাছ দাঁড়িয়ে আছে—অকৃপণ ফলের সমারোহ সেখানে।

নিজের শোবার ঘরে নগেন নিয়ে এল রঞ্জনকে।

আড়ম্বরহীন ঘর। একধারে ছোট একটি শেল্‌ফে খানকতক বই; শীতলপাটি বিছানো তক্তপোষের মাথার কাছে জড়ানো সতরঞ্চির বিছানা।

নগেন বললে, বোসো।

রঞ্জন বিছানায় বসল। সামনে একটা টুল টেনে নিলে নগেন।

—তারপর?

—দাঁড়াও। অনেক দূর থেকে এসেছ—একটু জল খাও আগে।

—পাগল নাকি! এই তো খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি।

—ছ মাইল সাইকেলের ধাক্কায় সে হজম হয়ে গেছে—নগেন চিৎকার করে ডাকল: উত্তমা, উত্তমা?

—আসছি দাদা—বাড়ির কোনো এক দূরপ্রান্ত থেকে সাড়া এল।

—উত্তমা কে? তোমার বোন বুঝি?

—হাঁ।—নগেন বললে, তুমি ওকে দেখোনি আগে। মামাবাড়ি গিয়েছিল মাস তিনেক আগে—মামীমার খুব অসুখ চলছিল।—একটা প্রসন্ন স্নেহ ফুটে উঠল নগেনের মুখে: ও আমার ডান হাত। সব কাজ-কর্ম করে দেয়। মোটামুটি খানিক কম্পাউণ্ডারী শিখিয়ে নিয়েছি, দরকার হলে প্রেসক্রীপসন অবধি সার্ভ করে। ও না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

—বিনা পয়সায় বেশ কম্পাউণ্ডার পেয়েছ তো।

—তা পেয়েছি।—নগেন হাসল: কিন্তু ওই কম্পাউণ্ডারটির জ্বালায় আমার ডাক্তারখানা চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারী হয়ে উঠেছে।

—কেন ডাকছিলে দাদা ?

দোরগোড়ায় উত্তমাকে দেখতে পাওয়া গেল।

—কে এসেছে ছাখ্। চিনিস একে ?

—বুঝেছি, রঞ্জনদা।—উত্তমা হাসল, এগিয়ে এসে প্রণাম করল রঞ্জনকে।

—আরে ছিঃ ছিঃ—থাক থাক—

—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? প্রণামটা পাওয়া জিনিস—আদায় করে নিতে লজ্জা নেই।

উত্তমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্য আর অপরিমিত প্রাণ থাকলে যে হাসি আলোর মতো নির্ঝরিত হয়ে পড়ে—সেই হাসি। রঞ্জন ভালো করে তাকিয়ে দেখল উত্তমাকে।

শ্যামবর্ণের ছোট-খাটো একটি মেয়ে। রূপের ব্যাকরণে সুশ্রী বলতে বাধে। পরণে আধ-ময়লা ডুরে শাড়ী। মেধাবী পুরুষের মতো চওড়া কপাল—গ্রামবৃদ্ধারা হয়তো সংজ্ঞা দেবেন 'উঁচ্-কপালী' বলে। সেই কপালের ওপর এক গুচ্ছ অলকের নিচে স্বেদবিন্দু চিকমিক করছে। অটুট স্বাস্থ্যে গড়া শরীর, আর সব চাইতে আগেই চোখে পড়বে পরিপুষ্ট নিটোল দুখানি হাত। আঙুলগুলি কঠিন—মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা; চম্পক-কলির ব্যঞ্জনা কোথাও নেই—পরিশ্রমের নির্ভুল চিহ্ন। হাতে চারগাছা করে কাঁচের চুড়ি—তাদের ওপর মাটির একটা হাল্কা আস্তরণ পড়েছে।

—কী করছিলি রে ?

—বাগানে মাটি কোপাচ্ছিলাম।

—বেশ করছিলি। মাটি কোপানো এখন থাক। রঞ্জনদার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আয় আগে।

—না—না, কিছু দরকার নেই—সন্ত্রস্তভাবে রঞ্জন জবাব দিল।

—গুরুপাক কিছু নয়, সামান্য কিছু গাছের ফল।—নগেন হাসল: তা ছাড়া আমি ডাক্তার—আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। যা—যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উত্তমা বেরিয়ে গেল।

কথা আরম্ভ করার আগে চিন্তাটাকে যেন গুটিয়ে নেবার জন্যে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো নগেন। জানালার ওপারে মহুয়া বন—তার পেছনে টাঙ্গন নদীর খাড়া পাড়ি। অন্তর্মুখী চোখটাকে সেদিকে রেখে নগেন বললে, তুরী-পাড়ার পঞ্চায়েতে আমি থাকতে পারিনি। তুমি যখন গিয়েছিলে, তখন ওতেই কাজ হয়েছে। কেমন মনে হল?

—চমৎকার। একেবারে বারুদের মতো তৈরী। আগুন ধরিয়ে দিলেই হয়।

—হ্যাঁ—ওরা বেশ গড়ে উঠেছে। ভালো লড়াই করতে পারবে—কচি কচি মহুয়া পাতাগুলোর দিকে চোখ রেখে নগেন বললে, এত বয়েস হয়েছে, তবু সোনাই মণ্ডলের কি রকম জোর দেখেছ?

—তাই দেখলাম।—উৎসাহিত হয়ে উঠল রঞ্জনের স্বর: ওরা তো চাষী। ওদের কাছে থেকে এতখানি আশা আমাদের ছিল না!

—চাষী আর কোথায় দেখছ!—নগেন এবার চোখ ফিরিয়ে এনে সোজা রঞ্জনের দিকে তাকালো: ওদের দেনার অবস্থা জানো? বেশির ভাগেরই এখন ক্ষেত-মজুরের দশা—লাভের মোটা টাকাটা সোজা চলে যায় মহাজনের হাঙর-পেটে। যাও সামান্য কিছু হত—ডাঁড়ার বানে একেবারে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। এবার ডাঁড়ার বাঁধ না দিলে ওদের আর বাঁচবার জো নেই।

—কিন্তু ডাঁড়ার বাঁধ দিলে কী হবে বাড়তি জলটার? অন্যদিকে বান ডাকবে না তো?

—না, না, সে সব ভয় কিছু নেই। ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করলে দক্ষিণের ঢালু মাঠটা দিয়ে জল চলে যাবে। আগে তাই যেত। ও তো মরা মাঠ—এমনিতেই বর্ষায় সায়র হয়ে যায়—হাত-খানেক করে জল বাড়বে এই যা। আসলে ক্ষতি শুধু ভৈরবনারায়ণের, জলকর দুটোয় একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু কয়েকশো টাকার জলকর বাড়াতে গিয়ে দু হাজার বিঘে জমির ধান এমনভাবে বরবাদ হবে নাকি?

—না, এবার আর তা ওরা হতে দেবে না। কালা পুখ্‌রিতে আগুন জ্বলবে, আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

নগেন বললে, রঞ্জনদা, তোমার কাছ থেকে আসল পরামর্শটাই বাকী। যত দূর মনে হচ্ছে—শুধু তুরীদের একার লড়াইতেই হবে না। এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে একটা 'কমন্ কজ্' তৈরী করতে হবে।

—আহীররা?

—নিশ্চয়। ওরা তো আগুনের মতো গরম হয়ে আছে। হাতের লাঠি ওদের তৈরী। তা ছাড়া জটাধর সিংয়ের খুনের পর পুলিশ এসে ওদের ওখানে হামলা করেছিল। যমুনা অ্যাবস্‌কন্‌ডিং। শোনোনি?

—না তো!—রঞ্জন চকিত হয়ে উঠল: তাই নাকি?

উদ্দীপ্ত মুখে নগেন বললে, কাল আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। এতদিন আমাদের কৃষাণ-সমিতির কথা বলেছি—কিন্তু আমল পাইনি। এবার দেখলাম আর ভাবনা নেই। একদম তৈরী। এ লড়াইয়ে ওরাই হবে ভ্যানগার্ড। তুরীদের লড়াইয়ের কথা ওদের বলেছি। যমুনা আমার সঙ্গে দেখাও করে গেছে—একেবারে আগুন।

—এতটা হয়ে গেছে—কিছু জানতাম না! তারপর?

—যা ক্ষেপে আছে, একটা সুযোগ পেলেই হল।

—এটা একটা মস্ত খবর।

নগেনের চোখ জলতে লাগল: টিলার সাঁওতালদেরও পাওয়া যাবে।

—ওরা তো ফতে শা পাঠানের প্রজা।

—তাতে আটকাবে না। সব জমিদারই ওদের পক্ষে সমান। যদি আমরা ভালো করে অর্গানাইজ্ করতে পারি, তা হলে সমস্ত এরিয়ার মানুষগুলোকে এই লড়াইয়ে টেনে আনতে পারব—নগেনের গলার স্বর একটা আগামী প্রত্যাশায় উঁচু পর্দায় চড়তে লাগল আস্তে আস্তে: ওই সাঁওতালদের ওপর তোমার হাত আছে—ওদের টেনে নামাতে হবে তোমাকে।

—দেখি চেষ্টা করে—রঞ্জন হাসল: কিন্তু তোমাদের জ্বালায় কুমার বাহাদুরের ওখানে আমার অমন ভালো চাকরীটা চলে যাবে দেখছি। কোনো ঝামেলা ছিল না—শুধু নির্বিঘ্ন গীতাপাঠ। ভবিষ্যতেরও আশা ছিল—হয়তো একটা ব্রহ্মোত্তরও মিলে যেত এক সময়ে।

নগেনও হাসল: আখেরের ভাবনা ভাবতে হবে না। তোমার নাম আমাদের বইতে টোকা আছে। দুনিয়া যখন পাল্টাবে—যখন নতুন করে মাটির বিলি-ব্যবস্থা হবে, সেদিন তুমিও ফাঁক পড়বে না। তবে তার আগে এ অসুবিধেটুকু ভোগ করতেই হবে।

—তার মানে এটা ইন্ভেস্টমেণ্ট?

—তাই—নগেন হেসে উঠল সশব্দে।

উত্তমা প্রবেশ করল। শাড়ীটা বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে—ধুয়ে মুছে এসেছে শরীর থেকে মাটি কোপানোর চিহ্ন। গাছ-কোমর বাঁধা আঁচলটিকে বিন্যস্ত করে নিয়েছে শোভন কমনীয়তায়। একহাতে

ঝক্‌ঝকে পেতলের থালায় সযত্নে কাটা বাতাবী লেবু, কয়েক টুকরো পেঁপে, দুটি কলা আর কিছু নারিকেলের নাড়ু, আর এক হাতে কাচের গ্লাসে জল। সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব একটি রূপান্তর হয়েছে উত্তমার। একটু আগেকার কঠিনবাহু সেই কর্মী মেয়েটি নয়—চির-পরিচিত একটি বাংলার নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নগেন উঠে আর একট টুল টেনে দিলে। তার ওপর থালা-গ্লাস নামিয়ে রাখল উত্তমা।

—এত কী হবে ?

—খাবেন।—উত্তমা হাসল।

—সব ?

—সব।

—কিন্তু আমি তো একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

নগেন বললে, রঞ্জনদা, বিনয় বন্ধ করো। খাওয়াটা শেষ করে নাও, অনেক দরকারী কাজ আছে।

রঞ্জন বললে, আর্চ্ছা লোক তো দেখছি। এমনি ভাষায় বুঝি অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ?

—অতিথি হলে তো অভ্যর্থনা করব।—নগেন বললে, নাও, নাও। রাজবাড়ির রাজভোগের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু টাট্‌কা গাছের ফল, আর ঘরের নাড়ু—সম্পূর্ণ হাইজিনিক্।

অগত্যা আহারে মন দিতেই হল।

—মা কই রে উত্তমা ?

—জ্যাঠামশাইয়ের ওখানে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

—আমি পছন্দ করি না—মেঘের মতো মুখ করে নগেন বললে।

উত্তমা বললে, মা বলেন, সামাজিকতা রাখতে হবে।

—না রাখাটাই নিরাপদ—নগেনের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

উত্তমা জবাব দিল না, দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

নীরবে খাওয়া শেষ করল রঞ্জন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল নগেন, আর জানালা দিয়ে বাইরের মহুয়া বন আর টাঙ্গন নদীর উঁচু পাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল উত্তমা।

—আর দেব?—খানিক পরে মৃদু গলায় উত্তমা জিজ্ঞাসা করল।

—সর্বনাশ—এই ম্যানেজ করতে প্রাণান্ত! নিতান্তই নগেনের ভয়ে এতগুলো খেতে হল।

থালা আর গ্লাসটা হাতে তুলে নিলে উত্তমা।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে নগেন পিছু ডাকল।

—হাঁ রে, পোস্টারগুলো লেখা হয়ে গেছে?

—সামান্য কিছু বাকী।

—দুপুরেই শেষ করে দিবি—সন্ধ্যের আগে আমার চাই।

—আচ্ছা—উত্তমা বেরিয়ে গেল।

—কিসের পোস্টার?—রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—আমাদের কৃষক সমিতির ঘোষণা। আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি। —নগেন একটু হাসল: আর এ গ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, কে জানো? আমারই জ্যাঠামশাই!

—ও?—রঞ্জন তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে। খানিকটা বোধগম্য হচ্ছে—উত্তমা আর নগেনের ব্যক্তিগত আলোচনার তাৎপর্যটা।

—বড় জোতদার। অনেক হাল আর বিস্তর কৃষাণ। তিনি আমাদের সমিতিকে ভাঙবার জন্যে তলে তলে মতলব আঁটছেন। এখনো সুবিধে করতে পারেননি—তবে সময় হলেই ঘা দেবেন। যাক, সে কথা। এবার তোমায় একটু উঠতে হবে রঞ্জনদা।

—আবার কোথায় ?

—যেতে হবে আমাদের কিষাণ সমিতিতে। যে প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবে একটু।

—আচ্ছা চলো—হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, ঘণ্টাখানেক সময় আছে এখনো।

আগে খবর পেয়ে কুড়ি পঁচিশজন এসে অপেক্ষা করছিল কৃষাণ সমিতিতে।

বড় একখানা ঘর। ওপরে খড়ের চালা—নিচে চাটাই। মাটির দেওয়ালে কিছু পোস্টার—কিছু ছবি। কাস্তে হাতুড়ীর ওপর জ্বলজ্বলে একটা লাল তারা—ওদের পথের নির্দেশ।

অফিস-সেক্রেটারী মনোহর জানলো, এদিকের ব্যবস্থা আমরা করে এনেছি। অন্তত দুশো লোক নিয়ে যেতে পারব।

—আহীররা আসবে, সাঁওতালদের ভারও নিয়েছেন রঞ্জনদা।—নগেন বললে, এই আমাদের প্রথম লড়াই! মনে রাখবেন এই আমাদের শক্তি পরীক্ষা। এখানে যদি আমরা জিততে পারি—তাহলে আমাদের আর কেউ রুখতে পারবে না।

জয়ধ্বনিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল।

ফেরবার পথে বিকেলের আলোয় বহুদূর থেকে ভৈরবনারায়ণের প্রাসাদটা যেন আজ আবার নতুন করে চোখে পড়ল রঞ্জনের। চোখে পড়ল, বাড়িটার মাথার ওপর একসার শকুন উড়ছে—যেন আসন্ন অপমৃত্যুর আঘ্রাণ পেয়েছে ওরা।

চৌদ্দ

প্রায় দুই হাজার লোক জড়ো হয়েছে শাহুর কাছারীর সামনে।

একদল লোক যথাসাধ্য সেজে গুজে এসেছে—যেন ইদের নামাজের জমায়েৎ। আর একদল উঠে এসেছে সোজা ক্ষেত থেকে, তাদের গায়ে লাল মাটির স্বাক্ষর; খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর—তেলের অভাবে জমাট বাঁধা লাল চুল, হাতে হাসুয়া আছে, লাঠিও আছে; ময়লা গামছায় বেঁধে চিঁড়ে মুড়ির নাস্তাও নিয়ে এসেছে কেউ কেউ—সঙ্গে আছে টিনের চৌকো দেশী লণ্ঠন। অনেক দূরে যেতে হবে—কত রাত হবে ফিরতে, কে জানে। আর বলা যায় না—জমায়েতের পরে হয়তো গানের ব্যবস্থাও থাকতে পারে—এমন আশাও কারো কারো মনে মনে স্থান পেয়েছে। রাতটা মন্দ কাটবেনা তা হলে।

আর আছে জনকয়েক চৌকিদার। নিজেদের তাগিদেই তারা এসে জুটেছে। রং-জ্বলে-যাওয়া উর্দির ওপর চকচক করছে পেতলের চাপরাশ—এই বিশেষ উপলক্ষ্যটির জন্যেই মেজে ঘষে তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে। অনাহূতভাবেই সভার শান্তিরক্ষা করছে তারা।

—কী হছে উদিকে? গোলমাল করিবেন না।

—এই মিঞা, চুপ করি বৈসো ক্যানে। খামোকা ওইঠে ফির্ কিবা ঝামেলা লাগাইলে হে?

—চিল্লাবা হয় তো এইঠি থাকি উঠি যাও। ইটা তামাসা নহো, ওয়াজ হেবে।

রোদে ঝকঝকে চাপরাশ আর গম্ভীর মুখেও তারা যথোচিত পদমর্যাদা রাখতে পারছে না। নানারকম টীকা-টিপ্পনি আসছে তাদের লক্ষ্য করে।

—ইস, ত্যালখানা ছাখো হে! য্যান দারোগা হছেন!

আর একজন চিম্‌টি কাটল: আইতের (রাতের) ব্যালা চোর দেখিলে বাপ বাপ করি পালাবা পথ পায় না, এইঠে আসি মেজাজ ছাখাছে!

—সিটাই কহো না। কামের ব্যালায় কিছু নাই—আইতে আসি খামোকা চিল্লাই চিল্লাই ঘুমের দফা রফা করি দেয়। ফের চৌকিদারী ট্যাক্সো না দিবা পারিলে ঘটি বাটি ক্রোক্ করিবা চাহে!

—এই চুপ চুপ—আট দশ জন ধমকে দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার লোকের দৃষ্টি ধাবিত হল একই দিকে।

একখানা পুরোনো টেবিলের আশেপাশে খানকতক চেয়ার। তার পেছনে একটা উচু বাঁশের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি হরিৎ পতাকা। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে ঐস্‌লামিক ভ্রাতৃত্বের প্রতীক; ইদের চাঁদের চির প্রত্যাশা—একটি ধ্রুব-নক্ষত্রে সত্যধর্মের চির-ইঙ্গিত, গাঢ় সবুজের বর্ণলেখায় চির-তারুণ্যের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। মোহম্মদ রসুলের (দঃ) কদমে কদমে অনুসরণ করে দুরন্ত অভিযানের দিগ্বিজয়ী ঝাণ্ডা।

হাওয়ায় উড়ছে সবুজ পতাকা। শাহুর কাছারী থেকে নেমে সেই পতাকার তলায় এসে আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন পাঁচ সাত জন—আজকের অনুষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে এসেছেন ফতেশা পাঠান—পরণে কালো আলপাকার লংকোট, আদ্দির পাজামা, মাথার জরির কাজ করা টুপি; বুকে সোনার চেনে বাঁধা একটা ঘড়িও সেঁটে নিয়েছেন। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারটা দখল করলেন—আজকের সভায় অনির্বাচিত হলেও অনিবার্য সভাপতি তিনিই। পেছনে পেছনে এলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, এন্তাজ আলী ব্যাপারী, জন দুই স্কুলমাস্টার, থানার জমাদার সাহেব, পালনগর মস্‌জিদের

ইমাম এবং ইস্‌মাইল। শাহু আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাত-তালি দিলেন—সমবেত জনতাও আনন্দে করতালি মেলালো।

বাকী সকলে কেউ কেউ চেয়ারে, কেউ কেউ সামনে পাতা দুখানি বেঞ্চিতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় আকাশে মুঠি তুলে ইস্‌মাইল চিৎকার করে উঠল : মুস্‌লিম লীগ জিন্দাবাদ —

সহস্র সহস্র গলায় শোনা গেল আন্তরিক প্রতিধ্বনি : মুস্‌লিম লীগ জিন্দাবাদ—

—পাকিস্তান—

—জিন্দাবাদ !

—কায়েদে আজম—

—জিন্দাবাদ !

—এইবার বসুন সব, এখনি সভার কাজ আরম্ভ হবে—ইস্‌মাইল আদেশ করল। বছর বাইশ বয়েস হবে ইস্‌মাইলের। একটু কুঁজো—একটু ঢ্যাঙা। অযত্নে এলোমেলো মাথার চুল ; মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। শার্টের আস্তিন কনুইয়ের ওপর আরো খানিকটা গোটানো—সংকল্পে মুঠো-করা হাত। চোখের দৃষ্টিতে একটা উগ্র চাঞ্চল্য—যেন যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

—গোড়াতেই আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু স্পষ্ট করে আপনাদের খুলে বলা যাক।—ইস্‌মাইল আরম্ভ করল : অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে আমাদের অনেকেই পাকিস্তান কথাটার মানে পর্যন্ত জানেন না। এমন কি আমাদের মহান্ নেতা কায়েদে আজম জিন্নার নাম পর্যন্ত শোনেন নি, এমন লোকও এ সভায় আছেন। সুতরাং—

সুতরাং জ্বলন্ত ভাষায় পাকিস্তানের কথা বলতে আরম্ভ করল

ইস্‌মাইল। আরম্ভ করল আরবের মরুভূমি থেকে কোরাণ আর জুল্‌ফিকারের দুর্নিবার অগ্রগমনের ইতিহাস; আগুন-ঝরা ভাষায় বলে গেল, কেমন করে কাফেরদের রক্তে তরবারি আর বর্শা-ফলককে স্নান করিয়ে, সিন্ধু-সোমনাথ-গুর্জরজয়ের ধারা বয়ে গৌড়-বঙ্গের প্রত্যন্তে প্রত্যন্তে এল শেষ-ধর্মের প্রাণবন্যা। বর্ণনা করে গেল কেমন করে বাদশাহ আলমগীর সারা হিন্দুস্থানের কোরেশদের ভাঙা বিগ্রহের শিলা দিয়ে রচনা করলেন মস্‌জেদের সিঁড়ি; তারপরে এল ইংরেজ—এল হিন্দুর চক্রান্ত। সে চক্রান্তের আজো শেষ নেই।

এই পর্যন্ত এসে ইস্‌মাইল একবার থামল। সমস্ত সভা গাম্ভীর্যে গম্ গম্ করছে। বলবার শক্তি আছে ইস্‌মাইলের। সভা কেমন করে জমিয়ে নিতে হয় সে তা জানে।

ইস্‌মাইল মাথার ওপর হরিৎ পতাকাটার দিকে তাকিয়ে নিলে একবার। উড়ছে সূর্যের আলোয়—উড়ছে একটা সগৌরব প্রসন্নতায়। আজাদী কি ঝাণ্ডা।

—বন্ধুগণ, মন দিয়ে আমার কথাগুলো একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, উনিশশো ছয় সালে আমাদের লীগ জন্ম নেবার পরে তাকেও অনেকখানি পথ কেটে এগোতে হয়েছে। আমরাও একদিন হিন্দু কংগ্রেসের হাত মিলিয়েছিলাম। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে এক সঙ্গে আজাদীর লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা, লড়েছি খেলাফতের দিনে। সেদিন আমাদের জিন্না সাহেবও নিজেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বলতেন। তারপর স্বাধীনতার লড়াইয়ে একধাপ এগিয়ে গিয়ে যেদিন আমরা পুরো স্বাধীনতা চাইলাম—সেদিন—সেই ১৯২২ সালে হিন্দু কংগ্রেসই "স্বরাজের" ভাঁওতা তুলে লড়াই থামিয়ে দিলে। শুধু লড়াই থামাল না—এল হিন্দু মহাসভা। দেখা গেল কংগ্রেসের পথ

হিন্দুর পথ—আর মুসলমানের যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলে তা এই মুস্‌লিম লীগ—

একটা তিক্ত হাসি ইস্‌মাইলের ঠোঁটের আগায় দেখা দিলে: কিন্তু দেশের মুসলমান তখনো জাগেনি। ১৯৩৭ সালে যেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম বোঝাপড়া, সেদিন আমাদের ভাইয়েরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছিল। নিজেদের দলাদলিতে আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু হারতে পারেনা আমাদের লীগ—আলী ভাইদের আদর্শ—মুসলমানের সত্য। এগিয়ে এলেন কায়েদে আজম জিন্না তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে। গড়ে তুললেন সারা ভারতের মুসলমানকে। আমরা বুঝলাম—হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি থাকা আমাদের চলবে না। নতুন দেশ চাই, নতুন রাস্তা চাই—নতুন পথ চাই ইস্‌লামী তমদ্দুন বিকাশের জন্যে। সেই আমাদের 'পাকিস্তান'। সেই পাকিস্তানের জন্যেই আপনাদের এক হতে বলছি! আসুন—দলে দলে লীগের মেম্বার হোন—সকলে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন: পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!—সভার মধ্যে গর্জন করল ঝোড়ো হাওয়া। রুমালে ঘর্মাক্ত মুখখানা মুছে নিয়ে বসতে বসতে ইস্‌মাইল বললে, এবার মস্‌জিদের ইমাম সাহেব আপনাদের দুচার কথা বলবেন।

সভায় আবার প্রচণ্ড করতালি পড়ল।

ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে উঠলেন ধীর গম্ভীর ভঙ্গীতে। চুম্‌রে নিলেন ধূসর রঙ-ধরা শাদা দাড়ির গোছা। তারপর উচ্চকণ্ঠে কোরাণের একটা 'সুরা' আউড়ে বললেন, এর অর্থ হল, বিধর্মী কাফেরের সঙ্গে পাশাপাশি কখনো মুসলমানের বাস করা চলবে না, তাকে লড়াইয়ের জন্যে সব সময় তৈরী থাকতে হবে—দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে—

উত্তেজনার যে বারুদ ইতিমধ্যেই সঞ্চিত করে রেখেছিল ইস্‌মাইল, তাতে আগুনের উত্তাপ সঞ্চার করে আসন নিলেন ইমাম সাহেব।

সভায় তখন মধুচক্রের মতো গুঞ্জন উঠেছে। ইস্‌মাইলের শহুরে বক্তৃতা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ইমাম সাহেবের কথাগুলো নির্মম এবং তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো আড়াল নেই—নেই বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার আভাস।

—হাঁ, পাকিস্তান নিবা হেবে হামাদের।

—কাফেরের সাথ্‌ হাম্‌রা আর নি থাকিমু।

—পাকিস্তান জান মান দিই কায়েম করিবা হেবে।

—মোক্‌ খালি একটা কথা কহেন। পাকিস্তান হই যায় তো খুব ভালই। ফের প্যাট ভরি খাবা পামু তো হামরা? সার্টিফিকেট, উচ্ছেদ তো উঠি যাবে? শাহু তো ব্যাগার ধরিবে না? বকেয়া খাজনা তো মাফ করি দিবে?

কথাগুলোর কোনো স্পষ্ট জবাব কেউ দেবার আগেই আবার সাড়া উঠল: এই চুপ, চুপ! মাস্টার সাহেব কহোছেন।

এবার প্রচণ্ডতম করতালি। সব চাইতে জনপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমুদ্দিন মাস্টার এইবার দাঁড়িয়েছেন তাঁর বক্তব্য বলবার জন্যে। সকলের দুঃখে কষ্টে অকৃত্রিম বন্ধু। প্রয়োজনের বান্ধব। দুর্দিনের একনিষ্ঠ আশ্বাস।

ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছে, সবুজ পতাকায়—যেন একটা অপূর্ব দীপ্তি ছড়াচ্ছে তার থেকে। 'নূর—এ—পাকিস্তান'! সে দীপ্তি পড়ছে আলিমুদ্দিনেরও প্রশস্ত মুখে। কঠিন ভাস্কর্যে গড়া একটা তাম্র-পিত্তল মূর্তির মতো তাঁর দেহের রেখাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে উঠেছে। দাক্ষিণাত্যের কোনো মন্দিরের ছায়া-ঘন গর্ভ-গৃহে দীপ-দীপিত দেবমুখের মতোই দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানা।

তারপর কয়েকবার নিঃশব্দে নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট দুটি। বলবার আগে কিছু একটা যেন আউড়ে নিলেন নিজের ভেতর। একবার তাকালেন মাথার ওপরকার পতাকার দিকে, পতাকা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে। ওই সবুজ পতাকার ওপর যে কিরণ-লেখা বিম্বিত হয়ে পড়েছে তাকি পাকিস্তানের পূর্বাভাস, না, কোনো আগামী শূন্যতার প্রতিভাস?

তারও পরে জনতার মধ্যে নামল তাঁর দৃষ্টি। একদল মানুষ। তাঁর কাছ থেকে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে। কিন্তু একদল মানুষ? না—এক হয়ে গেছে। একটা শক্তি—একটা বিশ্বজয়ী শক্তি; যা অপ্রতিহত প্রভাবে এগিয়ে গিয়েছিল মক্কা থেকে মরোক্কো, মরোক্কো থেকে মস্কোভী। সহস্র ছাড়িয়ে লক্ষ—লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি। শিখায়িত রক্তধারায়, বজ্রবাহী পেশীতে পেশীতে। The great human dynamo!

কিন্তু!

কোন্ লক্ষ্যে? সব সত্য কি বলতে পেরেছে ইস্‌মাইল? তথ্য দিয়েছে, আবেগ দিয়েছে তার চাইতেও বেশি। কিন্তু তারপর? কোন্ পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই শক্তির বন্যাকে—এই চল-বিদ্যুতের ধারাকে? কারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই বিপুল human dynamoকে?

একবার নিজেরই আশেপাশে তাকালেন আলিমুদ্দিন। একটা উগ্র চঞ্চলতা ইস্‌মাইলের চোখে মুখে—কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই যেন। জ্বলতে চায়—জ্বালাতে চায়। ফতেশা পাঠান? চমৎকার সেজেগুজে এসেছেন, গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে—নির্বোধ আনন্দে ঘন ঘন পাক দিচ্ছেন কাঁকড়া বিছের লেজের মতো গোঁফজোড়ায়। জমাদার বদরুদ্দিন সাহেব অল্প অল্প হাসছেন, নিচু গলায় কথা কইছেন পাশের

একজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে : হিন্দু ইন্‌সপেক্টারটা থাকাতেই ডিগ্রেড্ হয়ে গেলাম, বুঝলেন ! যদি কোনো মুসলমান থাকত—

ঘুষের দায়ে লোকটা ডিগ্রেডেড্ হয়েছিল—দোষ দিচ্ছে হিন্দু কর্মচারীর। এরা—এই এরা হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার ! আলিমুদ্দিনের রক্ত তেতে উঠল, জ্বালা ধরল মাথার ভেতর। শাহ্—খোদাবক্স খন্দকার—

ইস্‌মাইল অধৈর্যভাবে তাঁকে স্পর্শ করল।

—বলুন, বলুন মাস্টার সাহেব। প্রায় তিন মিনিট ধরে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন !

হাঁ—বলতে উঠে বড় বেশিক্ষণ ধরে ভাবছেন তিনি। চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন। নড়ে উঠলেন তড়িৎ-তরঙ্গের স্পর্শে উচ্চকিত একটা শবদেহের মতো। তারপর :

ভাই সব, আমার বন্ধু ইস্‌মাইল সাহেব আপনাদের সব মোটামুটি খুলে বলেছেন। কাজেই আমার আর নতুন কিছু বলবার নেই। আশা করি, পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের সার্থকতা সম্বন্ধে আপনাদের কোনো সন্দেহ নেই, সে কথাও আমাকে নতুন করে বোঝাতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্ন আমার আছে। আমরা, যারা আজ এমন করে পাকিস্তানের কথা আপনাদের বলতে এসেছি—বুকে হাত দিয়ে আমাদের বলতে হবে—সে ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের আছে তো ?

জনতা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ঠিক ধরতে পারছে না। আর চেয়ারে বেঞ্চিতে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন—কোন্ পথে—কোন্ দিকে এগোতে চাইছেন মাস্টার ?

আলিমুদ্দিন বললেন, আমি জানতে চাই—কার জন্যে পাকিস্তান ?

অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠল ইস্‌মাইল : কেন, মুসলমানের ?

—বেশ কথা। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৯০৬ সালে লীগের জন্মদিনে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল ইংরেজ। সেদিন সে আশা করেছিল, এই লীগের আশ্রয় নিয়েই দেশের আজাদীর লড়াইকে সে ডুবিয়ে দেবে। কারণ সারা দেশে সেদিন আগুন জ্বলছিল।

ইস্‌মাইল আর বসতে পারল না, ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

—মাস্টার সাহেব, এতদিন পরে কেন তুলছেন ওসব পুরোনো কথা? ১৯০৬ সালে যা হয়েছিল, তারপরে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ তো মুসলমান সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছে।

আলিমুদ্দিন বললেন, মানি, সব মানি। কিন্তু একটা কথা আমার বলবার আছে। লর্ড মিণ্টোর আমলে যে স্বার্থপরের দল নিজেদের পেট-মোটা করবার জন্যে লীগের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, তারা কি আজো আমাদের মধ্যে নেই?

ইস্‌মাইল তিক্তস্বরে বললে, নেই।

—আমি আপনাকে জবাব দিতে বলছিনা ইস্‌মাইল সাহেব, আপনি বসুন।—তীব্র চোখে আলিমুদ্দিন ইস্‌মাইলের দিকে তাকালেন।

মুঠো-করা হাতটাকে আরো শক্ত মুঠোয় ধরে ইস্‌মাইল বললে, আপনি অনাবশ্যক কথা বলছেন মাস্টার সাহেব, আপনারই বসে পড়া উচিত।

সভায় একটা কলরব উঠল।

আলিমুদ্দিন সোজা শাহুর দিকে তাকালেন: প্রেসিডেণ্ট সাহেব, আমি কি বসে পড়ব, না আমায় বলতে দেওয়া হবে?

সামনে যারা ছিল, তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: বলুন, বলুন, বলে যান আপনি।

ফতেশা বিব্রতভাবে তাকালেন এদিকে। গোঁফে পাক না দিয়ে

টেনে টেনে লম্বা করতে লাগলেন সেটাকে। বললেন, না, না, আপনি বলুন। বোসো হে ইস্‌মাইল, এখন ওঁকে বাধা দিয়োনা।

অসন্তুষ্ট মুখে বিড় বিড় করতে করতে ইস্‌মাইল বসে পড়ল। অধৈর্যভাবে তাকালো হাতের ঘড়িটার দিকে।

শরীরটাকে আরো ঋজু করে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন। মাথার ওপর রাঙা আলোয় পতাকা ঝলমল করছে—মহিমাময় হয়ে উঠছে 'নূর-এ-পাকিস্তান!' এই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা যাবে না, কোনো কপটতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সত্য চাই, আত্মদর্শন চাই। এখন থেকেই পরিষ্কার করে নিতে হবে সব হিসেব-নিকেশ। জেনে নিতে হবে কে দোস্ত, কে দুশমন। কে চলেছে সম্মুখের পথ কেটে, কারা পায়ের তলায় গড়ে তুলছে নিঃশব্দ চোরাবালি।

সেই 'নূরী ঝাণ্ডা'র নিচে তাঁকে মনে হতে লাগল তাম্র-পিত্তলের নির্ভুল, স্পষ্টরেখ দীপ্ত মূর্তি। তাকে বলতে হবে স্পষ্ট ভাষায়—সত্য ঘোষণাই তাঁকে করতে হবে।

আলিমুদ্দিন বললেন, আরো সোজা কথায় আমি আসব। ধরুন, এই সভাতেই এমন লোক উপস্থিত আছেন, যাঁদের মতো মুসলমানের শত্রু আর কেউ নেই। তাঁদের আগে আমাদের চেনা দরকার।

—কারা তাঁরা?

চেষ্টা করেও একটা কটু প্রশ্ন এড়াতে পারলনা ইস্‌মাইল।

—কারা তারা?—মূর্তির চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল—দক্ষিণী মন্দিরের নটরাজের হীরক-নেত্রের মতো। যেন দেখা দিল, অগ্নি-বর্ষণের পূর্ব-সংকেত।

আলিমুদ্দিন বললেন, যদি বলি, আমাদের এই ইমাম সাহেব—যিনি একজন হাজী এবং বিখ্যাত আলেম, তিনি আমাদেরই সমাজের অংশ—

আমাদের ভাই ধাওয়াদের মস্‌জিদে ঢুকতে দেন না? তা হলে কি বলতে হবে তিনি ইস্‌লামের খাদেম?

—মাস্টার সাহেব!—যেন আর্তনাদ করে উঠলেন শাহু।

—হাঁ, আপনার কথাও আমি বলব।—আলিমুদ্দিনের চোখ দিয়ে এবার সত্যিই আগুন ঝরতে লাগল: প্রজাদের আপনি বেগার খাটান। গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে খান। অনবরত অত্যাচার করে দেশের লোককে আপনি শেষ-দশায় এনে ফেলেছেন। যে মেয়ে আপনাকে ধর্মবাপ বলে—বিহ্বল স্তব্ধ সভাটার ওপর রক্তচক্ষু মেলে আলিমুদ্দিন বললেন, আপনি তার সর্বাঙ্গে পারার ঘা ছড়িয়ে দিয়ে ইমানকে কোতল করেন। বলুন—আপনারাই কি নেতা? আপনাদের হাতেই কি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ?

—চুপ করুন—বসে পড়ুন—পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ইস্‌মাইল।

—লোকটা ক্ষেপে গেছে—চিৎকার করলেন ইমাম সাহেব।

ফতেশার মুখ দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরুল। এত জোরে সরু গোঁফটাকে আকর্ষণ করলেন যে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করল সেটা।

—না, আমি বসবনা, আমি বলবই—আলিমুদ্দিনও চিৎকার করলেন এইবারে।

সভায় বিশৃঙ্খলার ঝড় বইছে। নানা কণ্ঠে নানা রকম কোলাহল উঠছে। যেন ক্ষেপে গেল ইস্‌মাইল, জামাটা ধরে সজোরে টান দিলে আলিমুদ্দিনের।

আলিমুদ্দিন তিন পা পেছনে হটে এলেন।

—আমি বলবই—আমি বলবই—

—না—না—

—বেশ!—স্বরগ্রামকে সমুচ্চতর পর্দায় তুলে শেষবার বললেন

আলিমুদ্দিন: তা হলে আমিও জানিয়ে যাচ্ছি, পাকিস্তানের লড়াইয়ে আজ থেকে দুশ্‌মন মুসলমানও আমার শত্রু। তাদের বিরুদ্ধেও আজ থেকে আমার লড়াই—

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সভা থেকে একটা জ্বলন্ত হাউইয়ের মতো ছুটে চলে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

* * * * *

বাতাস নেই। একটা গমগমে গুমোট সন্ধ্যা ঘনিয়েছে ঘরের মধ্যে। দিগ্‌বিস্তৃত বরেন্দ্রভূমির মাঠের ওপরে হাওয়া যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা দামাল্ ছেলের মতো খেলে বেড়ায়, নিয়ে যায় মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ; গোখরা সাপের নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেয়াফুলের সৌরভ বয়ে নিয়ে যায়; বয়ে বেড়ায় তালগাছের মর্মর থেকে শুরু করে শঙ্খচিল আর গিন্নী শকুনের কান্না,—সেখানে হঠাৎ সব থমকে দাঁড়িয়েছে যেন কোন্ অদ্ভুত ভানুমতীর মন্ত্রোচ্চারণে। যেন আকাশ থেকে ঘনাচ্ছে কোনো দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অশরীরী অপচ্ছায়া—আসন্ন মৃত্যু, আসন্ন ঝড়, আসন্ন দুর্বিপাক। আলেয়া-জ্বলা বরিন্দের মাঠে ঘর-পালানো রাত-চরা গোরুর দল এখন আচমকা ভয় পেয়ে বসে পড়েছে কোনো ঝুরি-নামা ডাইনি বটের অন্ধকার ছায়ায়—তাদের সবুজ পিঙ্গল চোখে কিসের আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা।

শাহুর বৈঠকখানা ঘরেও সেই স্তব্ধতা, সেই গুমোট।

ফরাসের সামনে দুটো জোরালো লণ্ঠন। ঘরটা অতিরিক্ত আলো হয়ে আছে। সেই আলোর সঙ্গে কুয়াশার মতো জমছে ঘন-গন্ধী তামাকের ধোঁয়া। রাশীকৃত স্তব্ধতার মধ্যে শুধু অনুরণিত হচ্ছে মশার শ্রান্তিহীন গুঞ্জন।

মুখোমুখি দুজন। শাহু আর ইস্‌মাইল।

ইস্‌মাইল তিক্তভাবে হাসল। তির্যক চোখে তাকালো শাহুর দিকে।

—আপনি তো লোকটার প্রশংসা করেছিলেন খুব।

—হুঁ, তা করেছিলাম।—অনুতাপবিদ্ধ শোনালো শাহুর গলা: তখন কি জানতাম, একেবারে পাগল? কোনো বুদ্ধিশুদ্ধিই নেই?

—পাগল?—ইস্‌মাইল আবার বাঁকা চোখে শাহুর দিকে তাকালো: না, পাগল নয়। কিন্তু বিপজ্জনক।

—তাই দেখছি।

—যা বলবার ছিল—ইস্‌মাইলের মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল: সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তারও তো একটা জায়গা আছে! সভাটাই পণ্ড করে দিলে!

ফতেশা উত্তর দিলেন না। সজোরে একবার গোঁফটাকে আকর্ষণ করলেন, তারপর মনের অসহ্য জ্বালাটা দূর করবার জন্যে চটাস্ চটাস্ শব্দে গোটা কয়েক মশা মারবার চেষ্টা করলেন।

ইস্‌মাইল বললে, আমার সন্দেহ হয়—লোকটা প্রজা ক্ষ্যাপাবে।

—কি রকম?—তড়িৎগতিতে উঠে বসলেন ফতেশা।

—আজকাল ওইসব রেওয়াজ হচ্ছে। আমাদের আন্দোলনকে নষ্ট করবার জন্যে সোস্যালিজমের একটা ধুয়ো তুলেছে হিন্দুরা। আমার মনে হয়, ওদেরই কারো সঙ্গে যোগ-সাজস আছে মাস্টারের। মুখে এরা লীগের বন্ধু, ভেতরে ভেতরে পাকা ন্যাশনালিস্ট্। তা ছাড়া—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ইস্‌মাইল বললে, উনি তো কংগ্রেসের হয়ে বার কয়েক জেল-টেলও খেটেছেন, তাই না?

—ঠিক ঠিক।—ফতেশা যেন অকূল অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন: তাই তো। সে কথাতো খেয়াল ছিল না।

ইস্‌মাইল মৃদু হাসল: এসব লোক আমি অনেক দেখেছি, এদের

আমি চিনি। যাক্—সেজন্যে আটকাবে না। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

অসহ্য ক্রোধে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন শাহু: আমার খেয়ে আমারই বদনাম গাইবে? ইস্কুল থেকে ওই মাস্টারকে আমি তাড়াব। সাহস কত! খোদাবক্সের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিল!

ইস্‌মাইল বললে, সব দুরস্ত হয়ে যাবে। ভালো কথা, বিদ্রোহী প্রজা আছে আপনার?

—অভাব কী। টিলার সাঁওতালরাই তো—

—সাঁওতাল!—ইস্‌মাইল আঁত্‌কে উঠল: সাংঘাতিক জীব। সাপ পুষে রেখেছেন চাচা! ওই সবই হল এসব লোকের বিষ-দাঁত। দাঁতটা উপড়ে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—কী করে?—শাহু সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

—পলিটিক্‌স। আগে এককাট্টা হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে। সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। হাঁ—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে চাচা। টিলায় একটা মসজিদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—টিলায় মসজিদ!—শাহু হাঁ করে রইলেন: কেন?

—সব জিনিস বড় দেরীতে বোঝেন আপনি—ইস্‌মাইল আবার মৃদুমন্দ হাসল।

স্তব্ধ গুমোট হাওয়ায়, ঘনীভূত তামাকের ধোঁয়ায় খানিকক্ষণ ইস্‌মাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝতে চাইলেন শাহু। তারপর কোনো কিছু বুঝতে না পেরে অসহায় ক্রোধে চটাস চটাস করে আবার মশা মারলেন গোটা কয়েক।

পনেরো

সভাটা বসল কিষাণ সমিতির সামনে।

এত লোক হবে আশা করা যায়নি—নগেন ডাক্তারের যোগ্যতা আছে দেখা যাচ্ছে। কখনো সাইকেলে চড়ে আবার কখনো বা সাইকেলটাকে কাঁধে চাপিয়ে চষে বেড়িয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। পালগ্রামের সাঁওতালেরা এসেছে, এসেছে কালো-পুখরীর ওঁরাওঁয়ের দল, আর এসেছে সাধারণ কৃষক। তাদের ভেতরে বড় কৃষাণ আছে, আছে বর্গাদার। শুধু পেট-মোটা জোতদারেরা আসেনি—খবর দিলেও তারা আসত না।

নগেনই প্রস্তাব করল।

—আজকের এই সভায় সভাপতি হবেন কালা-পুখরীর সনাতন মণ্ডল। আপনাদের পরিচিত সোনাই সর্দার।

সনাতন হকচকিয়ে গেল। দু হাত জোড় করে বললে, ডাক্তার ভাই, আমি—

রঞ্জন বললে—আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

আশ্রয়ের আশায় দু চারবার এদিক ওদিক তাকালো সনাতন: কিন্তু আমি—

আর কিছু তাকে বলতে দেওয়া হল না। তাকে হাত ধরে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলে নগেন। আনন্দিত করতালির ধ্বনি উঠল চারদিকে।

—কিষাণ সমিতি কি জয়—

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

এক হাজার মানুষের গলা থেকে প্রতিশ্রুতি ছড়ালো আকাশে। এক হাজার মানুষ। এক হাজার চওড়া বুক—দু হাজার লোহায় গড়া পেশী। দু হাজার চোখে উজ্জ্বলন্ত প্রাণের অগ্নি।

নগেন বললে, ভাই সব, অনেক দূর দূর থেকে আপনারা সবাই এসেছেন। তাই আপনাদের সকলকে একটু তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিতে হবে—নইলে রাত হয়ে যাবে ফিরতে। দিন কাল খারাপ, মাঠে আজকাল খুব সাপের উৎপাত হচ্ছে। সেই জন্যে আমরা এখনি সভার কাজ আরম্ভ করব। আর আজকের সভার উদ্দেশ্য আপনাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন আমাদের রঞ্জনদা।

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কেমন বিব্রত লাগছে। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস তার আছে, জেল থেকে বেরুবার পর কিছুদিন তাকে এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেও হয়েছে। কিন্তু সে বক্তৃতা পোষাকী, তার রূপ সাজানো-গোছানো, আলংকারিক। সেখানে যুক্তির সঙ্গে ইমোশনের মিশ্রণ, তত্ত্বের সঙ্গে তির্যক ব্যঙ্গের বিন্যাস, ভাষার অলঙ্করণে ধ্বনির কুহক-বিস্তার। কিন্তু এতো তা নয়। হাজার মানুষের চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট উত্তর চায় এরা—চায় জীবন-মরণ সমস্যার অকুণ্ঠ সমালোচনা। এখানে রাজনীতির ব্যসন নয়, কথার কারু-শিল্প নয়—যুগরুদ্রের ছিন্ন জটা থেকে ক্রোধরূপী পুরুষের আগ্নেয় আবির্ভাব ঘটেছে এদের মধ্যে : হয় পথ দেখাও, নইলে পথ থেকে সরে যাও। হয় আগে কদম ফেলো, নইলে চিরদিনের মতো বরবাদ হয়ে যাও ভীরুর দল!

অনধিকারী। অনধিকারী বই কি। এদের মন আমাদের নয়—সে মন আয়ত্ত করে নিতে হচ্ছে। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? কত সংস্কার। মানসিক আভিজাত্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহমিকা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত-প্রাকারের মতো। শ্রেণীচ্যুতি! এক নিঃশ্বাসে বলবার মতো সহজ কথা, কিন্তু প্রয়োগ-ক্ষেত্রে? বংশক্রমের অলক্ষ্য শৃঙ্খল চিন্তাকে সরীসৃপ গ্রন্থিলতায় জড়িয়ে রাখে,শূন্যনির্ভর সংস্কৃতির অহঙ্কার দ্বিধার পরে দ্বিধা আনে। তবু—

তবু চেষ্টা করতেই হবে। যতটা পারি—যতখানি সম্ভব। চেষ্টায় ফাঁক না থাকে, ফাঁকি না থাকে আন্তরিকতায়। আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে আমাদের স্বপক্ষে এই তো দলিল।

রঞ্জন বললে, আপনারা সবাই জানেন, নদীর বন্যায় কালা-পুখরি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি প্রতি বছর কী ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্যে নষ্ট হয় হাজার লোকের মুখের গ্রাস। তাই এবার বর্ষা নামবার আগেই বাঁধ দেওয়া হবে কালা-পুখরির ডাঁড়ায়। কিন্তু তাতে জমিদারের বাধা। এই বাধা সয়ে এমন করে কিছুতেই আপনারা মরতে পারেন না। এবার রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের—সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে! হয়তো জমিদারের লাঠিয়াল আসবে—পুলিশও আসতে পারে। কিন্তু সেই জন্যে আপনারা পিছিয়ে যাবেন কিনা সে বিচারের ভার আপনাদেরই ওপর।

—জান কবুল—উগ্র চীৎকার উঠল একটা।

—হামার অ্যাকটা কথা বলিবার আছে—একজন দাঁড়িয়ে উঠল।

—বসি যাও হে বসি যাও। তুমি আবার খামাখা ঝামেলা লাগাইলে ক্যানে হে?

কয়েকজন তাড়া দিলে।

সভাটার ওপরে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে রঞ্জন।

—না, না, চুপ করুন আপনারা। সকলের কথাই শুনতে হবে আপনাদের। বলুন, কী বলবেন আপনি।

যে দাঁড়িয়েছিল, সে একজন মাঝ-বয়সী কৃষাণ। এক সময়ে অতিকায় একটা কাঠামো ছিল, হয় তো অমানুষিক শক্তিও ছিল গায়ে। কিন্তু অর্ধাহারে আর ঋণের বোঝায় পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, চাপা চওড়া কপালের তলায় চোখ দুটো গভীর গর্তের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে।

একটা শঙ্কিত অনিশ্চয় দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললে, হামি কহিতেছিনু কালা-পুখরিতে ঝামেলা হছে তো হছে। সেইটাকে লিয়া ওইখানকার মানসিলাই (মানুষগুলোই) লড়িবে। হামরা ক্যানে ঝুটমুট ওইঠে যাই ফ্যাচাঙে পড়িমু?

—ইটা একদম বাজে কথা হছে—একজন প্রতিবাদ করল তীব্র গলায়।

—না, বাজে কথা নয়—রঞ্জন আবার হাত বাড়িয়ে দিলে সভার দিকে: এরকম কথা আপনাদের সকলেরই মনে উঠতে পারে, আর তা ওঠাও উচিত। সত্যিই তো, অন্যের জন্যে কেন আপনারা লড়তে যাবেন, কেন আপনারা পড়তে যাবেন জমিদারের কোপে? বিশেষ করে যে কালা পুখরিতে আপনাদের কোনো স্বার্থই নেই? ঠিক কথা। সোজা সুজি ভাবতে গেলে এমনি মনে হওয়া উচিত। কিন্তু ভাই সব, আজ দিন বদলে গেছে। আজ দুনিয়ার সব দুঃখী মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার জন্যে। যতদিন আপনারা ফারাক্ হয়ে ছিলেন, ততদিন আপনাদের ক্ষেতের ফসল লুটে নিয়েছে জমিদার, ঘর-বাড়ি গোরু-হাল নীলামে তুলেছে মহাজন। আজ যে যেখানে আছেন যদি এককাট্টা হয়ে দাঁড়ান তা হলে দেখবেন দুদিনেই সব জুলুমবাজী বন্ধ হয়ে গেছে। রামের স্বার্থ রাখবার জন্যে যদি রহিম দাঁড়ায়, আলিকে বাঁচাবার জন্যে যদি যদু ছুটে যায়—তা হলে সবাই বুঝতে পারবে তামাম মুলুকের ভুখা মানুষেরা আজ একদলে। কেউ আর তাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। আজ আপনারা যদি কালা-পুখরিতে বাঁধ দেবার জন্যে এগিয়ে যান, তা হলে কাল জয়গড়ে আপনাদের ফসল বাঁচাবার জন্যে কালা-পুখরির মানুষগুলোই ছুটে আসবে এ কথা কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না?

—আলবৎ ! বুঝি হামরা।

—কালা পুখরির মান্‌সিলার সাথ হামরা একদল।

—এককাট্টা হই হামাদের বাঁধ গড়িবা হেবে !

—কিষাণ সমিতি জিন্দাবাদ !

রঞ্জন সভার দিকে তাকালো। হাজার মানুষ নয়—ক্রোধ-সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আসছে। ভেঙে দেবে—গুঁড়িয়ে দেবে, ধ্বসিয়ে দেবে বালির বনিয়াদে গড়া শিস্‌-মহলের স্বপ্নকে। সেই তরঙ্গের মুখে সে নিজেও টিঁকে থাকতে পারবে তো ? দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তো তার মানসিক পারিপাট্যের খুঁটিতে ? এই ঢেউয়ের মুখে সেও কি এগিয়ে যেতে পারবে, না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রোধ-বন্যার এই বিপুল উৎক্ষেপে ?

সংশয়-শঙ্কিত মন যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, আচমকা থমকে দাঁড়ালো হৃৎস্পন্দন। রক্ত-নাড়ীতে গুর গুর করে ঝোড়ো মেঘের ডাক। তারপর—তারপর ?

নগেন বললে, এতেই হবে রঞ্জনদা। এবার তুমি বোসো, বাকীটা আমি শেষ করে দিই।

* * * *

জয়গড়ে নগেন ডাক্তারের ঘরে বসেছিল তিনজন।

বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে—শুক্লা রাত। মহুয়া বনের পাতায় পাতায় রূপালি জরির মতো ঝকমক্‌ করছে জ্যোৎস্না। টাঙন নদীর জলটা শাদা হয়ে আছে একরাশ দুধের মতো। একটা মোড়ার ওপর বসে সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ছিল উত্তমা। রঞ্জনের বেশ লাগছিল শ্যামাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির এই তন্ময়তাটুকু। মাটি কোপায়, পোস্টার লেখে, মেয়েদের জড়ো করে আনে, পুরুষের মতো উঁচু গলায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। মন্দাক্রান্তা ছন্দ নয়, ভুজঙ্গ-প্রয়াতের ললিত বিস্তার নয়—

অনুষ্টুপের মতো কঠিন ঋজুতা। তবু ছন্দ ছন্দই। তারও বেশ আছে, তারও ব্যঞ্জনা আছে, তারও কথায় কথায় হরিণীপ্লুতার ঝঙ্কার বেজে ওঠে। এই মুহূর্তে আত্মমগ্ন উত্তমাকে দেখে এই কথাই রঞ্জনের মনে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল, ঝল্‌কে উঠছিল বাইরের ঝলক-লাগা মহুয়া পাতার মতো।

কিন্তু গদ্যময় নগেন এক টিপ নস্য টানল।

—মিটিংটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে রঞ্জনদা।

—চমৎকার। এত ভালো হবে আশা করিনি।

—তোমার কী মনে হয়? ওই বাঁধটাকে নিয়েই একটা জোরদার লড়াই আমরা গড়ে তুলতে পারব?—উৎসুক জিজ্ঞাসুভাবে নগেন রঞ্জনের দিকে তাকালো, চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

আবার এক টিপ নস্য নিয়ে বেশ শব্দ করে টানল নগেন।

—জানো রঞ্জনদা, এই আমাদের প্রথম শক্তি-পরীক্ষা। এতদিন ধরে যে সব কথা আমরা ওদের বুঝিয়েছি, যে ভাবে ওদের চালাতে চেয়েছি, তা কতটা সফল হবে, এরই ওপরে তার যাচাই। যদি লড়াই জিততে পারি—জেনে রেখো এ তল্লাটে কাউকে আর দাঁত ফোটাতে হবে না। আর যদি হারি, তাতেও দমবার কিছু নেই। এক পা পিছু হটে গেলে পালটা দশ পা এগিয়ে যাবার জোর আমরা পাবই। কী বলিস্ উত্তমা?

ঘোর-লাগা চোখ মেলে উত্তমা একবার ফিরে তাকালো। কথা বললে না, শুধু মাথা নেড়ে নিজের সমর্থনটা জানিয়ে দিলে। তার মন এখানে নয়—আরো কিছু সে ভাবছে, আবিষ্ট হয়ে গেছে মহুয়া বন আর টাঙন নদীর দিকে তাকিয়ে। অনুষ্টুপের দ্রুত-দীপ্তির ওপর মন্দাক্রান্তার মেঘ নেমেছে কোথাও।

রঞ্জন বললে, কিন্তু একটা খবর শুনেছ তো? পালনগরের শাহু কিন্তু মুস্‌লিম-লীগ গড়বার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। মুসলমানদের সরিয়ে নেবেন তোমাদের আন্দোলন থেকে।

—মুসলিম-লীগ গড়তে চান গড়ুন। মুসলমানের স্বার্থের কথাও তিনি ভাবুন। কিন্তু সকলের স্বার্থ নিয়েই যেখানে লড়াই, সেখানে কতদিন তিনি মুসলমানকে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারবেন? সাচ্চা ইমান যার আছে, আজ হোক কাল হোক ছুটে সে আসবেই। তার প্রমাণ আলিমুদ্দিন মাস্টার। সেদিন সভায় কী কাণ্ড হয়ে গেছে শোনোনি বুঝি?

—শুনেছি। আলিমুদ্দিন খাটি লোক—সত্যিকারের আজাদ পাকিস্তানের কথাই তিনি ভেবেছেন। তাই সেদিনের সভায় তিনি শাহুর দলকে বেশ মিঠেকড়া শুনিয়েছেন। তা নিয়ে খুব গণ্ডগোলও চলছে। কিন্তু সেজন্যে তুমি একথা মনেও কোরোনা যে তিনি তোমারই দলে এগিয়ে আসবেন। তিনি সোস্যালিজমে বিশ্বাস করবেন—এ আমার কখনো আশা হয় না।

—কী করে জানলে?—তর্ক করার উৎসাহে নগেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন, তাদের মঙ্গল যিনি করতে চান, তিনি একদিন না একদিন আমাদের সঙ্গে একলক্ষ্যে এসে মিলবেনই। হয়তো সেদিন আমাদের সকলের আগেই তাঁকে আমরা দেখতে পাবো।

—বেশ তো, আশা করতে থাকো—রঞ্জন টিপ্পনি কাটল।

নগেন উত্তেজনার সঙ্গে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ভারী গলায় ডাক এল: উত্তমা!—উত্তমা আর নগেন একই সঙ্গে চমকে উঠল। মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল উত্তমা।

—নগেন নেই বাড়িতে?—আবার ডাক শোনা গেল।

—আমার সেই জ্যাঠামশাই—সেই জোতদার।—ফিস্ ফিস্ করে বলেই নগেন সাড়া দিলে: আছি জ্যাঠামশাই, আসুন এ ঘরে।

একটা চটির শব্দ উঠে আসতে লাগল ঘরের দিকে। নগেন আবার চাপা গলায় বললে, সাংঘাতিক লোক। বুঝে-সুঝে কথা কোয়ো রঞ্জনদা।

রঞ্জন হাসল—জবাব দিলে না। বুঝে-সুঝে কথা! আর যাই হোক, ও জিনিসটার জন্যে তার ভাবনা নেই। দিনের পর দিন কুমার ভৈরবনারায়ণকে তার সঙ্গ দান করতে হয়। পড়ে শোনাতে হয় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ—বিশ্বরূপকে এনে প্রতিষ্ঠা করতে হয় কুমার বাহাদুরের নেশার রং-লাগা চোখের সামনে; মূঢ় রসিকতায় হাসবার চেষ্টা করতে হয়—হাসতেও হয় কখনো কখনো। আর কিছু না হোক, কথা বলবার আর্টটাকে অন্তত তার জানতে হয়েছে।

চটির শব্দ চৌকাঠের গোড়ায় এসে পৌছুল। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা গেল মানুষটিকে। মাথায় চকচকে টাক, গায়ে বেনিয়ান। হাতে একখানা মোটা ছড়ি। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—আচমকা দেখলে শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার মতো প্রৌঢ়ত্ব।

—আসুন জ্যাঠা, আসুন—নগেন ডাকল।

ভদ্রলোক ঘরে পা দিলেন। লণ্ঠনের আলোয় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে।

নগেন বললে, ইনি আমাদের রঞ্জনদা—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আর ইনি আমাদের জ্যাঠামশাই মৃত্যুঞ্জয় সরকার। এঁর কথা তো তোমায় আগেই বলেছি।

নমস্কার বিনিময়ের ভদ্রতাটা শেষ হল। উত্তমা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তার পরিত্যক্ত মোড়াটায় এসে আসন নিলেন মৃত্যুঞ্জয়। বেশ জাঁকিয়েই বসলেন।

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে একবার মৃত্যুঞ্জয় নগেনের দিকে তাকালেন : এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোদের একবার খবর করে যাই। তোর মা কোথায় ?

জবাব দিলে উত্তমা : হরিসভায় গেছেন—কীর্তন শুনতে।

—আজ হরিসভায় কীর্তন আছে বুঝি ? ওহো, মনে তো ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় যেন অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন : যা দিনকাল পড়েছে—কিছু কি আর খেয়াল থাকে! সংসারের চিন্তাতেই অস্থির—ধর্মকর্ম মাথায় উঠে গেছে। কী বলেন ?—শেষ কথাটা তিনি রঞ্জনের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

—তা বটে—রঞ্জন মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—আপনাকে কিন্তু আমি চিনি। হিজলবনের রাজবাড়ীতে আপনি থাকেন, না ?—মৃত্যুঞ্জয় অভিজ্ঞ দৃষ্টি ফেললেন।

মুহূর্তের জন্যে রঞ্জনের মুখে অস্বস্তির ছায়া দুলে গেল : আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই চিনেছেন।

—ও। মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে মনে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলেন কিছু একটার যোগফল : ভালো কথা নগেন, আজ বুঝি তোদের কিষাণ সমিতির একটা সভা ছিল, না ?

—আপনার অজান্তে এ অঞ্চলে কিছুই তো হওয়ার জো নেই জ্যাঠামশাই—নগেন স্মিত হাসল।

—ওহো, তাও তো বটে। বুড়ো বয়সে আজকাল সব কিছু ভুল হতে সুরু করেছে। তা কী হল সেই মিটিঙে ?

—দেশের লোকের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা—যা আমরা করে থাকি—নগেন জবাব দিলে।

—সেই কালা পুখ্‌রির ব্যাপারটাই বুঝি ?—মৃত্যুঞ্জয় আড়চোখে রঞ্জনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

হঠাৎ উত্তমা হেসে উঠল। এতক্ষণ ধরে যেন বাঁধা পড়ে ছিল একটা ঝর্ণার জল—মুক্তির চপল আনন্দে ছুটে বেরিয়ে এল হঠাৎ।

—কিছু ভেবোনা দাদা। সব খবরই রাখেন জ্যাঠামশাই—তোমার আমার চাইতে ভালোই রাখেন।

চাপ দাড়ির ভেতরে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না, চোখের দৃষ্টিতে ফুটলনা বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য। খোঁচাটা তাঁকে এতটুকু স্পর্শ করেনি—এ সবের অনেক উর্ধ্বে তাঁর আসন।

—খবর ঠিক রাখা নয়—এগুলো হাওয়াতেই ভেসে আসে কিনা।—দাড়ির নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ একটু প্রসারিত হল, খুব সম্ভব হাসলেন: তা ভালোই। ওদের দুঃখ অনেক দিনকার—মেটাতে পারো তো একটা মস্ত বড় কাজই হবে। কিন্তু নগেন, কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি।

—বলুন না।

—যা করছ ভালোই করছ। কিন্তু দেখো, হিংসার পথ কোনোদিন নিয়োনা। ওতে কখনো কল্যাণ নেই। মহাত্মার পথ নাও, অহিংসা দিয়ে সংগ্রাম করো।

নগেন একটু হাসল: আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই। 'অহিংসা পরমো ধর্ম' তা আমরা জানি। আমাদের ব্যাপারটা নিছক নিরামিষ—ওতে কোনো রক্তারক্তির গন্ধ নেই।

উত্তমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। ঘরের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার আকস্মিক হাসিটা যেন খিল খিল করে গেল একগোছা চাবুকের মতো।

—জানেন রঞ্জনদা, জ্যাঠামশাই ভারী অহিংস। উনি শুধু মাছ মাংস খাননা তাই নয়, ভুলেও কোনেদিন একটা ছারপোকা পর্যন্ত মারেন না।

আশ্চর্য সংযম মৃত্যুঞ্জয়ের। এ আঘাতও তাঁকে স্পর্শ করল না।

ধীর শান্ত গলায় বললেন, হাঁ, আমি অহিংসার সেবক। আপনারা ইয়ংম্যান রঞ্জনবাবু, এখনো রক্তের জোর আছে। কিন্তু জানবেন, আত্মার শক্তিতে যা হয়, হাজার বাহুবলেও তা হয় না। আর তার সবচেয়ে বড় নজীর গান্ধীজী। সারা দুনিয়া সে কথা স্বীকার করে।

হাতের লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় উঠে পড়লেন।

—চললেন? নগেন জানতে চাইল।

—হাঁ, উঠি। একবার হরিসভার দিকেই যাই। সারাদিন তো বিষয়ের চিন্তাতেই মন বিক্ষিপ্ত থাকে, ওখানে গিয়ে তবু একটু শান্তি পাব। চলি তা হলে রঞ্জনবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী খুশি হলাম—আবার দেখা হবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনজনেই কান পেতে শুনতে লাগল তাঁর বিলীয়মান চটির শব্দ।

—খুব অমায়িক লোক!—রঞ্জনই স্তব্ধতা ভাঙল।

—হাঁ, অত্যন্ত।—নিচের ঠোঁটটা একবার কামড়াল নগেন।

—ওঁর ওপর তোমাদের মিথ্যে সন্দেহ। অত্যন্ত নিরীহ মানুষ—গান্ধীভক্ত বিনয়ে একেবারে লুটিয়ে আছেন—রঞ্জন আবার বললে।

—সাপও মাটিতে লুটিয়েই থাকে রঞ্জনদা, কেবল ছোবল দেবার সুবিধের জন্যে। আর গান্ধীজী? তাঁর রাজনীতি না জানি মানুষটাকে তো জানি। জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন আরো ক'টি ভক্ত জুটলেই তাঁর হয়েছে!—উত্তমা আবার হাসল। কিন্তু উচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নয়। ছোরার ধারের মতো একটা প্রখর হাসি বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায় কোণায়।

ষোলো

মাথা নিচু করে জিব্রাইল এসে দাঁড়ালো সামনে।

—কিছু বলবে ?—আলিমুদ্দিন চোখ তুললেন।

বেদনা-ভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জিব্রাইল। সংকোচে আর সমবেদনায় গলা তার জড়িয়ে আসছে। এতদিন ধরে সে নিজেও জানত না এই বিদেশী বিচিত্র মানুষটাকে কখন সে এমন একান্ত করে ভালোবেসে ফেলেছে। চকিতের জন্যে জিব্রাইল অনুভব করল কোথায় নেমকহারামী হচ্ছে—ঘটছে একটা গভীর বিশ্বাসঘাতকতা। চারদিকের উদ্যত শত্রুর আঘাতের ভেতর এই অসহায় লোকটাকে এমনভাবে ফেলে যাওয়া—বেইমানি ছাড়া একে আর কী বলা চলে !

কিন্তু আর নয়। একটার পর একটা যা ঘটেছে, তার পরিণাম সহজ হবে না। ওয়াজের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে অন্ধকারে লোক লাগিয়ে যে কোনো মুহূর্তে শাহ 'ফারশার' ঘায়ে মাথা নামিয়ে দিতে পারে মাস্টারের। শয়তানের রাজত্বেই যখন বাস করতে হচ্ছে, তখন তাকে খ্যাপানো মানেই খাঁড়ার মুখে নিজের গর্দান বাড়িয়ে দেওয়া। ছা-পোষা জিব্রাইল সে ঝক্কি কাঁধে বইতে রাজী নয়। তা ছাড়া এলাহী বক্সের বিশ্রী রোগওলা মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে আসা—

মনঃস্থির করে ফেলল জিব্রাইল।

—আমাকে বিদায় দিতে হবে মাস্টার সাহেব।

মাস্টার কথা বললেন না। শুধু শান্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে জিব্রাইলের দিকে চেয়ে রইলেন।

জিব্রাইল আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল—ওই অদ্ভুত চোখের দৃষ্টির সামনে সত্যি কথা বলবার সৎসাহস মুহূর্তে মুছে গেল তার মন থেকে।

—কাল সকালে একবার দেশে যাব। বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে অনেক-দিন দেখিনি।

—যাও—আলিমুদ্দিন হাসলেন: যাওয়াই তো উচিত।

জিব্রাইল আবার মাথা নিচু করল। তার এই ছলনাটুকু যে মাস্টার ধরে ফেলেছেন—তা সে জানে। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে দুর্বল জায়গাটাকে তিনি স্পর্শ করলেন না। আরো খারাপ লাগল। এর চাইতে মাস্টার যদি সোজাসুজি তাকে জেরা করতেন, যদি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, তা হলে ভার নেমে যেত তার। লঘু হয়ে যেত অপরাধের বোঝা।

জিব্রাইলের দুচোখে জল এসে গেল।

অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্ছ্বসিত গলায় জিব্রাইল বলে ফেলল, আমাকে মাপ করুন মাস্টার সাহেব!

আলিমুদ্দিন ব্যস্ত হয়ে তার দুহাত চেপে ধরলেন।

—ছিঃ—ছিঃ—মাপ করবার কী আছে! দেশে যেতে চাইছ, যাবে বই কি জিব্রাইল। যেদিন খুশি আবার ফিরে এসো।

জিব্রাইল আর দাঁড়াতে পারল না। দ্রুত চলে গেল সামনে থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মাস্টার, আবার ঝুপ করে বসে পড়লেন কাঠের জলচৌকিটার ওপর। যাবে বই কি—যেতেই হবে ওকে। শাহুর কাছে ওর মাথা পর্যন্ত বাঁধা। কিসের জন্যে তাঁর সঙ্গে ও এমন করে ঝাঁপ দিতে যাবে তুফানের মুখে? না, জিব্রাইলের দোষ নেই।

কিন্তু: মাস্টারের ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। কেন হঠাৎ এলাহী বক্সের মেয়ে রাজিয়াকে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন? চিকিৎসা করবার জন্যে? যে বিষ-ব্যাধি আজ সমস্ত বড় বড় ডাক্তারের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স দিয়ে তার জন্যে কতখানি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব? কতটুকুই বা তিনি জানেন চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে?

না—এ তাঁর চ্যালেঞ্জ! শাহুর বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, খোদাবক্স খন্দকারের বিরুদ্ধে; ইস্‌লামের নাম নিয়ে যারা শেষ ধর্মের অমর গৌরবকে কলঙ্কিত করছে তাদের বিরুদ্ধে। বাঁচাতে তিনি পারবেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তালার কাছে এই তাঁর সাফাই থাকবে যে মিথ্যাকে তিনি সহ্য করেন নি, তাঁর কাজে কোথাও ফাঁকি দেননি তিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাস্টার উঠলেন। রুগীর অবস্থা একবার দেখা দরকার।

এলাহী সকালে একবার খবর নিয়ে গিয়েছিল, এ বেলা আর আসেনি। আনবার সময় মৃদু আপত্তি করেছিল, কিন্তু মাস্টার বুঝেছিলেন মনের দিক থেকে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে। ঘরে স্ত্রী নেই, বউ মরবার পরে বুড়ো বয়েসে আর নিকা করেনি। সংসারে বুড়ি শাশুড়ী আর এই রুগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে পরম অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল সে। দু'জনকেই এক সঙ্গে মাস্টারের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এতদিনে যেন আশ্বস্ত হয়েছে।

মশার গুঞ্জনে ভরা অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে সন্ধ্যা নেমেছে। একটা গুমোট গরম। ঝড় বৃষ্টি আসন্ন হচ্ছে। বিলের পাশে নিস্পন্দ তাল গাছগুলো থমথম করছে যেন। কবরের মতো কেমন দম চাপা অন্ধকার—ভালো করে নিঃশ্বাস পর্যন্ত টানতে পারা যায় না।

আলিমুদ্দিন রাজিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এলাহীর শাশুড়ী তক্তোপোষের কোণায় মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। ময়লা লণ্ঠনের আলোয় নিঝুম মেরে পড়ে আছে ঘরটা, একটা উত্তপ্ত গন্ধ উঠছে চারদিকের মেটে দেওয়াল থেকে। মশার গুন্‌গুনানির সঙ্গে কোথাও বাঁশের ভেতর থেকে উঠছে কাঁচপোকার ঘুর ঘুর শব্দ। আর অসহ্য যন্ত্রণায় অল্প অল্প গোঙাচ্ছে রাজিয়া।

এর আগে ভালো করে রাজিয়ার মুখ দেখতে পাননি মাস্টার, এইবার দেখলেন। বিমর্ষ লণ্ঠনের আলোয় মুহূর্তে সর্বাঙ্গ তাঁর শিউরে উঠল।

বিষাক্ত ক্ষতে সে বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখ মানুষের নয়। যেন একটা গলিত মড়া দুটো অস্বাভাবিক জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে!

নিজের অজ্ঞাতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করলেন মাস্টার।

খাটের কোণায় ঝিমুতে ঝিমুতে চমকে জেগে উঠল বুড়িটা। বুকের ওপর থেকে কাঁপা হাতে ময়লা চাদরটা টেনে নিয়ে রাজিয়া খাতুন মুখ ঢাকল।

সামলে নিয়ে বুড়ি বললে, কে, মাস্টার সাহেব?

—হাঁ, আমি। ওষুধটা খাইয়েছ ওকে?

—না, খায়নি। জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে—বুড়ি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল: মিথ্যেই আপনি এত দয়া করছেন মাস্টার সাহেব, এত কষ্ট পাচ্ছেন! ও বাঁচবে না।

বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখখানার সেই আকস্মিক ছবিটা এখনো যেন মাস্টারের শরীরটাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে, যেন একটা কঠিন শীতল থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। মনে হল, ও যেন রাজিয়া খাতুন নয়—যেন ওর মুখের দর্পণে সমস্ত সমাজের চেহারাটা দেখতে পেলেন তিনি। অমনি গলিত, অমনি বীভৎস, অমনি বিষাক্ত।

কোনো কথা বললেন না মাস্টার। নিঃশব্দে এসেছিলেন, নিঃশব্দেই সরে গেলেন।

পরের দিন।

রাজিয়ার ঘরে আসবেন না, এমনি একটা ঠিক করেছিলেন মাস্টার। নিশ্চিত পরিণামের হাতেই রাজিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বেদনার্ত উদাসীনতার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। করবার নেই, কিছুই করবার নেই।

এতো শুধু শাহুর পাপ নয়! তাঁর পাপ, সমাজের পাপ—সকলের পাপ। এই পাপের অপরাধে শুধু দোয়া চেয়ে তিনি বলতে পারেন, অ্যায়্ খোদা, অ্যায়্ রহমান, মাফ করো আমাদের—আমাদের মুক্ত করো। গ্লানি মুছে যাক—অন্যায় মুছে যাক—। তোমার নিজের রাজ্য পাকিস্তানে মানুষ মহৎ হোক, নির্মল হোক—ইন্‌সানের গৌরবে ভরে উঠুক সারে জাহান।

রাজিয়ার ঘরে যাবেন না সংকল্প করেও রাখতে পারলেন না। দুপুর-বেলা মেয়েটার আর্ত তীব্র গোঙানি তাঁর কানে এল। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন তিনি।

বুড়ি ঘরে নেই—কোথায় বেরিয়ে গেছে। আর বিছানার ওপরে উঠে বসেছে রাজিয়া খাতুন। ক্ষতাক্ত বীভৎস মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টি—গলিত শবদেহের যেন দুটো আগ্নেয় চোখ।

—আমাকে ছেড়ে দাও—যেতে দাও আমাকে। তুমি আমার আব্বা —চিৎকার করে প্রলাপ বকছে মেয়েটা।

—রাজিয়া!—আলিমুদ্দিন দু পা এগিয়ে এলেন।

—বদমাস—গুণ্ডা—শয়তান। ছেড়ে দাও আমাকে—আলিমুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রাজিয়া আগুন বর্ষণ করতে লাগল দু চোখে: পালাও—পালাও—এখান থেকে—

—চুপচাপ শুয়ে পড়ো বেটি, কোনো ভয় নেই তোমার—সভয়ে মাস্টার বলতে গেলেন।

—ভয়?—রাজিয়া বিকৃত মুখে বিকটভাবে হেসে উঠল: কাকে ভয় করব আমি? ভয় করবার কী আছে আমার?—আচমকা হাসিটা তার বন্ধ হয়ে গেল, মাস্টারের মুখের ওপর খর দৃষ্টি ফেলে দিয়ে বললে: কে তুমি? আমাকে কোথায় এনেছো?

—বেটি !

—বেটি !—রাজিয়া আবার চিৎকার করে উঠল : বেটি অমন সবাই বলে। শয়তান—ইব্লিশের ঝাড় ! বলতে বলতে মাথার কাছের মেটে কুলুঙ্গি থেকে একটা চীনে মাটির পেয়ালা তুলে নিলে রাজিয়া। সাবধান হবার আগেই সেটা সশব্দে এসে লাগল মাস্টারের কপালে, খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে।

এই সময় বুড়ি ঢুকল ঘরে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল।

—এ কী মাস্টার সাহেব—কী হল ? কপাল দিয়ে খুন পড়ছে যে !

হাতের তেলোয় কপালের রক্তটা মুছে নিয়ে মাস্টার হাসলেন।

—ও কিছু না। রাজিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তুমি ওকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করো নাদিরের মা।

কিন্তু রাজিয়াকে ঘুম পাড়াবার আগে বুড়ি নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। মাঝরাতে তার হাঁউমাউ চিৎকারে আলিমুদ্দিন ছুটে এলেন।

বিছানায় রাজিয়া নেই।

তাকে পাওয়া গেল শেষ রাতে। একটু দূরের একটা ছাড়া ভিটের ভাঙা পাতকুয়োর ভেতরে। টর্চের আলোয় দেখা গেল নিচের ভাঙা পাটের গায়ে একখানা পাণ্ডুর হাত উঠে আছে আর আবর্জনা ভরা সবুজ জলে ভাসছে একরাশ চুল।

বুক-ফাটা চিৎকার করে উঠল এলাহী বক্স। অজ্ঞান হয়ে পড়ল নাদিরের মা। আলিমুদ্দিনের হাত থেকে টর্চটা ঝুপ্ করে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

তবু এই ভালো। এতদিনে সব যন্ত্রণা ওর দূর হয়ে গেছে—অন্ধকার শীতল জলে ওর সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেছে।

সতেরো

বেগুন গাছের গোড়া খুঁড়ছিল উত্তমা। পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালো।

—আসুন রঞ্জনদা।—লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। খুরপীটা ফেলে দিয়ে ঝাড়তে লাগল হাতের মাটি।

—ডাক্তার কই?

—রুগী দেখতে গেছে, কলেরা কেস্। বড্ড তাড়া ছিল। বলে গেছে, আপনি যেন কিছু মনে না করেন। যত শীগ্‌গির পারে ফিরে আসবে।

—বাঃ রে, মনে করব কেন? রুগী দেখাই তো ডাক্তারের কাজ, কিন্তু কলেরা? এদিকে কলেরা শুরু হয়েছে নাকি?

—শুরু মানে?—উত্তমা হাসল: লেগেই তো থাকে। কম বেশি হয় এই যা। তবে কয়েক শো এক সঙ্গে না মরলে তো খবরের কাগজে বেরোয় না। জানতেও পারে না শহরের লোকে।

—ওঃ!—শঙ্কিত বেদনায় চুপ করে রইল রঞ্জন।

—এ নিয়ে আর ভেবে কী করবেন? লোকের গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে মুশকিল হয় কার্তিক অঘ্রাণ মাসে, যখন পাট পচতে থাকে। রাতের পর রাত ঘুমোবার সুযোগ পাই না। গত বছর তো খেটে খেটে দাদারও কলেরা ধরে গেল। সে যা হাঙ্গামা! আমাকে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতে হয়, মা একা দাদাকে নিয়ে যমের সঙ্গে লড়াই করছেন। জ্যাঠামশাইদের খবর দেওয়া হয়েছিল—ভয়ে তাঁরা এ তল্লাট মাড়ালেন না। বিশ্বাস তো নেই—ওলাবিবির দয়া বড্ড ছোঁয়াচে কিনা!—উত্তমা থামল, একসঙ্গে কতগুলো অনাবশ্যক কথা বলে ফেলে খানিকটা লজ্জাও বোধ করল যেন।

—যাক সে সব। চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন।

—ঘরে গিয়ে কী করব? যা গরম। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া এখানে।

—কিন্তু বসবেন কোথায়?

—এই তো চমৎকার জায়গা রয়েছে—একটা আম গাছের তলায় বসে পড়ল রঞ্জন।

—মাটিতেই বসলেন?—স্নিগ্ধ হাসি হাসল উত্তমা: তা বসুন। রাজবাড়ির লোক আপনারা, একটু ধুলো-মাটির সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো।

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা করব কেন?—উত্তমাও একটু দূরে মাটিতে আসন নিলে। একটু কাত্ হয়ে একখানা হাতের ওপর ভর রাখল নিজের, তারপর প্রাণোজ্জ্বল দীপ্ত দৃষ্টি মেলে বললে, রাজবাড়ির লোক না হলেও খাঁটি মাটির কাছাকাছির তো আপনাদের বেশি আসতে হয় না।

—কিন্তু আমার ওপর কি একটু অবিচার হচ্ছে না?—রঞ্জনের স্বর ক্ষুণ্ণ।

—অবিচার?—কথাটার প্রতিধ্বনি করল উত্তমা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলে না। বাগানের বাইরে যেখানে টাঙন নদীর খাড়া পাড়ির ওপরে চলেছে মহুয়া গাছের সারি আর তার আড়ালে টাঙনের জল চিকচিক করছে, তার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে আনল উত্তমা। যেন গুছিয়ে নিলে চিন্তাটাকে।

—দোষ দিচ্ছি না আপনাদের—একটা শুকনো আমের পাতা কুড়িয়ে নিলে উত্তমা। গুঁড়ো গুঁড়ো করতে লাগল আঙুলের ডগায়: একেবারে মাটি থেকে উঠে না এলে মাটিকে ভালো করে চেনা যায় না। রাগ করবেন না রঞ্জনদা, দোষ শুধু আপনাদের দিচ্ছি না। আমরাও তো

গাঁয়ের লোক। তবু আমাদের জোত-জমা আছে। অর্থাৎ ধানের শীষটাই আমরা নিতে জানি—যে লাঙল দেয় তার খবরটাই কি পুরোপুরি রাখি? আপনাদের অসুবিধে আরো বেশি, থালার ওপর সাজানো ভাতটাই পান কিনা একেবারে!

—তাই তো মাটিটাকে জানতে এসেছি।

—ওই চেষ্টারই দাম আছে। সেও কম কথা নয়। কিছু মনে করবেন না, জানতে ঢের বেশি সময় লাগবে—চোখ বদলাতে হবে।

—সেটা পারব না কী করে জানলে?—উত্তেজনার সুর এল রঞ্জনের গলায়।

—আপনারা নতুন মন নিয়ে এসেছেন—অন্যমনস্ক চোখটাকে নদীর ওপর মেলে রেখে উত্তমা বললে, আপনাদের খানিকটা ভরসা হয়। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না এখনো।

—কেন?

উত্তমা সোজা হয়ে বসল। সরল উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি রঞ্জনের মুখের ওপর মেলে ধরল।

—একটা মজার গল্প মনে পড়ল। ঠিক গল্প নয়—শুনবেন?

—হঠাৎ গল্প কেন আবার?—বিস্ময়ে ভ্রূ প্রসারিত করল রঞ্জন।

—শুনলেই বুঝতে পারবেন—অর্থ-গভীর মৃদু হাসল উত্তমা: বছর দুই আগে এদিকটাতে খুব বান হয়েছিল, জানেন?

—হাঁ, কাগজে পড়েছিলাম।

—খুব বান হয়েছিল। অনেকগুলো গ্রাম ভাসিয়ে নিয়েছিল। কলকাতা থেকে রিলিফের দল এসেছিল। আর সেই দলে ছিলেন অজয়দা।

—কে অজয়দা?

—আপনি চিনবেন না, না চিনলেও ক্ষতি নেই। এখন যা বলছিলাম শুনুন।—উত্তমা আর একটা শুকনো আমের পাতা কুড়িয়ে নিলে মাটি থেকে: বয়েসে আপনার মতোই হবেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা—শুনেছিলাম ওকালতী করেন। কলকাতার বাইরে কখনো পা দেননি। এখানে এসে আমাদের বাড়িতেই উঠলেন। সে কী উৎসাহ। দিন দুই চারদিক দেখে-শুনে বললেন, এতদিনে বাংলা দেশের দুঃখের চেহারাটা আমি দেখতে পেয়েছি। এই দেশের জন্যেই আমি কাজ করব—এ ছেড়ে আর নড়বনা।

—সাধু সংকল্প—মাঝখানে মন্তব্য জুড়ে না দিয়ে থাকতে পারল না রঞ্জন।

—তা বইকি!—উত্তমা হাসল: কিন্তু একটু পরেই টের পেতে আরম্ভ করলেন। মশার কামড়ে টুকটুকে ফর্সা গায়ে লাল লাল দাগ পড়ে গেল; লণ্ঠনের আলোয় রাতে বারে বারে হোঁচট খান; আমাদের এখানে যা খাবার জোটে তা আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। তাও সইছিল, শেষ পর্যন্ত—

উত্তমা হঠাৎ থেমে গেল।

—পালালেন বুঝি?

উত্তমা বললে, হাঁ, পালালেন। কিন্তু খানিকটা দোষ আমারও ছিল। —উত্তমা আবার একটু চুপ করল: একদিন বিকেলে আমরা দুজনে একটা ডোঙা নিয়ে জল দেখতে বেরিয়েছিলাম। মাঝখানে একটা পাকের মধ্যে পড়ে ডোঙা ডুবে গেল, দুজনে সাঁতরে একটা টিলার ওপর উঠলাম।

অজয়দার মুখ শুকিয়ে গেল।

—'এখন কী হবে?'

আমি বললাম, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে, চারদিকে প্রায় অথৈ সমুদ্র।

এখন যে কেউ উদ্ধার করবে সে ভরসা নেই। তবে জলে জোর টান পড়েছে, সকালের দিকে অনেকটাই নেমে যাবে—হয়তো কোমর ভর দাঁড়াবে। তখন হেঁটে গিয়ে গাঁয়ে উঠতে পারব। নৌকোও পাব।'

—'তা হলে সারারাত'—অজয়দা আর কথা বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, 'এই টিলার ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুম দেওয়া চলবে। সারাদিন খেটে আমারও শরীর আর বইছে না। এম্‌নিতে তো আর ছুটি মিলত না—বেশ ফাউ পাওয়া গেল এটা। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন।'

অজয়দা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু সাপ-টাপ'—

'হয়তো দু চারটে আছে।'—আমি ভরসা দিলাম: 'কিন্তু ঘাবড়াবেন না, বান-ভাসি সাপ কাউকে কামড়ায় না।'

অজয়দা বললেন, 'হুঁ।'—তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

উত্তমা আবার থামল। বিকেলের আলোয় রঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পেল আচমকা তার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে।

—কী আশ্চর্য জানেন—দ্বিধাভরে উত্তমা আবার শুরু করল: একটু পরেই দেখি, অজয়দার মন থেকে ভয়-ডর মুছে গেছে। রাত একটু বেশি হতেই আমার কানের কাছে এসে এলোমেলো বক্‌তে শুরু করলেন। দেখলাম, আমাকেই উনি এখন দেশ বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

আমি বারকতক ধমক দিলাম, বললাম, 'ঘুমুতে দিন।' কিন্তু কী অদ্ভুত মানুষ দেখুন—কিছুতেই আর থামতে চান না। আমার জন্যে নাকি ওঁর প্রাণটা হাবুডুবু খাচ্ছে। শেষকালে বিরক্ত হয়েই আমাকে বলতে হল, 'আর যদি কানের কাছে এভাবে বকর বকর করেন, তো ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেব। গায়ের জোরে তো আমার সঙ্গে পারবেন না—যত খুশি চান হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়ব।'

উত্তমা হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল।

—পরের দিনই সরে পড়লেন। দেশের ভালো আর করে উঠতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

আর সেই হাসিতে শিউরে উঠল রঞ্জনও। মনে হল মাটি কোপানো শক্ত হাতের একটা কঠিন চড় যেন আচমকা তারই মুখের ওপর এসে পড়ল। যেন উত্তমা মনে করিয়ে দিলে—

পেছনে কাশির শব্দ। চমকে মুখ ফেরালো দুজনেই।

বিকেলের ধূসর ছায়ায় মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছেন। কখন নিঃশব্দে এসেছেন টেরও পায়নি তারা।

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটো যেন একবার চক্ চক্ করে উঠল। যেন যেমন একটা কিছু আশা করেছিলেন তাই পেয়েছেন, যেন কোথা থেকে শিকারের অভ্যস্ত ঘ্রাণ এসে তাঁর নাসারন্ধ্রকে চকিত করে তুলেছে।

—তোর মা কোথায় ?

উত্তমা স্নিগ্ধ গলায় বললে, সে তো আপনি জানেন জ্যাঠা। মা রোজ বিকেলেই হরিসভার কীর্তনে যান আজকাল।

—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনেই ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

—আপনি আজকাল বড্ড বেশি ভুলতে শুরু করেছেন জ্যাঠামশাই—উত্তমা হাসল : এ দোষ কিন্তু আগে আপনার ছিল না !

বিষণ্ণ আলোয় মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না। তবু রঞ্জনের মনে হল, হঠাৎ যেন নিবে গেলেন ভদ্রলোক।

—বয়েস বাড়ে রে—বয়েস বাড়ে। ভুলচুকও হয়।—যেন কৈফিয়ৎ দিতে চাইলেন জ্যাঠামশাই।

—কিন্তু যাই বলুন—উত্তমা আবার স্নিগ্ধস্বরে বললে, লোকে কিন্তু তবু স্মৃতিশক্তির খুব প্রশংসা করে আপনার। বলে, এত বয়েস হয়েছে, তবু

সরকার কর্তার হিসেবের মাথাটি ভারী পরিষ্কার। আধিয়ারদের কর্জ দেওয়া ধানে কখনো এক ছটাক পর্যন্ত গোলমাল হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন।

—তা বটে—তা বটে। আচ্ছা, আমি তবে চলি।

—যাবেন? আসুন। কিছু মনে করবেন না জ্যাঠামশাই, কতক্ষণ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—দেখতে পাইনি, বসতেও বলতে পারিনি। চলুন না, ঘরে গিয়ে বসবেন, চা-ও খাবেন এক পেয়ালা—

—না, না, চা আমি খাব না। বরং হরিসভার দিকেই যাই—দ্রুত পায়ে চলে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়।

উত্তমা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তাঁর যাওয়ার দিকে। তারপর মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেলে ব্যঙ্গভরা উচ্ছ্বসিত গলায় লহরে লহরে হেসে উঠল।

—এইবার চিনলেন তো জ্যাঠামশাইকে? উনি বিলক্ষণ জানতেন মা কোথায় আছেন, তবু চোরের মতো গোয়েন্দাগিরি করবার লোভটুকু সামলাতে পারলেন না!

—তুমি কিন্তু ওঁকে চটিয়ে দিলে—এতক্ষণ পরে মৌনতা ভাঙল রঞ্জন।

—চটিয়ে দিলাম নাকি?—হাসি থামল উত্তমার, গলা শক্ত হয়ে এল: তুষ্ট করে রাখলেও যখন ছোবল মারতে ছাড়বেন না, তখন খোঁচা দেবার সুযোগটাই বা নেব না কেন? সে যাক—ওর জন্যে ভাববেন না। এখন ঘরে চলুন রঞ্জনদা, সত্যিই অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বাগান থেকে বেরুল দুজনে। কিন্তু উত্তমার পাশে পাশে হাঁটতে আজ কেমন সঙ্কুচিত বোধ করতে লাগল রঞ্জন। নিজের মধ্যে কোথায় একটা অপরাধ সজাগ হয়ে উঠেছে—সচেতন হয়ে উঠেছে গোপন পাপ।

কেন এমন করে তাকে অজয়দার গল্পটা শোনাল উত্তমা? তার মধ্যে কি অজয়ের রূপ দেখেছ কোথাও—দেখেছ ফানুসী শূন্যতা? নারী হলেই যে লীলাসঙ্গিনী হয় না, অত্যন্ত রূঢ় নির্মম ভাষায় তাই কি সেই সত্যটাকে সে মেলে ধরল তার সামনে?

মিত্রা নয়, সীতাও নয়। আর এক জাত—আর এক গোত্র।

সামনের পথটা দিয়ে একজন চাষার মেয়ে মাথায় এক আঁটি খড়ি নিয়ে চলেছিল।

উত্তমাই ডাকল তাকে।

—কে, সরলা নাকি?

সরলা থেমে দাঁড়াল: লাকড়ি কুড়িয়ে ফিরলাম দিদি।

—তারপর তোমার ঘরের খবর কী? নন্দ কী বলে?

সরলা কৌতুকভরে হেসে উঠল: সকাল থেকে জাম গাছে চড়ে বসে আছে।

—জাম গাছে! সে কী?

সরলা বললে, নামতে সাহস পাচ্ছে না।

উত্তমা বললে, কী আশ্চর্য! না—না, এ ঠিক হচ্ছে না। এ ভারী অন্যায় সরলা।

সরলা বললে, অন্যায় আবার কী! অমন ডোরপোক মরদ নিয়ে ঘর করা যায় না। থাক একটা রাত—মশার কামড় খাক, কালই ঠিক হয়ে যাবে। যাই দিদি—

সরলা এগিয়ে গেল।

রঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বললে, এর মানে? নন্দ কে? ওর স্বামী?

—হুঁ।

—তা গাছে উঠে বসে আছে কেন?

উত্তমা হাসল ঃ ঝাঁটার ভয়ে। শুকনো লাকড়ির ভয়ও আছে।

—এ রকম বীরাঙ্গনা তো বাংলা দেশে সহজে দেখা যায় না! স্বামীকে একেবারে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করতে হয়! ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। ওর স্বামী কিছুতেই কিষাণ সমিতিতে যোগ দিতে চায় না, ভয় পায়। তাই এটুকু পারিবারিক শাসনের ব্যবস্থা।

—সর্বনাশ! এ বুঝি সব তোমার লাইন অফ্ অ্যাক্‌শান?—রঞ্জন সভয়ে উত্তমার দিকে তাকালো। উত্তমা এবারে শব্দ করে হাসল ঃ তা বলতে পারেন। তবে বেচারাকে সারা রাত গাছে বসিয়ে রাখতে হবে এমন কঠিন শাস্তির বরাদ্দ করিনি আমি। কিন্তু কী করা যাবে—উপায় নেই। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের তো ওইখানেই তফাৎ রঞ্জনদা। পুরুষেরা এক সঙ্গে সব কিছু করে, কিন্তু কোনোটাই সম্পূর্ণ করে পারে না। মেয়েরা যেটুকু ধরে—সে একেবারে মরণ কামড় দিয়ে।

রঞ্জন বললে, যে ভাবে ভেতর থেকে তোমরা ভাঙতে শুরু করেছ, তাতে আর কাউকে পালাতে দেবে না দেখছি।

উত্তমা কঠিন গলায় বললে, না। ভীরু পুরুষকে ভয়ের পাপ থেকে মুক্তি দেব আমরা। ওরা যখন শড়কী নিয়ে এগোবে, পেছনে আমাদের হাতে থাকবে ছুরি। যদি শত্রুর ভয়ে পিছু ফিরে পালাতে চায়, আমরা ক্ষমা করব না।

আচমকা হোঁচট লাগল রঞ্জনের পায়ে। পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিলে।

উত্তমা হাত চেপে ধরলে ঃ বড্ড অন্ধকার—আমার সঙ্গে চলুন।

শক্ত, কঠিন হাত। মিতা নয়, সীতাও নয়। কম্‌রেড্।

একটা সাইকেলের আলো পড়ল গায়ের ওপর। নগেন ডাক্তার ফিরে এসেছে।

আটারো

কোথায় শিকার, কোথায় কী! অ্যাল্‌বার্টের হালচাল ক্রমেই কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল ক্যারুর।

একদিক থেকে ভালোই যে হয়েছে—সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। গেম্‌স্‌বার্ডের সন্ধানে বেরিয়ে জমিদারের জলায় দুটো চারটে ফায়ার করলে শ্রাদ্ধ কতদূরে যে গড়াত বলা শক্ত। পেণ্টুলুনপরা চেহারা আর শাদা বাপের ছেলে—এর অতিরিক্ত কতটুকু মর্যাদা তার আছে কুমার ভৈরব-নারায়ণের কাছে। নিতান্তই সাম্‌না-সাম্‌নি গেলে একখানা চেয়ার বসবার জন্যে এগিয়ে দেয়—এই যা। কিন্তু হাঁড়িতে যে তার কতখানি চাল এ আরো ভালো করে কে জানে কুমার বাহাদুরের চাইতে?

অ্যালবার্টের বন্দুক দুটো যেমন তেমনি ঝুলোনোই আছে। না আছে তার হিমালয়ান রেঞ্জ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল, না আছে শিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ। ক্যারু সাহেবের সন্দেহ হয় তার চাইতে বড় কিছু শিকারের সন্ধানে আছে অ্যাল্‌বার্ট।

কী সে শিকার? মার্থা নয় তো?

একটা প্রচণ্ড উত্তাপে ক্যারুর সমস্ত মগজটা যেন টগবগ করে ফুটে উঠতে চায়। দেশের বুকের ওপর চাবুক চালিয়ে একদিন রেশমের ব্যবসা করেছে পার্সিভ্যাল। সাহেবের সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে যারা তাঁতে রেশম বুনে প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছে, রাত্রে মশাল্‌চী পাঠিয়ে আগুন লাগিয়েছে তাদের ঘরে। খুন-খারাপীও যে দুটো চারটে করতে হয়নি—নিঃসন্দেহে একথা বলবার মতো জোর নেই স্মাইদ্ ক্যারুর।

সে রক্ত তার মধ্যেও আছে। সেই অত্যাচারী, সেই আঘাত।

দারিদ্র্য আর বংশ-পরিচয়ের লজ্জায় আহত সাপের মতো সে ফণা লুটিয়ে আছে ; কিন্তু দরকারমতো প্রাণঘাতী ছোবল দেবার শক্তিও যে রাখে, তার পরিচয় অন্তত একবার সে দিয়েছেই। সেই চামড়ার মতো নীরেট্ অন্ধকারের কালো রাত্রে—

স্মৃতির গলাটা জোর করে চেপে ধরল স্মাইদ্। কিছুদিন থেকে এই এক ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার! যা প্রায় ভুলতে বসেছিল—থেকে থেকে হঠাৎ আলোড়ন লাগা জলের তলা থেকে একরাশ ঘোলা কাদার মতো তা ওপরে উঠে আসতে চায়। বলা যায় না, এর শেষ কোথায়। শেষ পর্যন্ত একদিন হয়তো সোজা আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে—বোবাধরা গলায় চিৎকার করে বলতে চাইবে, হুজুর, বারো বছর আগেকার এক মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায়—

ক্যারু অস্থির ভাবে উঠে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

আশ্চর্য! সে কেউ নয়—সে কোথাও নেই। এই পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোয় বাইরে সে অনধিকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঘরের ভেতর আলো-না-জ্বালা ঘন ছায়ার সুযোগে অ্যাল্‌বার্ট অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে বসেছে মার্থার—গান শোনাচ্ছে তাকে। তবু পিয়ানো-টিয়ানো কিছুই নেই—এই যা রক্ষা।

জল্‌সন, বীং ক্রস্‌বি—অদ্ভুত সব নাম। যেন মায়া-লোকের কতগুলো স্বপ্নকথা। শুনতে শুনতে সে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছে। গান তার খুব ভালো লাগে না, ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাও নেই। সাঁওতালী নাচ দেখেছে, শুনেছে ঝুমুরের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের বাজনা, খুশি হয়েছে আদ্যের গম্ভীরা দেখে, 'এন্‌কোর এন্‌কোর' বলে উৎসাহ দিয়েছে ধামালী গানের নগ্ন আদিরসে।

কিন্তু এ এক বিচিত্র জগতের খবর।

"Do you know the man, who came down from the moo—oo—n"—

আবেগভরা গম্ভীর গলায় গান ধরেছে অ্যাল্‌বার্ট। মার্থাও স্বর মিলিয়েছে তার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে পড়ল স্মাইদ্, মনে হল, মার্থার গলা আশ্চর্যভাবে মিশ খেয়েছে অ্যাল্‌বার্টের সঙ্গে, নিখুঁত তান বাঁধা হয়ে গেছে সরু মোটা তারে। এই দুইয়ের মাঝখানে সে প্রক্ষিপ্ত ; এদের ভেতরে তার গলা কোথাও মিলবে না, বেসুরো করে দেবে সব কিছুকে !

"The man from the moon—"

অ্যাল্‌বার্ট ? হয়তো তাই। মার্থার এই মাটির পৃথিবীতে যেন কোন্ চন্দ্রলোকের সংবাদ। সেখানে অন্ধকারের ছায়ার মতো ক্যারু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে না তো ?

একটা অনিশ্চয় আশঙ্কায় নিজের হাত কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিছুই বলা যায় না, বলবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই কিছু। অতিথি—বন্ধু ! কিন্তু এ কেমন অতিথি যে এসে এই সাতদিনের মধ্যেও নড়তে চাইছে না ! দিন রাত অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে বকর বকর করে কথা কইছে ? এই বা কোন্ দেশী বন্ধুত্বের নমুনা !

নাঃ, এবার অ্যাল্‌বার্টের যাওয়া উচিত।

কাল একবার আভাসও দিয়েছিল।

—তোমার তো ছুটি ফুরিয়ে এলো বার্টি ?

মার্থা শিউরে উঠেছিল শুনে : তাই নাকি ? কী সর্বনাশ !

কিন্তু বার্টি অভয় দিয়েছিল : না—না, আরো দিন সাতেক হাতে আছে। তা ছাড়া, রিয়্যালি এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। দরকার হলে ছুটিটা আরো এক হপ্তা না হয় বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

আনন্দে মার্থা হাততালি দিয়ে উঠেছিল : বাঃ, কী চমৎকার হবে তাহলে !

চমৎকার! ক্যারুর ইচ্ছে হয়েছিল একসঙ্গে দু হাতে দুটো ঘুষি ছুড়ে দেয় অ্যাল্‌বার্ট আর মার্থার মুখের ওপর। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে আনন্দের একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল ঠোঁটের আগায়ঃ হাঁ, খুব চমৎকার হবে।

—আরো এক সপ্তাহ! ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ হচ্ছে! তাই বটে। আনন্দ হওয়ার কথাই। অ-দেখা গোল্‌ডার্স গ্রীণের বাতাস নিজের চারদিকে বয়ে এনেছে অ্যাল্‌বার্ট, স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ডের স্পর্শ ঝরে পড়েছে তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে। কিন্তু—কিন্তু আরো এক সপ্তাহ! আবার একটা খুন করতে হবে নাকি স্মাইদ্‌ ক্যারুকে?

তবু শেষ চেষ্টা।

—আর দু তিন দিনের মধ্যেই খুব বর্ষা নামবে এদিকে।

অ্যাল্‌বার্ট কৌতূহলী হযে উঠেছিলঃ রিয়্যালি?

—হাঁ, চারদিকে সমুদ্রের মতো জল দাঁড়াবে। এদিক ওদিক দেখতে পাওয়া যাবে না।

—বাঃ—এক্‌সেলেণ্ট! সে তো দেখবার মতো জিনিস।

ক্যারু নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল।

—তখন নৌকোয় করে পাড়ি দিতে হবে। তাতে প্রায়ই অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়—মানে নৌকা ডুবে যায়।

—ফাইন!—আনন্দে অ্যাল্‌বার্টের চোখ চকচক করে উঠেছিলঃ আমার সাঁতরাতে খুব ভালো লাগে। একবার আমি আধা-আধি চ্যানেল সাঁতারে গিয়েছিলাম।

—চ্যানেল? ইংলিশ চ্যানেল? তার অর্ধেক সাঁতারে গিয়েছিলে?—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মার্থা চোখ বিস্ফারিত করেছিল।

অসহায় ক্রোধে পকেটে হাত দিয়েছিল ক্রু সাহেব। তার পরেই

অ্যাল্‌বার্টের সামনে বিড়ি বার করলে পদমর্যাদা থাকবেনা মনে করে, পকেটের ভেতর গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙেছিল সেটাকে। ওটা বিড়ি না হয়ে মার্থার মাথাটা হলেই সে খুশি হত।

শেষ চেষ্টায় স্মাইদ বলেছিল, তখন কিন্তু খুব সাপের উপদ্রব।

—সাপ? রিয়্যালি?—অ্যাল্‌বার্টের কৌতূহল যেন অনন্ত: I am very much interested in Bengal snakes—

এর পরে বলা যেত মাত্র একটি কথা! বেরোও—বেরোও আমার বাড়ি থেকে। কিন্তু বলা কি অতই সহজ এখন? নিজেই নিজের গর্ত খুঁড়েছে! লর্ড বংশের ছেলে। ব্রেটনব্রুকশায়ার। নর্থএক্সিটার, অক্সফোর্ড। ক্যারুর কালো হাতের পাশে একখানা তুষার-শুভ্র হাত—সে হাতে হীরের আংটি। ক্যারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত আর একটা চেষ্টা করা যাক। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত দূরে সরিয়ে নেওয়া যাক মার্থার কাছ থেকে।

—চলো বার্টি, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

—ওঃ, গ্লাড্‌লি—অ্যাল্‌বার্ট উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্থাই বাধা দিয়ে বসল।

—না, বার্টি, তুমি আর একটু বোসো। যাওনা স্মাইদ্‌, তুমিই একটু ঘুরে এসো বরং। দিনরাত ঘরে বসে থেকে তোমাকেই কেমন ক্লান্ত লাগছে। তোমারই একটু বেড়ানো দরকার!

বেড়ানো দরকার! দরদ কত! এতক্ষণ পরে আর সহ্য হয়নি ক্রু সাহেবের। বারুদ-ঠাসা হাউইয়ে যেন শেষ আগুনের ছোঁয়া লেগেছে —দুর্বিসহ ক্রোধে ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে গেছে স্মাইদ্‌।

বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ক্যারু নিজের ডান হাতটা মুঠো করে ধরল।

দোষ তার নিজেরও আছে বই কি। তুলনা করে দেখলে মার্থার

পাশে পাশে বিউটি এ্যাণ্ড্ দি বীস্ট্ ছাড়া কী বলা যায় আর? মিশনারী বাপের মেয়ে মার্থা, উচ্চশিক্ষিত রেভারেণ্ড বিশ্বাস মেয়েকে পাশ করিয়েছিলেন জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্যন্ত। আর সে?

সে তবুও তো স্বামী। তবুও তো স্ত্রীর ওপর তার আইনগত অধিকার। এতদিন সেই অধিকারের দাবীতে নিশ্চয় হয়েছিল বলেই মার্থার কোনো কটু মন্তব্য, তার দারিদ্র্যের ওপর কটাক্ষ—কোনোটাই তার দুঃসহ বলে মনে হয়নি। অ্যাল্‌বার্ট আসবার পরেও মার্থা যদি তার সঙ্গে ঝগড়া করত, স্বভাবসিদ্ধ প্রখর ভাষায় গালিগালাজ করত, তা হলে মনে হত সব ঠিক আছে। চলেছে নিয়মমতোই—কোথাও কিছু ব্যতিক্রম হয়নি, ছন্দপতন ঘটেনি কোনোখানে। কিন্তু আজ—

মার্থা আর ঝগড়া করেনা। অভিযোগ করতেও ভুলে গেছে।

অবচেতনভাবে কী একটা যেন বুঝতে পারে ক্যারু। মনে হয়: এর চাইতে মার্থা যদি মুখর হয়ে উঠত, ঢের বাঞ্ছনীয় হত সেটা। অন্তত ক্রু সাহেব বুঝতে পারত, তার সম্পর্কে সজাগ চেতনা আছে মার্থার মনে। আজ এই অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে। ভদ্র হয়ে গেছে মার্থা—সংযত হয়ে উঠেছে—মার্থার রসনা যেন সদয় হয়ে উঠছে তার ওপর। মন থেকে সরে যাচ্ছে বলেই কি ভূমিকা তৈরী করছে সৌজন্যের?

"On the silvery green—the man came down from the moon—"

সন্ধ্যা নামল। রাত্রির ছায়া পড়ল আচক্রবাল মাঠের ওপর—শুধু রক্তের একটুখানি ফিকে রঙ্ লেগে রইল তিন-পাহাড়ের কৃষ্ণ-স্কন্ধতায়। একদল বকের পাখার ক্ষীণ ধ্বনি মিলিয়ে এল তাল-দিগন্তের ওপারে।

ঘরে আলো জলছে। গানটা থামল এতক্ষণে। হাসির কলধ্বনি উঠল একটা। জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—হয়তো ওরা বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজেকে সংযত রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কী বলতে কী যে বলে বসবে নিজেই জানেনা। তার চাইতে নিজের আহত মনটা নিয়ে একটু সরে দাঁড়ানোই ভালো।

সামনের খোলা দরজা দিয়ে এদিকের অন্ধকার ঘরটায় এসে ঢুকল ক্যারু।

কতগুলো ভাঙা জিনিসপত্র, একটা ছেঁড়া ক্যাম্প খাট। অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্যাম্প খাটটাতেই ঝপ করে বসে পড়ল স্মাইদ্।

বাইরে অ্যাল্‌বার্টের গলার আওয়াজ।

—স্মাইদ্ তো এতক্ষণ এইখানেই ছিল।

মার্থা জবাব দিলে, বোধ হয়।

—গেল কোথায় তা হলে ?

—তাই তো ?—মার্থা ডাকল : স্মাইদ্—স্মাইদ্ !

ক্রু সাহেব সাড়া দিলনা। ঠিক ইচ্ছে করেও নয়—সাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই যেন মনে হলনা তার। এও সৌজন্য, অ্যাল্‌বার্টের সামনে স্বামীর সম্পর্কে একটুখানি ভদ্রতা বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। কিন্তু সাড়া দিয়ে সে যদি সামনে গিয়েই দাঁড়াত, তা হলেই কি সত্যি সত্যি খুশি হত ওরা ? না—হতনা। স্মাইদ্ ক্যারু স্পষ্ট বুঝেছে—the man from the moon আজ ঘুম ভাঙিয়েছে রাজকন্যার ; কোনো দ্বীপ-দুর্গের মিনারে বন্দিনীর জানালা দিয়ে এনেছে মুক্তির সংবাদ। সেখানে একটা দৈত্যের মতোই সে অনভিপ্রেত-অনধিকারী।

মনে হল, মার্থা যেন এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে খুঁজে নিলে খানিকটা। তারপরে মন্তব্য করলে : কোথাও বেরিয়ে গেছে হয়তো। ও ওই রকম।

অ্যাল্‌বার্ট বললে, পুয়োর চ্যাপ

—পুয়োর নয়, ইডিয়ট।—মার্থার মন্তব্য শোনা গেল আবার।

—ইডিয়ট? তা সত্যি।—বোঝা গেল, মার্থার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার সম্মতি আছে। তবু বন্ধুত্বের ঋণটা একেবারে অস্বীকার করতে পারলনা অ্যাল্‌বার্ট: বাট্ হি ইজ্ এ গুড্ সোল।

অন্ধকারের মধ্যে দুহাতে হাঁটু দুটো চেপে ধরল ক্রু সাহেব। কোথা থেকে দু তিনটে আরশোলা পড়ল গায়ের ওপর, পায়ের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিয়ে গেল খুব সম্ভব একটা নেংটি ইঁদুর। কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। নিজেকে সম্পূর্ণ সজাগ করে—পরিপূর্ণভাবে উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি কথা সে শুনে যেতে লাগল।

মার্থা বললে, এসো, বসা যাক্।

চেয়ার সরাবার শব্দ এল। ওরা বসেছে তা হলে।

—তুমি কবে হোমে যাচ্ছো?—মার্থার প্রশ্ন।

—খুব সম্ভব আসছে মাসেই। ক্রুকশায়ার হল থেকে কাকার চিঠি পেয়েছি। কী দরকারী কাজে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—কাকা বুঝি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ, হি ইজ্ এ গ্র্যাণ্ড্ ওল্ড চ্যাপ। ভেরি জলী ম্যান। একবার চলোনা আমাদের ওখানে।

—আমি?—মার্থার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া গেল।

—কেন, আপত্তি কী?

—মিথ্যে ওসব বলে কেন কষ্ট দিচ্ছ বার্টি? জানোই তো আমার অবস্থা।

—এ ভারী অন্যায়!—অ্যাল্‌বার্টের গলায় অনুযোগের সুর: এখানে তোমার এভাবে নিজেকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

—কী করব তবে?

—You should see the other side of life also!

অ্যাল্‌বার্টের গলায় শয়তানের প্রলুব্ধিমন্ত্র বেজে উঠল। নির্জন বারান্দার নিভৃতিতে মার্থার সান্নিধ্য তাকে চঞ্চল করে তুলছে।

পায়ের কাছে একটা নয়—গোটা তিনেক নেংটি ইঁদুর ঘুর ঘুর করছে। সুযোগ পেয়ে একদল মশা চক্রাকারে ঘিরে ধরেছে তাকে। পাথর হয়ে বসে রইল ক্রু সাহেব।

—কিন্তু কী আমার আছে?—একটা কান্না-ভরা আকুলতা বেজে উঠল মার্থার গলায়ঃ এই জীবনই আমার ভালো। এইখানেই তিলে তিলে আমায় মরতে হবে!

—ইম্‌পসিবল! কিছুতেই তা হতে পারে না।—অ্যাল্‌বার্টের কণ্ঠে পুরুষের প্রতিশ্রুতি।

—কী করে আমি যাব? কী আমার যোগ্যতা?—মার্থা কি কাঁদছে? স্মাইদ্ ক্যারু ভাবতে চেষ্টা করল। মার্থা কখনো কি কাঁদতে পারে? কেঁদেছে কি কোনোদিন? ক্যারু মনেই করতে পারল না।

—আমার দিকে তাকাও মার্থা!—স্নিগ্ধ বিষণ্ণ স্বর অ্যাল্‌বার্টের: চোখ তোলো।

—না—না।

—তাকাও, ভালো করে তাকাও। তোমাকে দেখি।

—কী দেখবার সময় আছে আমার?

—তোমার চোখ। ব্ল্যাক আইজ। কালো চোখ দেখলে I feel so dreamy! মনে হয় ওই চোখের মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি।

—বার্টি, প্লীজ—বোলোনা অমন করে। আমি সইতে পারছি না।

—তুমি নিজেকে জানোনা মার্থা। নিজের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখোনি। জানোনা, তুমি কত সুন্দর!

—মিথ্যে। আমি কালো—আমি আগ্‌লি।

—কালো হলেই কি আগ্‌লি হয়? তুমি বাংলা দেশের সবুজ মাটির সৌন্দর্য। আই লাভ বেঙ্গল। বাংলা দেশের মেয়েদের আমার ভালো লাগে। একটা আশ্চর্য ছন্দ আছে তাদের। মনে হয়, লিরিক কবিতা। সেই কবিতা আমি তোমার মধ্যেও দেখেছি।

—বার্টি, তুমি লর্ড বংশের ছেলে। কত তোমার সম্মান, কত তোমার মর্যাদা। সেখানে কে আমি? বার্টি, ভগবানের দোহাই—তুমি আমায় ওসব বোলোনা।

—মার্থা!

—না।

—মার্থা, শোনো।

—না—না—মার্থা এবার সত্যিই কাঁদছে।

সিমেণ্টে জমানো কংক্রীটের মতোই জমে গেছে ক্যারুর সমস্ত পেশী-গুলো। স্তব্ধ হয়ে গেছে বোধেন্দ্রিয়। এও ছিল মার্থার মধ্যে। ছিল চোখের জল—ছিল স্বপ্ন—ছিল এমন দুর্বলতা। কোনোদিন সে-জগতের সন্ধান পায়নি ক্রু সাহেব, কোনোদিন পা বাড়াবার সুযোগ পায়নি মার্থার অন্তর-রাজ্যের এই বিচিত্রলোকে। যদি বিশ বছর আগেকার গোল্ডার্স গ্রীণের স্বপ্ন-মরীচিকা এমন করে তার ভেঙে না যেত, তা হলে—তা হলে কী যে ঘটতে পারত, কে বলতে পারে সে কথা!

—মার্থা, মাই লাভ—

—ও বার্টি—

—মাই ডার্লিং—

প্রেতের মতো যেন কবর ফুঁড়ে অভিশপ্ত ক্যারু ওদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। অ্যাল্‌বার্টের বাহুবন্ধনে তখনো মার্থা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তখনো ওদের ওষ্ঠাধর আকুল চুম্বনে এক সঙ্গে মিলিত।

নিঃশব্দে তিনজন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কিন্তু কী করতে পারত, কী করতে পারত ক্রু সাহেব ? আক্রমণ নয়, গালাগালি নয়, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রতি একটা কটু মন্তব্যও নয়। এ হবেই—এই অবধারিত—একথা তার চেয়ে কে আর বেশি ভালো করে জানে !

The man from the moon ! ছায়ার লজ্জায় আপনিই ছিটকে পড়ল স্মাইদ্ ক্যারু—যেমন করে একবার পড়ে গিয়েছিল একটা অবাধ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে।

কিছুই বলল না, একটা অব্যক্ত ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। তারপর যেন কী একটা অত্যন্ত দরকারী কাজের কথা মনে পড়েছে, এমনি ভাবে অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল বাইরের অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরল পরদিন বেলা নটায়।

উদ্দাম রাত কাটিয়ে ফিরেছে ভিন্ গাঁয়ের একটা নষ্ট মেয়ের ঘরে। তাড়ি গিলেছে কয়েক ভাঁড়। তারপর নেশায় জড়ানো চোখে টলতে টলতে ঘরে এসেছে। পাঁচ সাত বছর আগে মার্থার শাসনে এই অনুগৃহীতা মেয়েটার সংস্রব সে কাটিয়েছিল, আজ আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হল।

জানত—এ হবেই সে জানত। বিস্মিত হল না ব্যথাও পেল না। কালো মায়ের কালো ছেলে। পার্সিভাল্ তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে—সম্মান থেকে, মর্যাদা থেকে; তারই সগোত্র আর একজন শাদা মানুষ মার্থাকেও কেড়ে নিয়ে গেল।

অভিযোগ কাউকে করতে হলে—নিজেকেই; কারো গলা যদি টিপে ধরতেই হয়, তবে তা নিজেরই মায়ের—যার কালো রক্তের অভিশাপ নিজের সর্বাঙ্গে সে বয়ে এনেছে!

বেতের চেয়ারটার ওপর ঝুপ করে শুয়ে পড়ল ক্যারু। টেবিলের ওপর নীল কাগজে লেখা একটা চিঠি চাপা দেওয়া—মার্থা তাকেই লিখে রেখে গেছে। অভ্যাসবশে তুলে নিলে ক্যারু, তারপরেই মনে হল—কী হবে পড়ে? টুকরো টুকরো করে কাগজটাকে ছিঁড়ে জানলা গলিয়ে ছুড়ে দিলে বাইরে।

উনিশ

ঝিমধরা তালগাছগুলোর মাথার ওপরে কালো হয়ে এল ছাই রঙের আকাশ। কবরের ঝুরো মাটির ওপর শেষবার কোদালের উল্টো পিঠে ঘা দিয়ে মানুষগুলো সরে এল পেছনে। ওপরে সন্ধ্যা নামবার আগেই ওখানে ঘনিয়ে রইল বুক-চাপা অন্ধকার। এখানে রাত আসবে, রাত শেষ হয়ে যাবে; সূর্যমুখী আর চন্দ্রমল্লিকার মালা গাঁথবে দিনরাত্রি। অন্ধকার কবরের নীরন্ধ্র রাত জমাট হয়ে থাকবে; নড়বে না, সরবে না, একটি জোনাকি চমকে উঠবে না— শুধু মৃত্যুর গন্ধ দিনের পর দিন কটুস্বাদ হয়ে অপেক্ষা করবে— যতদিন না কোনো উল্কা-ঝরা নিশি-পাওয়া প্রহরে শেয়ালের লুব্ধতা মাটি খুঁড়তে থাকবে পচা মাংসের আকর্ষণে।

—মাস্টার সাহেব, যাবেন না?—এলাহী বক্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—কোথায়?—অন্যমনস্ক জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। তাঁর দৃষ্টি তালবনের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে গেছে বিলের জলে। আশ্চর্য রঙ জলটার। কালোর সঙ্গে লালের শেষ প্রতিবিম্ব দুলছে—যেন চাপ বেঁধে আসছে একরাশ রক্ত; একজোড়া উড়ন্ত চখা-চখীর পাখার শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল—মনে হল কোথাও একটা বিরাট হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে আসছে আস্তে আস্তে।

—কেন, ঘরে?—এলাহী আশ্চর্য হল।

—থাক, আর একটু বসি।

—এই গোরস্থানে ?—এবার যেন বিব্রত বোধ করল এলাহী : রাত নামছে যে !

—নামুক। তোমরা যাও।

—একা বসে থাকবেন এখানে ?

—ভয় করবে ভাবছ ?—আবছা তিক্ত হাসি ফুটল মাস্টারের মুখে : মড়াকে আমার ভয় নেই।

সদল-বলে তবু দাঁড়িয়ে রইল এলাহী। কী করবে মনঃস্থির করে উঠতে পারছে না যেন।

মাস্টার এবার স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

—বলছি তোমরা চলে যাও, তবু দাঁড়িয়ে আছ কেন সব ? আমি একটু একাই থাকব।

ওরা চলে গেল। ভালোই হয়েছে—বেঁচেছে রাজিয়া। নিস্তার পেল আজীবন বিষের জ্বালায় পুড়ে মরার হাত থেকে—বীভৎস বিকৃতাঙ্গ হয়ে টিঁকে রইল না লোকের ঘৃণা আর অনুকম্পা কুড়িয়ে। প্রথম আঘাতটা বড্ড লেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মরাটাই ওর দরকার ছিল—নিজের দিক থেকে, এলাহীর দিক থেকেও।

তবু তুষের তাওয়ার মতো জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতর। এই মেয়েটার মৃত্যুর জন্যেই নয়। চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন : শাহ বসে আছেন সারা সমাজটার একেবারে মাথার ওপরে, ইচ্ছে হলে যে কোনো লোককে ধরে তিনি ‘বাইশ বাজারে পয়জারের’ ব্যবস্থা করতে পারেন ; কথায় কথায় মাপা সাত হাত নাকে খত দেওয়াতে পারেন তাঁর কাছারীর সামনে ; নালিশ দিয়ে প্রজা তুলতে পারেন, বে-দখল করতে পারেন লাঠির ঘায়ে। আর নিজের বিষাক্ত কামনার জালে—

তবু ফতে শা পাঠান আজ দেশের নেতা। আজাদীর যে নতুন স্বপ্ন নিয়ে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে লীগের ঝাণ্ডার তলায়, সেই ভাবী পাকিস্তানের ওপরেও তিনি নিজের আসন কায়েম করতে চান! গড়তে চান এম্‌নি লাখো রাজিয়ার গোরস্থান। অসম্ভব—এ হতে দেওয়া যাবে না! সারা জীবন যুদ্ধ করেই এসেছেন মাস্টার—আজ আর আপোষ করতে রাজী নন মিথ্যার সঙ্গে।

এর মধ্যেই অনেক খবর কানে এসেছে। সেদিনের সেই জমায়েতের পর কাণ্ড গড়িয়েছে অনেক দূর অবধি। তাই ভয়ে সরে পড়ল জিব্রাইল। ইমাম সাহেব চটে আগুন হয়ে গেছেন, উস্‌কানি দিচ্ছেন জমাদার, শাহু তাঁকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে আঁটছেন ফন্দি-ফিকির। ইস্‌মাইল বলে বেড়াচ্ছে, লোকটা কাফের; মুখে লীগের বুলি আওড়ালে কী হয়, তলে তলে মাস্টারের সাঁট আছে হিন্দুদের সঙ্গে।

এ হবেই—জানতেন আলিমুদ্দিন। সত্যের জন্য অনেকখানিই দাম দিতে হয়। দিয়েছেন হজরত স্বয়ং—দিয়েছেন আবু বকর, দিয়েছেন আরো অনেকেই। তা নয়। তাঁর দুঃখ হয় ইস্‌মাইলের জন্যে। ধারালো তলোয়ারের মতো ছেলে; অফুরন্ত উৎসাহ—অক্লান্ত উদ্যম—পাকিস্তানের জঙ্গী নও-জোয়ান। আজ এই সব ছেলেরাও এদের ফাঁদে পা দিচ্ছে—বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে দিচ্ছে শয়তানের মস্‌নদ!

সন্ধ্যা ঘনাতে লাগল। গোরস্থানকে ঘিরে ঘিরে বাতাসের খর্‌ খর্‌ শব্দ উঠছে তালগাছের পাতায়। ভাঙা ভাঙা কবরগুলোর ওপর থেকে বাঁশের খুঁটি উঁকি দিচ্ছে ঝাপসা বিষণ্ণতায়; পচা কাফনের টুকরোর মতো অস্বচ্ছ অন্ধকারে অস্বাভাবিক শাদা হয়ে আছে ইতস্ততঃ কয়েকটি করোটি এবং কয়েকখানা হাড়; হাওয়ার মুখে থেকে থেকে কেমন একটা চিম্‌সে গন্ধের চমক।

একটু দূরে মাটি থেকে খানিক ওপরে এক ঝলক আগুন যেন ঝলমল করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন, পরক্ষণেই দেখতে পেলেন ধূসর ছায়া দিয়ে গড়া একটা দেহরেখা। শেয়াল—হাই তুলল। আলিমুদ্দিন আরো দেখলেন চকচকে নতুন টাকার মতো তার দুই চোখে লোলুপ সবুজ আলো এক দৃষ্টিতে তাঁকেই পর্যবেক্ষণ করছে।

নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে—লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই। তাই সন্ধ্যার ছায়া নামতেই এসে হাজির হয়েছে খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু তাঁকে দেখে থমকে গেছে। তিনি সত্যিই লোকালয়ের শরীরী জীব, না এই কবরখানায় সারা রাত যে অশরীরীরা ছায়া হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তাঁদেরই কেউ, এইটেই যেন বুঝে নিতে চাইছে ভালো করে।

—শালা বদ্মাস—

একটা অর্থহীন ক্রোধে মন ভরে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাটি থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে দিলেন শেয়ালটাকে লক্ষ্য করে। দ্রুত গতিতে সেটা একটা ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলিমুদ্দিন বিড়ি ধরালেন।

না—এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। করতেই হবে একটা কিছু। ফাঁকির বনিয়াদের ওপর কোনো সত্যই গড়ে উঠবে না। চোরা-বালির ওপর দাঁড় করাতে গেলে সব কিছু ধ্বসে পড়বেই একদিন—কেউ রক্ষা করতে পারবে না তাকে।

কাজ—অনেক কাজ। আগে যাচাই করে নিতে হবে আজাদীর অর্থ—জেনে নিতে হবে কাদের জন্যে সে আজাদী। ঘন-শ্যামল দিগ্‌দিগন্তের ওপর ওই যে নদীর রূপোলি রেখায় আঁকা চন্দ্রচিহ্ন—জেনে নিতে হবে এই মাটিতে সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবে কারা।

আর তা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ ধাওয়াদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবে

শাহুর পাইকের দল; ভিটের মাটি কামড়ে পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুণবে মানুষ; পারার ঘায়ের বিষাক্ত যন্ত্রণায় জলে যাবে এলাহী বক্সের বেটিরা। আর তাদের কবরের ওপর ঘিরে ঘিরে নামবে এমনি কটুগন্ধী রাত্রি—পচা মাংসের সন্ধানে ঘুরতে থাকবে শেয়ালের জলন্ত চোখ!

ভূতুড়ে তালগাছগুলোর শুকনো পাতায় পাতায় অপমৃত্যুর খড়্গাধ্বনি বেজে উঠল। হঠাৎ-খসা একটা উল্কার অগ্নিরেখা শিউরে গেল বিলের কালো জলের ওপর দিয়ে।

—আদাব মাস্টার সাহেব!

হোসেন। কালু বাদিয়ার সেই দুর্বিনীত ছেলেটা।

—এ সময়ে কী মনে করে রে?—এই সাতসকালেই হোসেনকে দেখে কিছু বিস্ময়বোধ করলেন মাস্টার।

—সেদিনকার জমায়েতে আপনার কথাগুলো শুনেছি মাস্টার সাহেব। খুব দামী কথা। কিন্তু ওগুলো না বললেই ভালো করতেন।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল হোসেন।

আলিমুদ্দিনের ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল।

—যা হক, তাই বলেছি।

—কিন্তু হক কথা শাহু তো শুনতে চায় না। ইমাম সাহেব না, থানার জমাদার বদরুদ্দিন মিঞাও না, এন্তাজ আলী ব্যাপারীও না।

—তা জানি।—আলিমুদ্দিন স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন হোসেনের দিকে: কিন্তু তোমরা?

—আমরা?—হোসেনের চোখ উজ্জল হয়ে উঠল: সেই জন্যই তো আপনাকে সালাম করতে এলাম মাস্টার সাহেব।

হঠাৎ পিঠ সোজা করে উঠে বসলেন মাস্টার। অস্বস্তির শূন্যতায় বিশ্বাসের ডাঙা মিলছে একটা। পায়ের নিচে খুঁজে পাচ্ছেন দাঁড়ানোর একটা শক্ত ভিত্তি। আছে—আছে। নতুন দুনিয়া, নতুন আজাদীর রাস্তায় এগিয়ে চলবার সঙ্গী তা হলে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে।

—তোমরা আমার সঙ্গে আছ হোসেন ?

—আছি মাস্টার সাহেব।—হোসেন হাসল। চকচকে শাদা দাঁত। আলিমুদ্দিন দেখলেন, কবাটের মতো চওড়া বুক—কাঁধের ওপর থেকে দু বাহু বেয়ে নেমেছে পেশীর কঠিন তরঙ্গ। হাঁ—ঠিক আছে। লোহার মতো শক্ত সোজা মেরুদণ্ড। নুয়ে পড়বে না—ভেঙে যাবে না।

হোসেন বললে, লীগ আমরা চাই, তার আগে বোঝাপড়াও চাই। দুশমনকে চিনে নিয়ে তবে আমাদের কাজ। মাস্টার সাহেব যখনই ডাকবেন, আমরা হাজির থাকব।

কী বলবেন ভেবে পেলেন না মাস্টার। বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছে যেন। পাকিস্তান। আজাদী। ফতে শা পাঠানের নয়—সারা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের। যাদের জিনিস, তারাই আজ হাত তুলে দাবী জানাতে এসেছে, আর তাঁর ভাবনা নেই।

হোসেন আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু একটা কথা বলব সাহেব !

—কী কথা ?

—শাহু আপনাকে সহজে ছাড়বে না।

আলিমুদ্দিন হাসলেন : কী করবে ?

—কিছুই বলা যায় না—সাক্ষাৎ ইব্‌লিস্ লোকটা।

আলিমুদ্দিন আবার হাসলেন : ইংরেজ সরকারকে ভয় করিনি—আজ শাহুকেও করব না। সে যাক, একটা কাজ করবে হোসেন ?

—বলুন।

—যাওয়ার পথে পারো তো একবার জলিল আর বসির ধাওয়াকে খবর দিয়ো। বলবে, বিকেলে যেন একবার আমার কাছে আসে।

—কিন্তু আমাদের কী কাজ সেতো বললেন না মাস্টার সাহেব ?

—সময় হলে ডেকে পাঠাব।

হোসেন দাঁড়িয়ে উঠল : তাই হবে। কিন্তু একটা কথা বলি মাস্টার সাহেব। আপনি যদি আমাদের হয়ে দাঁড়ান, তবে আপনার গায়েও কাউকে হাত ছোঁয়াতে দেব না।

খুব আস্তে আস্তে বললে কথাটা। কিন্তু এর চাইতে বেশি জোরে বলবার দরকার নেই। জাত বাদিয়ার ছেলে—গায়ে পাঠানের রক্ত। ওরা যখন 'টালের' মধ্যে ডাকাতি করতে যায়, আর গোরুর গাড়ির সোয়ারীকে টুকরো করে কাটে হাঁসুয়া দিয়ে—তখনো নিঃশব্দে কাজ করাই ওদের অভ্যাস।

হোসেন চলে গেল। আলবোলাটা সরিয়ে দিয়ে আলিমুদ্দিন চেয়ে রইলেন জালালী পায়রার চক্র দিয়ে-ওড়া পাল বুরুজের দিকে। সোনার রং ধরেছে ধানের মাঠে। কিন্তু ওই ধানের ওপর নামছে শাহুর একটা শক্ত ক্ষুধার্ত মুঠি—কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে খাবে মুখের গ্রাস। ওই ধান যারা রুয়েছে, ও তাদের নয়। তাদের জন্যে গোরস্থান—শেয়ালে খোঁড়া গর্তের ভিতর থেকে পচা পচা বাঁশের খুঁটি বেরিয়ে আছে যেখানে, যেখানে তালগাছের শুকনো পাতায় পাতায় বাজছে খড়্গধ্বনি।

তবু হোসেন। হোসেন আছে। আরো আছে—আরো আসবে। ধানের মাঠ ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকাতে চাইলেন আলিমুদ্দিন—দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে মেলে দিতে চাইলেন আরো কোনো দিগন্তের দিকে। যেন দেখতে চাইলেন বহুদূর থেকে কারা এগিয়ে আসছে—তাদের মুখ সূর্যের দিকে, তাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো পেছনে লুটিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল দুপুরের পর।

শাহুর ডাক পেয়ে আলিমুদ্দিন যখন মজলিসে গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন থম থম করছে ঘরটা। সমস্ত আবহাওয়া যেন বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী, ফেটে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তেই।

শাহু তাঁর বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে ধরলেন দু হাতে। তারপর বললেন, বসুন মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন চৌকিতে বসলেন। ইমাম সাহেব মুখ ফিরিয়ে নিলেন, জমাদার বদ্রুদ্দিন হঠাৎ অত্যন্ত মগ্ন হয়ে গেলেন একখণ্ড 'মাসিক মোহম্মদী'র পাতায়। আর ইস্মাইলের ঠোঁট দুটো বার কয়েক নড়ে উঠল, যেন কী একটা বলতে গিয়ে অতি কষ্টে সামলে নিলে নিজেকে।

একবার গলা খাঁকারি দিলেন শাহু।

—বলো ইস্মাইল—

ইস্মাইল মাথা তুলতেই আলিমুদ্দিনের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। মাস্টারের নীরব চোখে ইসমাইল কী আবিষ্কার করল সেই জানে, কিন্তু মিনিট খানেক পরেই সে শাহুর দিকে ঘুরিয়ে নিলে।

—না চাচা, আপনি বলুন। আপনি বললেই ভালো হয়।

শাহু আবার কিছুক্ষণ পাকিয়ে নিলেন গোঁফটা—যেন প্রস্তুত হয়ে নিলেন অবস্থাটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। তারপর ঃ

—আপনাকে মাপ চাইতে হবে মাস্টার সাহেব।

—কার কাছে?—শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন মাস্টার, শান্তভাবে হাসলেন।

কেমন থতমত খেয়ে গেলেন ফতে শা।

—মানে, কথাটা হচ্ছে এই—নিরুপায়ভাবে ইস্মাইলকে একটা খোঁচা দিলেন শাহু ঃ আরে, বলেই দাও না।

এতক্ষণে ইস্‌মাইল যেন জোর পেয়েছে। ফিকে হয়ে এসেছে অস্বস্তিটা।

ইস্‌মাইল বললে, শাহুর কাছে, ইমাম সাহেবের কাছে।

—কেন ?—তেম্‌নি শান্ত জিজ্ঞাসা মাস্টারের।

—কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তো চলবেনা—নির্ভীক হয়ে ওঠা ইস্‌মাইলের গলায় এবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল : তিন দিন আগেই যা করেছেন, সে কি এত শিগ্‌গির ভুলে যাওয়ার জিনিস ?

—তিন দিন আগে এমন কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না—যে জন্যে আমায় ক্ষমা চাইতে হবে !

বদরুদ্দিন অনুভব করলেন, এইবারে তাঁর কিছু বলা উচিত। আসামীর সামনে উকিল দুর্বল হয়ে পড়ছে, সুতরাং পুলিসের হস্তক্ষেপ দরকার।

বদরুদ্দিন বললেন, আপনি জমায়েতের মধ্যে এঁদের অপমান করেছেন।

কপালের দুপাশ দিয়ে শুধু দুটো শিরা ফুলে-ওঠা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটল না মাস্টারের। নিরুত্তাপ স্বরে শুধু বললেন, না, মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা!—শাহু প্রায় ফরাস ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ইমাম সাহেব ঘুরে বসলেন বিদ্যুৎবেগে।

—হাঁ, মিথ্যে কথা। আমি কাউকেই অপমান করিনি।

ইস্‌মাইলের চোখ ঝকঝক করে উঠল ছুরির ডগার মতো।

—ভালোমানুষি করারও একটা সীমা আছে মাস্টার সাহেব। সেদিন দুহাজার লোকের সামনে আপনি যেমন করে এঁদের অপদস্থ করেছেন, তার সাক্ষীর অভাব হবে না।

—অপদস্থ করেছি মানতে পারি, কিন্তু অপমান করিনি। যা সত্যি তাই বলেছি !

নিজেকে চারদিকে একটা পাথরের দেওয়াল তুলে দেওয়ার মতো কঠিন স্পষ্ট ভাষায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মাস্টার।

—মুখ সামলে কথা কইবে তুমি—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন ইমাম সাহেব। অসহ্য ক্রোধে সমস্ত মুখ তাঁর কালো হয়ে গেছে—যেন এখনি ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন মাস্টারের ঘাড়ের ওপর।

বদরুদ্দিন থানার লোক—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। চট্ করে মাথা গরম করা তাঁর অভ্যাস নয়। ইমাম সাহেবের একখানা হাত তিনি চেপে ধরলেন।

—মিথ্যে রাগ করবেন না মৌলবী সাহেব। সবাই যখন আছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।

—হাঁ, ব্যবস্থা একটা হবেই—ক্রোধে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল শাহুর : মাস্টারকে মাপ চাইতেই হবে।

ইস্‌মাইল দুটো হাত মুঠো করে ধরল : শুধু মাপ চাইলেই চলবেনা। জমায়েৎ ডেকে সকলের সামনে কসুর স্বীকার করতে হবে তাঁকে। যে অন্যায় তিনি করেছেন, তাতে শুধু আমাদের ইজ্জৎই নষ্ট হয়নি, লীগের কাজেরও ক্ষতি হয়েছে!

আলিমুদ্দিন আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

—এসব বাজে কথার কোনো মানে হয় না। যে অন্যায় আমি করিনি, তার জন্যে মাপ চাওয়ার শিক্ষাও আমি পাই নি। আচ্ছা আমি তা হলে চলি শাহু—আদাব!

এতক্ষণ পরে বাজের মত ফেটে পড়লেন শাহু। এতক্ষণের সঞ্চিত বিস্ফোরক বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এইবার!

—মাস্টার, তুমি—

—আমাকে আপনি বলবেন—দোর গোড়া থেকে মাথা ঘুরিয়ে আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন।

কথাটা শাহু শুনতে পেলেন না। গর্জন করে বললেন, কাল থেকে আমার স্কুলে আর তুমি ঢুকবেনা !

—বেশ !

—আজই আমার ঘর তুমি ছেড়ে দেবে—

—তাই দেব !—আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার জুতোর চাকর নই। আমিও মুসলমান—খোদার বান্দা। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে চেষ্টা করবেন।

আলিমুদ্দিন বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় তিন মিনিট পরে স্তব্ধ ঘরটার আচ্ছন্নতা ভাঙলেন ইমাম সাহেব। অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে তিক্ততম গলায় উচ্চারণ করলেন : ইঃ—খোদার বান্দা ! শালা কাফের, শালা হারামীর বাচ্চা !

মালিনী নদীর জলটাকে টগবগ করে ফুটিয়ে দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়সোয়ারের মতো বৃষ্টি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের জানালায়। কয়েকটা কাগজ উড়ে গেল ঘরময়, বিছানার খানিকটা ভিজে গেল বৃষ্টির ছাটে। রঞ্জন জানালাটাকে বন্ধ করে দিলে।

ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে—সুইচ্ টিপে সে আলো জ্বালালো। কুমার বাহাদুরের ডায়নামোর এই এক সুবিধে—এই পাড়াগাঁয়েও পা ফেলতে পারে না কালো রাত্রি।

একা ঘরে এমনি সন্ধ্যায় মিতার কথা মনে পড়ে। আরো বিশেষ করে যখন বৃষ্টি নামে : 'মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গ-প্রয়াতে'। রবীন্দ্রনাথের গান : 'বাহির হয়ে এল আমার স্বপ্ন-স্বরূপ'। স্মৃতির ভেতরে কতগুলো ঝরে-যাওয়া ফুলের রঙ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। সেও

একদিন কবিতা লিখত নাকি? সে কতদিন আগে? অনেক রোদের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে কোথায় হারিয়ে গেছে তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িটা—বাতাবী-ফুলের গন্ধে-ভরা ছায়াঘন বাগান—ঝুপ্‌সী আমগাছে রাঙা টুকটুকে কাঁকরোলের দোলা!

বাইরে মালিনী নদীর জল বর্ষায় উতরোল। নাগিনী পদ্মা কোথায় কত দূরে এখন? তার স্রোত জীবনের কোন্ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটিকে—সীতা যার নাম?

থাক—থাক ওসব। উত্তমার তীক্ষ্ণ হাসি। পুরুষের মতো পেশীপুষ্ট কঠিন হাত। অজয়ের গল্পটা একটা উদ্যত চাবুকের মতো দুলছে মনের সামনে। কমরেড্। লীলাসঙ্গিনী হারিয়ে গেছে মুকুন্দপুরের ছায়ার সঙ্গেই। এখন 'সময় কই—সময় নষ্ট করবার?' অনেক কাজ। প্রচুর খাটনি যাচ্ছে কদিন ধরে, নগেন ডাক্তারের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। তুরীরা প্রায় তৈরী—সাঁওতালদের মধ্য থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। যমুনা আহীর এখন নগেনের আশ্রিত—কিছুতেই সে ধরা দেবেনা পুলিশের হাতে। তা ছাড়া সে থাকলে আহীরদের সকলকে পাওয়া যাবে—আর সে সংগ্রামে হয়তো সেনাপতি হওয়ার দায়িত্বও নিতে হবে যমুনাকেই!

মোটামুটি সব অবস্থাই অনুকূল। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্য থেকেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। শাহুর লোক-লস্কর নিয়ে ইস্‌মাইল পূর্ণ-উদ্যমে নেমে পড়েছে আসরে। গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের ভূমিকা তৈরী চলছে এখন।

তা করুক। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নীতিটাই কেমন বিসদৃশ ঠেকে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করুক—কিন্তু সর্বজনীন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেন এসে

দাঁড়াবেনা পাশাপাশি পা ফেলে? সে তো হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। সকলের দাবী—সকলের পাওনা!

রঞ্জনের পেছনে ঘরের দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল। দেওয়ালের ওপর পড়ল ছায়া। আর সেই ছায়ায় যার দেহের ইঙ্গিত ফুটে উঠল—সে এমনি অস্বাভাবিক আর অপ্রত্যাশিত যে তীরবেগে ফিরল রঞ্জন—উঠে দাঁড়ালো সীমাহীন বিস্ময়ের চমকে।

কুমার ভৈরবনারায়ণ স্বয়ং!

—একি—আপনি!

কথাটা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল, না, তার মনের ভেতর থেকে উঠল একটা নিঃশব্দ চিৎকারের মতো, তাই সে ভালো করে বুঝতে পারল না।

কুমার তাঁর প্রকাণ্ড মুখে একটা বিস্তীর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুললেন। আফিঙের জড়তাভরা জ্যোতিঃহীন চোখে তাকালেন অর্থহীন দৃষ্টিতে। হঠাৎ একটা বিলাতী কার্টুন মনে এল: একটা 'প্রাইজ বুল' লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোনো গাজর-ক্ষেতের দিকে।

—খুব অবাক হয়ে গেছেন ঠাকুরবাবু?—কুমার বাহাদুর যেন নিজের লীলায় নিজেই কৌতুক বোধ করছেন: দেখতে এলাম কেমন আছেন।

রঞ্জন শুধু বলতে পারল, বসুন।

কুমার সশব্দে একটা চেয়ারে আসন নিলেন।

—কোনো দরকার আছে? তা হলে ডেকে পাঠালেই পারতেন। এত কষ্ট করলেন কেন?—আনুগত্যের বিনয়ে কথাটা বলতে হল রঞ্জনকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে। একটা কিছু ঘটবে। এই বর্ষার রাত্রে তার মতো অধমের ঘরে কুমার সাহেবের পদার্পণটা নিছক একটা কুশল-কৌতূহলই নয়! তাই

দেওয়ালের গায়ে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে নিচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে নুয়ে পড়তে দেবে না—দুর্বল হতে দেবে না!

—কখনো কখনো মহম্মদকেও পর্বতের কাছে আসতে হয়—কুমার বললেন: এক তরফা কি চলা উচিত?

বাইরে আমবাগানে সামনে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ। তবু কুমার বাহাদুরের কথাগুলো নির্ভুল স্পষ্টতায় শুনতে পেল রঞ্জন। কৌন্তেয় অর্জুন মোহপাশ থেকে মুক্ত হচ্ছেন আস্তে আস্তে। কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনটা করালো কে? পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা? ডাক্তার পান্নালাল এল-এম-এফ (পি)? না, দারোগা তারণ তলাপাত্র?

—আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—বলছিলাম কি ঠাকুরমশাই, হিজলবনীতে স্বাস্থ্যটা বোধ হয় আপনার ভালো থাকছে না।

—কেন, কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তো আমার!—রঞ্জন কেমন হতভম্ব হয়ে গেল।

কিন্তু জালটা কেটে দিলেন ভৈরবনারায়ণ নিজেই। গোরুর মতো সুবিশাল মুখে আরো প্রসারিত হচ্ছে হাসিটা। গাজর ক্ষেতের আরো কাছাকাছি এসেছে বোধ হয়।

—লজ্জা করছেন কেন?—কুমার ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, রঞ্জনের পিঠের পাশ দিয়ে তাকালেন শ্যাওলার চিহ্ন-ধরা দেওয়ালের দিকে: শরীর ভালো থাকলে কি আর এমন করে হাওয়া বদলাবার জন্যে আপনাকে ছুটতে হয় জয়গড় মহলে আর কালা-পুখ্রিতে?

মুহূর্তে শ্রদ্ধায় রঞ্জনের মন ভরে উঠল কুমার বাহাদুরের ওপর। সত্যিই অবিচার হয়েছে। আফিং খেয়ে ভৈরবনারায়ণ ঝিমোতে থাকেন বটে, কিন্তু কখনোই ঘুমিয়ে পড়েন না। তা ছাড়া আত্মপ্রকাশের মধ্যে

একটা আশ্চর্য শিল্পীর সূক্ষ্মতা আছে তাঁর—মুদ্গরের মতো নেমে পড়েন না ঘাড়ের ওপর !

কুমার বললেন, ও সব নগেন ডাক্তারের চিকিৎসার কাজ নয় মশাই। কলকাতায় যান। কালই চলে যান।

—কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না তো আমি।

—আমি দেখছি !—কুমার আপ্যায়িত বিনীত গলায় বললেন, আমার এখানে আছেন, আমাকে গীতা পড়ে শোনাচ্ছেন, পরলোকের কাজ করে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার কথাটা আমি ভাববনা, বলেন কি !—কুমারের স্বরে আত্মধিক্কার : আমাকে কি এমনি স্বার্থপর আর অকৃতজ্ঞ পেলেন ? না, না, সে হবে না।

—আমাকে যেতেই হবে ?—দেওয়ালের ভর ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইল রঞ্জন।

—আপনি চলে গেলে আমার অবশ্য খুব কষ্টই হবে—এমন যোগ্য লোক আর কোথায় পাব বলুন ? কিন্তু আপনার শরীরের কথা ভেবে চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না। তার চাইতে দিনকয়েক কলকাতায় গিয়ে স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে আসুন—কেমন ?

কুমার উঠে দাঁড়ালেন : অবশ্য দু মাসের মাইনে আগাম আপনাকে দেব। আর কাল বেলা দশটার ট্রেণে আমারি গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দেবো হজরতপুর স্টেশনে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু—

—আমার জন্যে ভাবছেন ?—কুমার থামিয়ে দিলেন : হাঁ, মনটা আমার দিনকতক খুবই খারাপ থাকবে। কিন্তু কী করা যায় বলুন ? আপনার দিকটাও তো ভাবতে হয়। তা ছাড়া কতদিন আত্মীয়-স্বজনের

মুখ দেখেন নি—সে জন্যেও তো একবার যাওয়া দরকার। তা হলে কথা রইল—কাল সকালেই। সাড়ে আটটার মধ্যেই গাড়ি রেডি থাকবে।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কুমার বাহাদুর থামলেন: আর সময়টাও খারাপ। এদিকে প্রায়ই খুন-খারাপী হচ্ছে। আপনি ভালো মানুষ—কিছু একটা হলে আমার আফ্‌শোসের সীমা থাকবেনা। বুঝছেন তো? —কুমার দরজাটা টেনে দিয়ে বিদায় নিলেন। বৃষ্টির শব্দে তাঁর জুতোর আওয়াজটা মিলিয়ে গেল।

বুঝেছে বই কি—সবই বুঝেছে। কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে—এ কুমার সাহেবের আদেশ। অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে কালসাপ লালন করেছেন তিনি—আর নয়। যদি না যায়? এ বাড়ির তোষা-খানায় সে আমলের ভারী তলোয়ার আছে—রামদা আছে। একটা বন্যা মালিনী নদীর বালির মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে কে তার হিসেব রাখে?

কিন্তু—

কাল সকালের আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। পালাতে হবে এই রাত্রে—এই বৃষ্টির মধ্যেই। আর দেরী করলে হয়তো সময়ও পাওয়া যাবেনা।

জানালাটা খুলে দিলে। অন্ধকার আমবাগানে ঝড় বৃষ্টির মাতামাতি বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্যে দেখা গেল মালিনী নদীর জলটা। একটা সোনালি অজগর যেন মোচড় খাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

কুড়ি

সাপের ছোবলের মতো বৃষ্টি আর চাবুকের মতো হাওয়া। দানো-পাওয়া রাত্রিটা গোঙাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল মালিনী নদীর জল ফুলে ফুলে উঠছে অজগর-গর্জনে। বরিন্দের রাঙা মাটি ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর-পাড়ি কেটে কেটে ঝর্ণার মতো নামছে ঘোলা জল—এক এক অঞ্জলি চাঁপা ফুলের মতো সোনালি ফেনা বয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ বেগে। বান আসছে নদীতে।

পাড়ির ধার দিয়ে দিয়ে, পিছল মাটির ওপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলল রঞ্জন। সঙ্গে ছাতা আছে বটে, কিন্তু সেটা একটা নিছক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এলোমেলো হাওয়ায় ছাট আটকাচ্ছে না—বরং দমকার ঝাপটায় তাকে শুদ্ধ ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে নদীর ভেতরে। বিরক্ত হয়ে ছাতাটা সে বন্ধ করে ফেলল।

এই বৃষ্টি ছাড়া কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো উপায়ই ছিল না তার। নইলে অনিবার্যভাবেই কাল সকালে এসে দাঁড়াতে কুমার বাহাদুরের মোটর—কিছুই বলা যায় না, হয়তো স্বয়ং কুমারই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন তিনি। মিথ্যে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই তাঁকে। নিজের পথ নিজে দেখাই ভালো।

এরই মধ্যে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। ওপরের সবটাই একখণ্ড মসৃণ কষ্টি পাথরের মতো। শুধু উত্তরের কোণায় একটা পিঙ্গল আভা ছড়িয়ে আছে তার ওপর—এই বৃষ্টিটার মধ্যে কোথাও যেন আভাস আছে সাইক্লোনের।

সারা গায়ে কোথাও এতটুকু শুকনো নেই আর। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে

বাতাসের ঝাপটা লেগে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। টর্চটাও আর জলছে না—বাল্‌বটা খারাপ হয়ে গেছে খুব সম্ভব। ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে—ভয় হতে লাগল এক সময় নদীর মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

কিন্তু আশে পাশে দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও। ইতস্তত বাবলা গাছগুলি ধারাস্নান করছে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর—তলায় আশ্রয় নিলে ঝাঁঝরির মতো বর্ষণ করবে সর্ব্বাঙ্গে। মাথার ওপর অনবরত মেঘ শাসিয়ে চলেছে—বিদ্যুতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিঃসঙ্গ তালগাছদের। এমনি রাত্রে তালগাছ দেখলে ওর কেমন ভয় করতে থাকে, মনে হয় অপমৃত্যুর একটা থমথমে আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা—যে কোনো মুহূর্তে ওদের ব্রহ্মরন্ধ্র চিরে বজ্র নেমে আসবে।

রঞ্জন দ্রুত পা চালাতে চেষ্টা করল।

হাঁটতে হবে—বেশ খানিকটা না হাঁটলে ঠাঁই মিলবেনা রাত্রের মতো। এই বৃষ্টি বাতাস ঠেলে সামনে এখনো পুরো তিন মাইল পথ। কাল পুখ্‌রিতে সোনাই মণ্ডলের বাড়ি। তারপর সকাল হলে সেখান থেকে জয়গড়ে।

সকালে তাকে না পেয়ে কুমার বাহাদুরের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু ও নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই কিছু। এতদিন দুজনের মধ্যে একটা মস্‌লিনের পর্দা টাঙিয়ে যে অভিনয় চলছিল, সেটা যে এমন আচমকা শেষ হয়ে গেছে এর জন্যে মনের দিক থেকে বেশ খানিকটা স্বস্তিই বোধ করেছে রঞ্জন। ভালোই হল—একেবারে মুখো-মুখি এর পর থেকে। স্পষ্ট, নগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দিনের পর দিন শত্রুতার কটুগ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ করার হাত থেকে বহু-বাঞ্ছিত মুক্তি।

কিন্তু এই তিন মাইল পথ যে তিনশো মাইলের চাইতেও দুর্গম এখন।

ক্রমাগত চশমার কাচ মুছতে মুছতে এখন একেবারে ঝাপসা হয়ে

গেছে। শুধু অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে সে। অন্ধ—নিঃসন্দেহে অন্ধ। বৃষ্টি আরো ঘন হয়ে জমছে তার পাশে—কোন্ সময় সোজা নদীর জলে গিয়ে পড়ে ঠিক ঠিকানা নেই।

কী করা যায়?

রঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু দূরে একটা বটগাছের আদল আসছে যেন। যাবে নাকি ওদিকেই? নদীর ধার ছেড়ে নেবে মাঠের রাস্তা? আপাতত সেটাই তার যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

দু'পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়ালো। চশমাটা খুলে নেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উপকারও হয়েছে খানিকটা। এখন চশমা থাকলে দুর্গতি ছিল কপালে।

এধারে প্রায় দশবারো ফুট গভীর একটা কাঁদড় আছে এবং তার মধ্য দিয়ে খরধারে ছুটছে জল। হাতের ছাতাটা সজোরে এঁটেল মাটিতে চেপে ধরে সে হুড়মুড় করে একটা বিরাট পতনকে সামনে নিলে।

—কে? কে?

বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে—ফাঁকা মাঠের দুর্যোগভরা অন্ধকারে কোথা থেকে স্বর বেজে উঠল। চকিতের জন্যে রঞ্জনের শিরাগুলো চমকে থেমে গেল—তীব্র অস্বাভাবিক ভয়ে শির শির করে উঠল লোমকূপগুলো। আর একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ার ঝোঁকটা সামলে নিতে হল তাকে।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? কথা বলছ না কেন?

মেয়ের গলা।

সীমাহীন বিস্ময়ে রঞ্জন দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করতে চেষ্টা করল। এতক্ষণ পরে যেন একটু একটু করে ঘোর কাটছে। কাঁদড়ের ঠিক

ওপারে যেটাকে সে বটগাছ বলে মনে করেছিল—সেখানে দুতিনটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে। আর তাদের অন্ধকার কোলের ভেতর ঘর আছে একখানা। সেখান থেকেই আসছে আওয়াজটা।

জবাব দেবে কিনা ঠিক করে নেবার আগেই বিদ্যুৎ ঝলকালো। তালগাছের উদ্ধত মাথাগুলোর ওপর উদ্যত খড়্গের আভাস দিয়ে খানিকটা তীক্ষ্ণ শাদা আলো ছুঁয়ে গেল পৃথিবীকে। আর রঞ্জন সেই আলোয় মেটে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কালোশশীকে।

কালোশশী! এত কাছে—এই অন্ধকারে এমন করে লুকিয়ে ছিল।

—ঠাকুরবাবু! তুই এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস্?

চকিত আলোতেও তা হলে চিনতে পেরেছে!

পা চালিয়ে চলে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতেই রঞ্জন দেখল কোন্ ফাঁকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে সে।

—হাঁ, আমি।

বৃষ্টির ঝরঝরানি ছাপিয়ে উদ্বিগ্ন আকুল স্বর কানে এল কালোশশীর: এত রেতে অমন করে ভিজছিস কেন! কোথায় যাবি?

—একটু কাজে। কালা পুখ্‌রি।

—কালা পুখ্‌রি!—কালোশশীর স্বর অপরিসীম বিস্ময়: নদী ফুলে উঠেছে, হড়পা বান নামছে। এখন তোকে কে খেয়া পার করে দেবে? ঘরে ফিরে যা ঠাকুরবাবু।

—ঘরে ফিরবার জো নেই কালোশশী। আমায় যেতে হবে—

—তবে এইখানে একটু দাঁড়িয়ে যা ঠাকুরবাবু—

—না, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

রঞ্জন টলতে টলতে আবার রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

—ঠাকুরবাবু—

কাঁদড়ের ওপার থেকে শোনা গেল কালোশশীর মিনতিভরা আহ্বান। কিন্তু আর দাঁড়াবেনা। নিশ্চিন্ত প্রতিজ্ঞায় কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ সচল হয়ে উঠল নিচের পৃথিবীটা। মাটিতে ছাতার বাঁট পুঁতে একবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আর সম্ভব হল না। দ্রুতবেগে হাত তিনেক পিছনে গিয়ে অসহায়ভাবে একবার সে ঘুরপাক খেল, তারপর সেখান থেকে ডিগ্ বাজী খেয়ে সোজা কাঁদড়ের জলে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুতের একটা উজ্জ্বল শুভ্রতায় সমস্ত ব্যাপারটাই পুরো-পুরি চোখে পড়েছে কালোশশীর। দুর্যোগের রাত্রিটা ছন্দোসুরভিত হয়ে উঠল হাসির উচ্ছল ঝঙ্কারে। অবগাহন স্নান শেষ করে, এক ঢোঁক কাদা জল গিলে রঞ্জন যখন দাঁড়াতে পারল তখন এপার-ওপারের ব্যবধানটা লোপ পেয়ে গেছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে কালোশশী নেমে এসেছে একেবারে জলের কাছে—হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে ঃ হল তো এবার? আমার ঘরে উঠে আয় ঠাকুরবাবু—

এক কোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রঞ্জন বললে, কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে।

কালোশশী শুধু বললে, আমার হাত ধর—

শেষ পর্যন্ত রাতটা কাটাতে হবে কালোশশীর ঘরে!

কিন্তু আর উপায় নেই। বাইরে সমানে বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপট।

সাইক্লোনই বটে। অন্ধকার রাত্রিটার গোঙানি চলেছে একটানা। এই প্রাকৃতিক শত্রুতা ঠেলে—অন্ধ দুচোখে পিছল পথের পতন-সম্ভাবনাকে সামলাতে সামলাতে কালা পুখ্রি গিয়ে পৌছনো শারীরিকভাবেই অসম্ভব এখন। তা ছাড়া খেয়াও একটা সমস্যা বটে। এমনিতেই রাত একটু বেশি হলে খেয়া ঘাটের মাঝি ওপারে নৌকা নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম

লাগায়—তাকে জগিয়ে তোলা সমস্যা বিশেষ। তারপর এই রাতে সে এপারের ডাক আদৌ শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ। আর শুনতে পেলেও এমনি বর্ষার একটি কোমল মসৃণ ঘুম এবং কম্বলের সুখশয্যা ছেড়ে সে যে কিছুতেই উঠবেনা এ প্রায় নিশ্চিত। তা ছাড়াও এই ভয়ঙ্কর নদী!

সুতরাং—

সুতরাং মেটে প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় কালোশশীর ঘরটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল রঞ্জন।

আশা করা যায়না, তবু একটা ভাঙা তক্তপোষ আছে ঘরে। ওই তক্তপোষের নিচেই বোধ হয় আছে কালোশশীর যা কিছু তৈজসপত্র। ঘরময় অনেকগুলি শিকে ঝুলছে, তাতে কিছু রঙবেরঙের হাঁড়ি। এককোণে মেলায়-কেনা একখানা মনসার সরা—তার ওপর বিষহরির মূর্তিটা প্রদীপের ম্লান আলোয় একটা স্থির জীবন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

—এই তোর ঘর?

—হুঁ।

—লক্ষ্মণ কোথায়?

—সে তো এখানে থাকে না।

—তবে কোথায় থাকে সে?

—আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে?—রঞ্জন চকিত চোখে তাকালো ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা কালোশশীর মুখে। কোনো চিহ্নই নেই সে মুখে—কোনো ছাপই পড়েনি বিরহ-জর্জরতার। স্রোতের জলে আরো অনেকের মতো যেমন ভেসে এসেছিল লক্ষ্মণ—তেমনি করেই আর একদিন ভেসে গেছে কালোশশীর জীবন থেকে। বাঁধা ঘাটে একটি রেখাও কোথাও এঁকে রেখে যায়নি, হয়তো একটুখানি শৈবালের কলঙ্করেখাও নয়!

কালোশশী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললে, হাঁ, ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে সাঙ্গা করেছে আবার।

—তা হলে তুই একা ?

—কে আর থাকবে ?

তীক্ষ্ণ অর্থভরা ভঙ্গিতে কালোশশী হাসল। অস্বস্তিতে রঞ্জন চমকে উঠল হঠাৎ। মনে হল, এই হাসিটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সাইক্লোনের এই রাতটার মতো এ হাসিটাও যে-কোনো সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে।

প্রসঙ্গ বদলানো উচিত। আরো মনে পড়ল: সেদিন অন্ধকার পথে আচমকা তাকে পথে ছেড়ে দিয়ে কালো রাত্রির আড়ালে ছায়াময়ীর মতো মিলিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সেদিন পাশাপাশি খোলা আকাশের তলায় পথ চলতে চলতে যে কথাটা শুধু ইঙ্গিতের মধ্যেই ঝলক দিয়েছিল—এই বিচিত্র রাত্রির নিঃসঙ্গ ঘরটির অন্তরঙ্গ নিবিড় অবকাশে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে কতক্ষণ ? বনের সাপ নিয়ে যার কারবার, তার মনের সাপটাও কি ঘুমিয়ে আছে ?

অস্বস্তিতে রঞ্জন নড়ে উঠল।

—এত রাত অবধি জেগেছিলি কেন কালোশশী ?

—সাপ ধরছিলাম।

—সাপ !

—শুয়েছিলাম—গায়ের ওপর দিয়ে হল্ হল্ করে চলে গেল। বর্ষার জল পেয়ে কোন্ ফোকর বেরিয়ে এসেছিল। চেপে ধরতে গেলাম—ফোঁস্ করে উঠল, পালালো বারান্দায়। আমার কাছ থেকে পালাবে ? খপ্ করে ধরে হাঁড়িতে পুরেছি।

—কী সাপ ?

—শামুক ভাঙা আলাদ। খুব তেজী। একটু হলেই কেটে দিত। দেখবি ?

রঞ্জন শিউরে উঠল : না, না থাক।

—ভয় পাচ্ছিস ? আমার ঘরটাই তো ভরা। যত হাঁড়ি দেখছিস, সব ওরাই আছে। একবার খুলে দিলেই কিল্‌বিল্‌ করে ঘুরে বেড়াবে গোটা ঘরময়।

—থাক, থাক !

কালোশশী আবার খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল : আমার আর কেউ নেই—ওরাই থাকে সঙ্গে। মানুষের মতো নিমকহারাম নয়—পোষ মানে।

—পোষ মানে ! সাপ আবার পোষ মানে ! যেদিন ছোবল মারবে ফস্‌ করে—বুঝবি সেদিন।

—একবারই মারবে—ব্যাস্‌ ফুরিয়ে যাবে তারপরে। মানুষের মতো বারে বারে ছোবল দিয়ে জ্বালিয়ে মারবে না।

গলার স্বর কি গভীর হয়ে উঠল কালোশশীর ? কখনো কি গভীর হয় ? কেমন যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভয় করে। কালোশশীর রূপোর কাঁকনপরা হাতদুটোয় কালনাগের ছন্দ—তার বাহুর ভঙ্গিতে ওই কাঁকনের দীপ্তিটাও ঝলক দিয়ে ওঠে সাপের মাথার চক্রের মতোই।

বাইরে বৃষ্টি চলছে, সেই সঙ্গে বাতাসের পাগলামি। জলের কল-গর্জন আসছে। নদীর, না কাঁদড়ের ? সর্বাঙ্গ ভিজে একাকার হয়ে গেছে—কাপড় বদলাবার মতো শুকনো কিছু কালোশশীর ঘরে প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা। সাইক্লোন বাড়ছে। এই রাত্রিকে বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস করতে সাহস হয় না কালোশশীকেও।

এর চাইতে তো পথই ছিল ভালো। আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তেও

কোথাও না কোথাও, একটা না একটা গাছের তলায় আশ্রয় মিলতই। তারপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়া পার হয়ে—

নাঃ, আর এখানে থাকার মানে হয় না। যেতেই হবে।

—আমি যাই কালোশশী—

—ঠাকুরবাবু—হঠাৎ বিচিত্র গলার ডাক এল একটা।

প্রদীপের আলোয় ভুল দেখল নাকি আজো? আজো কি সেদিনের সন্ধ্যার মতো একটা কিছুই অস্ফুট আভাস পেল সে? কালোশশীর চোখে কি জলের রেখা?

—আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু—

—কোথায়?

—তোমার ঘরে।

পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মেয়েটা। প্রস্তুত হওয়ার এক বিন্দু সময় না দিয়ে হাওয়ার একটা দমকার মতোই এগিয়ে এল রঞ্জনের দিকে। তারপর দু-হাতে তার পা জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে বসে পড়ল সেখানে: আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু।

—পা ছাড়, পা ছাড়। কী পাগলামি হচ্ছে এসব?—রঞ্জন প্রাণপণে পা ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ মুহূর্তে জমাট হয়ে গেছে।

—আর আমি সাপ নিয়ে ঘর করতে পারি না। আমি জ্বলে মরছি ঠাকুরবাবু—জ্বলে মরছি সাপের বিষে। আমাকে তুমি নিয়ে যাও—তোমার যেখানে খুশি নিয়ে যাও। আর আমি সইতে পারছি না।

নির্জীব পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে রইল রঞ্জন। তার পা দু'খানা বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরে অর্থহীন আকুলতায় ফুলে ফুলে

কাঁদতে লাগল কালোশশী—যেন বাইরের এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ রাতটার মতো তার কান্নাও আর কোনো দিন থামবে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়।

যেমন আচমকা পা জড়িয়ে ধরে কান্না আরম্ভ করেছিল, তেমনি আকস্মিকভাবেই পা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে চলে গেল বাইরে।

রঞ্জন একান্ত নির্বোধের মতো খাটের ওপরেই বসে রইল কিছুক্ষণ।

আরো খানিক পরে খোলা ঝাঁপের ভেতর দিয়ে এল সাইক্লোনের এক ঝলক উদ্দাম বাতাস। যে কেরোসিনের ডিবাটা একটা রক্তশিখা তুলে জ্বলছিল এতক্ষণ, দপ্‌ করে নিবে গিয়ে সেটা অন্ধকারের ঘূর্ণিতে ভেসে চলে গেল।

আর সেই অন্ধকারে আত্মস্থ হয়ে উঠল রঞ্জন—যেন এতক্ষণের ঘোরটা কেটে গেল তার। মনে হল এই ঘরের সর্বত্র অসংখ্য মাটির পাত্রে সংখ্যাতীত সাপ আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে—বিষাক্ত জ্বালা নিয়ে, একটা দুঃসহ বন্দিত্বে। আছে গোখরো, আছে দুধরাজ, আছে চিতি, আছে চন্দ্রবোড়া, আছে সিঁদুরিয়া, আছে নাম-না-জানা অগণিত মৃত্যুর অনুচর। এই অন্ধকারে হঠাৎ যদি মুক্তি পায়? রঞ্জনের চতুর্দিক চকিতে যেন রাশি রাশি সরীসৃপে আবিল হয়ে উঠল—বাইরের গর্জিত রাত্রি লক্ষ লক্ষ সাপের মতো ক্রুদ্ধ গর্জনে যেন ছোবল মারতে লাগল, চারদিকের ঘনীভূত কালোর ভেতর থেকে বিষ-জর্জর মৃত্যু বুঝি তাকে লক্ষ্য করে আবর্তিত হয়ে উঠল।

আর নয়! আর এখানে থাকলে বিষের জ্বালায় সে ঢলে পড়বে। সে বিষক্রিয়ার প্রথম পর্বটুকু নাগিনী কালোশশীই শুরু করে দিয়েছে। পালাও—এখনো পালাও! এখনো সময় আছে।

কিন্তু কোথায় গেল কালোশশী?

যে চুলোয় খুশি যাক। সেজন্যে ভাবনা করার সময় নেই এখন।

রঞ্জন অন্ধকারেই দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্যের মতো ঝাঁপের দিকে লাফিয়ে পড়ল। কালোশশীর জন্যে মনোবিলাস করবার মতো অপর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। আকাশ গর্জাচ্ছে, বাতাস গর্জাচ্ছে—নদী গর্জাচ্ছে। বহুদিনের অবরোধ ভেঙে ফেলে ক্ষুব্ধ আক্রোশে পৃথিবী গর্জন তুলছে আজ। এইবারে জল নামবে কালা পুখ্‌রির 'ভাঁড়া' দিয়ে। তারপর—

এই মুহূর্তে তাকে যেতে হবে জয়গড়ে। খেয়া না থাক, সাঁতার দিয়ে পার হবে নদী।

বৃষ্টির জোরটা মন্দা হয়ে এসেছে। কোমরভাঙা গোখরোর অন্তিম ছোবলের মতো ঝোড়ো হাওয়া। আর একবার বিদ্যুতের আলোয় রঞ্জন দেখল—কাঁদড়ের ধারে কে যেন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বাতাসে তার রুক্ষ চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে।

থাকুক দাঁড়িয়ে। ওর কান্না আজ রাত্রির এই কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে যাক।

জয়গড়ে এসে পৌঁছুল একটা কিম্ভুত চেহারা নিয়ে।

—কী হয়েছিল?—হতবাক হয়ে জানতে চাইল নগেন।

—সে অনেক কথা—পরে হবে। আপাতত কুমার বাহাদুরের ওখান থেকে চম্পট দিয়েছি। কিন্তু উত্তমা কোথায়—উত্তমা? সকলের আগে এক পেয়ালা গরম চা চাই আমার।

একুশ

খবরটা নিয়ে এল দূত হোসেন।

শাহুর ঘর ছেড়ে পরদিন সকালেই এসে ধাওয়া পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন মাস্টার। শাহু তাঁকে বরখাস্ত করেছেন, তাঁকে ঘোষণা করেছেন প্রত্যক্ষ শত্রু বলে। এ অবস্থায় কাউকে বিব্রত করা উচিত হবে কিনা সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না আলিমুদ্দিন। তবে কি গ্রাম ছেড়েই তাঁকে চলে যেতে হবে? যে পাকিস্তান তাঁর জীবনের ব্রত, যে পাকিস্তান তামাম দুনিয়ার গরীবের দেশ, যেখানে 'বখিলে'র হাতে মানুষের রক্ত মুঠো মুঠো সোনা হয়ে সঞ্চিত হয় না, তাঁর সেই আজাদী প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই এমন করে পিছিয়ে পড়বেন তিনি? গ্রাম থেকে পালাবেন একটা খুনী শয়তান জমিদারের ভয়ে? সভার সামনে হাজার মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, শুধু এইটুকু বিরোধিতার চাপেই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে তাঁকে?

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা পাকিস্থান হামারা—'

একটা অনিশ্চয়ের মধ্যবিন্দুতে মন যখন টলমল করছিল তখন তাঁকে ঘরে টেনে নিয়ে গেল জলিল ধাওয়া।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভয় করবেনা?

আজ আর সেদিনের মতো মদ খায়নি, তবু মাতালের হাসি হেসেছিল জলিল। জীবনটাকে ভুলতে গিয়ে যে নেশার মধ্যে ওরা ডুব দিয়েছে, সে নেশার ঘোর ওদের আর ভাঙেনা। মদ না খেলেও না।—ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়!—সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল।

যথেষ্ট। এর পরে বলবার আর কিছুই নেই। ভাঙনধরা খাড়া

পাড়ির গায়ে যে-মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরে আপনিই সে ঝরে পড়বে স্রোতের মধ্যে, ভেসে যাবে কুটোর মতো। পেছন থেকে কেউ ধাক্কা দেবে কি দেবেনা, দুর্ভাবনার সে-স্তরটা সে পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই।

সুতরাং হোগলার বেড়া আর খড়ের চালে ছাওয়া, মাছ আর জালের পচা আঁশ্‌টে গন্ধে আকীর্ণ এই ঘরে আলিমুদ্দিন আশ্রয় নিয়েছেন। হেতো পাটশাক, মাছের ঝোল, আর রাঙা চালের ভাত দিয়ে যথাসাধ্য অতিথি-সংকার করছে জলিল।

বলেছে, খোদার কাছে দোয়া করুন মাস্টার সাহেব, জাল ভরে যেন মাছ পাই। তা হলেই হবে।

সকালে মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ছিলেন, আর একটু দূরে একটা চাল্‌তে গাছের তলায় বসে পাঁচ বছরের ন্যাংটো ছেলেটাকে নিয়ে জালে গাব দিচ্ছিল জলিল। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল মাস্টারের নমাজের দিকে। ধর্মকর্মের বালাই খুব বেশি নেই সম্প্রদায়টার—দু চার জন ছাড়া 'রোজা'ও বড় কেউ রাখেনা। অবশ্য প্রকাশ্যে সেটা স্বীকার করেনা, আর আড়ালে হাসাহাসি করে বলে; "যে হয়—, সে করে রোজা—"

সুতরাং মাস্টারের নমাজ দেখতে দেখতে জলিল যেন আকস্মিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং জালে রঙ লাগানোর কাজেও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন।

—কী খবর ভাই সাহেব? এত ব্যস্ত যে?

হোসেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাস্টারকে একনিষ্ঠভাবে নমাজ পড়তে দেখে থমকে গেল।

জলিলের দিকে তাকিয়ে বললে, একটু পানি খাওয়াতে পারো মিঞা, এক ঘটি ঠাণ্ডা পানি ?

—এই সকালেই এমন করে পানি ? হয়েছে কী ?

—বলছি পরে। বড় পিয়াস লেগেছে ভাই—ঢের দূর থেকে ছুটে আসছি।

জলিল ব্যস্ত হয়ে জালের কাঠি ছেড়ে দিলে। তার পর তাড়া দিলে ছেলেটাকে।

—যাতো দেলোয়ার। তোর আম্মার কাছ থেকে লোটা ভরে পানি আর গুড় নিয়ে আয় একটু।

—গুড় লাগবেনা, পানি হলেই চলবে।

দেলোয়ার দৌড়ে চলে গেল।

জলিল বললে, ব্যাপার কী মিঞা ?

—সাংঘাতিক।

—কি রকম সাংঘাতিক ?

—খুব দাঙ্গা লাগবে আজ।

—দাঙ্গা ? কোথায় দাঙ্গা ?

—পালনগরের টিলায়।

—সেতো সাঁওতালের আড্ডা। আবার শাহুর লোক-লস্কর যাচ্ছে নাকি তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে ? আবার বুঝি খুনোখুনি হবে কয়েকটা ?

হোসেন মাস্টারের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলে। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে 'শেজ্‌দা' করছেন মাস্টার—সমস্ত মন তাঁর তন্ময় হয়ে আছে। জবাব দেবার আগে ইতস্তত করতে লাগল সে।

এক থাবা ভেলি গুড়, আর এক ঘটি জল নিয়ে ফিরল দেলোয়ার।

এক চুমুকে জলটা নিঃশেষ করলে হোসেন—যেন বুকের ভেতরে একটা মরুভূমি বয়ে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

জলিল অধৈর্য হয়ে উঠল।

—কিসের দাঙ্গা?

হোসেন বললে, যা এ তল্লাটে কোনোদিন হয়নি, তাই।

—খোল্‌সা করে বলো—জলিল আরো উত্যক্ত হয়ে উঠল।

—হিন্দু-মোছলমানে।

হিন্দু-মোছলমানে। জলিল হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছেড়ে তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন।

—কী নিয়ে দাঙ্গা হবে হিন্দু-মোছলমানে?—মেঘের মতো গভীর গলায় মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন।

হোসেন বললে, ব্যাপার এর মধ্যেই ঢের দূর গড়িয়েছে মাস্টার সাহেব। সাঁওতালদের কিছুতে জব্দ না করতে পেরে এবার নতুন রাস্তা নিয়েছেন শাহু। লীগের ঢোল পিটিয়ে লোক জুটিয়েছেন সব, তারপর তাদের নিয়ে মস্‌জিদ বসাতে যাচ্ছেন পাল গাঁয়ের টিলার ওপর। সাঁওতালদের কালীর থান যেখানে আছে ঠিক তার গায়ে। বলছেন, অনেককাল আগে ওখানে নাকি মসজিদ ছিল।

—ছিল নাকি?

—কই, আমরা তো কখনো শুনিনি। এসব ইস্‌মাইল সাহেবের কারসাজী বলে মনে হচ্ছে। ইস্‌মাইল সাহেবই সকলকে ডেকে বলেছে, আমাদের মসজিদ গড়ার কাজে কেউ বাধা দিলে তার মাথা আগে ভেঙে দিতে হবে। পাকিস্তান গড়তে গেলে এইটেই পয়লা কানুন—আগে আমাদের ধর্ম রাখতে হবে।

—কত লোক নিয়ে যাচ্ছে?—ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস্‌ করলেন মাস্টার।

—তা প্রায় শ'খানিক হবে। লাঠি শড়কিও যাচ্ছে।

মাস্টার নিজের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলেন একবার।

—সত্যিই তা হলে ওখানে মস্‌জিদ কখনও ছিল না?

—বোধ হয় না।—হোসেন বললে, মতলব বুঝতে পারছেন না? যে রায়তের সঙ্গে এম্‌নিতে এঁটে ওঠা যাবে না, তাকে জব্দ করতে গেলে এই রকমই কিছু একটা তো চাই!

মাস্টারের সমস্ত মুখটা ক্রোধে হিংস্র হয়ে উঠল।

—মতলব বুঝতে পারছি বই কি। আরো বুঝতে পারছি, এইখানেই এর শেষ নয়। ফতেশা পাঠানের মতো লোকের হাতে যদি কোনোদিন পাকিস্তান পড়ে, তা হলে এই নিয়মেই তা চলতে থাকবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেবে ধর্মের দোহাই; কোরাণ আর খোদাতালার পবিত্র নামের অমর্যাদা করে নিজেদের কাজ হাসিল করবে ইস্‌লামী জিগির তুলে। দেশ জুড়ে আনবে হাঙ্গামা—ঝরবে নিরীহ সরল মানুষের কলিজার খুন।

হোসেন বললে, খবর পেয়েই তো ছুটে এলাম মাস্টার সাহেব। কী করা যায়? চোখের সামনে মিছিমিছি খুন খারাপী হবে—দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলবে!

—শুধু চোখের সামনে নয়, সারা দেশেও ছড়িয়ে পড়বে। তারপরে —ঝড়ের আকাশের মতো কী একটা ঘন হয়ে এল আলিমুদ্দিনের মুখে: ধর্মের জন্যে জান্ কোরবান করলে মুসলমানের বেহেস্ত্। মস্‌জিদের একখানা ইট তাকে রাখতে হবে পাঁজরার একখানা হাড় দিয়ে। কিন্তু ধর্মের নাম নিয়ে এই শয়তানী বরদাস্ত করা যাবে না। হোসেন, জলিল —যেমন করে হোক এ দাঙ্গা রুখতে হবে।

জলিল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আধ-খানা বাঁশ কুড়িয়ে নিলে সে।

—হাঁ মাস্টার সাহেব, দাঙ্গা রুখে দেব আমরা।

—তোমার দলবল তৈরী আছে হোসেন ?

—ডাকলেই এসে পড়বে।

—চলো তা হলে, একটু দেরী নয় আর—মাস্টার পা বাড়ালেন।

—আমিও যাব বা-জান ?—কী বুঝেছে কে জানে, উৎসুক মিনতি-ভরা গলায় হঠাৎ অনুমতি চাইল দেলোয়ার।

মাস্টার ফিরে তাকালেন দেলোয়ারের দিকে। অযত্নমলিন ক্ষুধাশীর্ণ শিশু মুখখানা এই মুহূর্তে যেন আশ্চর্য সুন্দর মনে হল তাঁর। আজাদ পাকিস্তানের অঙ্কুর।

গভীর স্নেহে দেলোয়ারের মাথার ওপর হাত রাখলেন আলিমুদ্দিন।

—আগে আমরাই চেষ্টা করে দেখি বাপ। যদি না পারি, আমাদের কাজের ভার তোমাদের ওপরেই রইল। আমাদের যা বাকী থাকবে, তা তোমাদেরই শেষ করতে হবে যে !

* * *

উত্তমা হাসছিল।

শিরশিরে হাওয়ায় চোখ মেলল রঞ্জন। সারা গায়ে এখনো জ্বালা—জ্বর জ্বর ভার লাগছে মাথায়।

—উঠে বসুন। চা এনেছি আপনার জন্যে।

রঞ্জন উঠে বসল।

—কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলো তো ?

—তা মন্দ হবেনা। রাত আড়াইটে থেকে সাড়ে দশটা—পুরো আটঘণ্টা।

—বলো কি ! সাড়ে দশটা এখন !

—কী করা যাবে, বেলাটাকে ঠেকানো গেলনা!—কৌতুকভরে উত্তমা

বললে, আমাদের হাত নেই তো ওর ওপরে। চা খেয়ে চান করতে যান, রান্না তৈরী। . মা তাড়া দিচ্ছেন।

—আজ আর চান করবনা। কাল সারা রাত যা ভিজেছি—রঞ্জন উত্তমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলে: সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা।

—সে আর বলতে হবেনা। রাতভর ছট্‌ফট্‌ করেছেন, আমাকেও ঘুমুতে দেননি।

—সে কি কথা! তুমিও জেগে বসেছিলে নাকি?

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল উত্তমা: কী করব বলুন। কিন্তু এতে করে একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল রঞ্জনদা। আপনার পুঁথির সঙ্গে এখনো মাটির মিল হয়নি।

—হেতু?

—একটা রাত বৃষ্টিতে ভিজেই এমন করে শুয়ে পড়লে তো চলবেনা। যাদের ভালো আপনি করতে এসেছেন, তাদের কিন্তু সাত দিন ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও এক ফোঁটা সর্দি হয়না। যাই বলুন, শরীরে-মনে এখনো ঠাকুরবাবু হয়েই আছেন। ঠাকুর তো রয়েইছেন, বাবুগিরিটাও ছাড়তে পারেননি।

—হুঁ!—রঞ্জন বিষণ্ণ হয়ে গেল: আরো কিছু সময় লাগবে। পুরো পেরে উঠব কিনা বুঝতে পারছিনা।

—না পারলে মাপ নেই। তা হলে দুটো পথ খোলা আছে। হয় অজয়দার মতো দেশের ভালো করবার আশা ছেড়ে সরে পড়তে হবে, আর নইলে—উত্তমা উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল: নন্দর মতো গাছে গিয়ে উঠতে হবে।

হাসিতে যোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু রঞ্জন পারলনা। একটা কঠি

ধিক্কারের ঘূর্ণির মতো হাসিটা আবর্তিত হয়ে গেল তার চারদিকে। শ্রেণীচ্যুতি শুধু মনেই নয়—দেহেও। রোদে-জলে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে—বরিন্দের মাঠের তালগাছের মতো মাথা উঁচু করে নিতে হবে বজ্রের আঘাত। লাল মাটির দেশের এই নিয়ম।

কিন্তু উত্তমা! মিতাকে জানে, বিপ্লব-যুগে স্বতপাদিকে দেখেছে, মনে আছে সীতাকে, কাল রাতে ঝরেছে কালোশশীর অর্থহীন চোখের জল। কিন্তু এ একেবারে আলাদা। ইমোশন নেই, আদর্শ আছে; স্বপ্ন নেই—প্রত্যয় আছে। এর কাছে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে খতিয়ে দেখতে হয়, ভয় করে কখন কোন্ দুর্বলতার ওপর একটা খড়্গের মতো আঘাত হেনে বসবে।

—যান, স্নান করুন—

—কিন্তু যদি জ্বরটর—

—কিচ্ছু হবেনা। আপনারও দেখছি অজয়দার বাতাস লেগেছে। আপনারা শহরের লোকেরা সবাই বুঝি এক রকম!

—না, অতটা অপবাদ দিয়োনা। অমন কাপুরুষ আমি নই।

—কাপুরুষ!—খানিকটা স্বগতোক্তির উচ্চারণ করল উত্তমা—চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ম্লান ভাবে অল্প একটু হাসল: কাপুরুষ না হলে গিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারলনা!

সুরটা কেমন নতুন ঠেকল উত্তমার গলায়। যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, তার মুখের ওপর কোথা থেকে একটা রাঙা আলো পড়েছে এসে।

—দেখেছেন মজা! শহরের লোকই এইরকম! এত কথা সাজিয়ে সাজিয়ে বলেছিলেন—এত আবৃত্তি আর গান! কোনোদিন ভুলবনা, এই গ্রাম, এই দিনগুলোকে চিরদিন মনে রাখব!—উত্তমা যেন নিজের সঙ্গে

কথা কইতে লাগল : কিন্তু ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবারও মনে পড়লনা! সাধে কি শহরের লোকের ওপর অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা আসে?

একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল রঞ্জনের মনে। অজয় পালিয়ে গিয়ে উত্তমাকে চিঠি লেখেনি। কিন্তু কী এমন অন্যায় হয়েছে—কীইবা অস্বাভাবিক হয়েছে তাতে? তার জন্যে এত ক্ষোভ কেন উত্তমার? রঞ্জন একটা স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরল উত্তমার দিকে। বার্ণার্ড শ'র ক্যাণ্ডিডা? দুর্বলের ওপর শক্তিময়ীর আকর্ষণ? শেষ পর্যন্ত অজয়ই জিতে গেল নাতো?

—উঠুন, আর বেলা করবেন না—

স্বর বদলে গেছে উত্তমার। হাঁ—বোধ হয় ভালোই করেছে অজয়। এ আগুনকে বুকে বয়ে কতখানি পথ চলতে পারত? কতক্ষণইবা সহ্য করতে পারত সে?

—তা হলে নিতান্তই স্নান করব আজ?

—করবেন বই কি। আজ আপনার ছুটি নেই। দুপুরে অনেক লোক আসবে—তাদের বহু কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। কুড়েমি করবার একদম সময় নেই—বুঝেছেন?

—বুঝেছি—হতাশ হয়ে বললে রঞ্জন। আর সেই সময় ঝড়ের বেগে বাইরে থেকে নগেন এসে ঢুকল ঘরে।

রঞ্জন চমকে উঠল।

—একেবারে ভগ্নদূতের অবস্থা দেখছি ডাক্তার!

—ব্যাপার সাংঘাতিক! সাঁওতালদের সঙ্গে শাহু দাঙ্গা বাধিয়েছে পালনগরে।

—আবার সেই টুল্‌কু মাঝিদের সঙ্গে?

—না, শ্রাদ্ধ গড়িয়েছে অনেকদূর। দাঙ্গা লেগেছে হিন্দু-মুসলমানে।

হিন্দু-মুসলমানে! রঞ্জন লাফিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে। উত্তমা চমকে উঠে পাংশু মুখে চেয়ে রইল।

—একটা বাড়্তি সাইকেল জোটাতে পারো ডাক্তার ?

—এক্ষুণি।

রাতারাতি কালীর থানের পাশে কে কখন টিনের চালা তুলে ফেলল—টেরও পায়নি সাঁওতালেরা। এমনিতেই কালীর থান গাঁ থেকে একটু দূরে—একটা অন্ধকার অশথ্ গাছের তলায়। তার ওপর সারাদিনের খাটনির পরে যখন ওরা গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে—তখন রাতে ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সাধারণ শব্দ-সাড়ার কাজ নয়।

ওদের খেয়াল হল সকালে। আজানের শব্দে।

কালীর থানের কাছে টিনের চালাঘরের সামনে আজান দিচ্ছেন হাজী সাহেব। চারপাশে দলে দলে জড়ো হয়েছে ভক্ত মুসলমানের দল—সেই আজানের আকর্ষণে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল সাঁওতালেরা। তারপর দু চার জন করে এগোল সেদিকে।

—কী এসব ?

জনতার একজন গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, কী এসব, জানো না ? মস্‌জিদে আজান দেওয়া হচ্ছে।

—মস্‌জিদ ?

—হাঁ, মস্‌জিদ।

—কবে হল মস্‌জিদ ?

—বরাবরের।

বরাবরের! সাঁওতালেরা একবার এ ওর দিকে তাকালো।

—কই, আমরা তো কিছু জানতাম না।

—তোমাদের না জানলেও চলবে।

—আমাদের কালীর থানের গায়ে মস্‌জিদ! কোনদিন তো কেউ নমাজ পড়েনি এখানে।

—আজ থেকে পড়বে। যাও—সরে পড়ো সব এখান থেকে—জবাব দিলে ইস্‌মাইল।

—তা হলে আমাদের কালীপূজোর কী হবে?—সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সাঁওতাল জানতে চাইল: আমরা এখানে পূজো করতে পারব না, ঢোল বাজাতে পারব না—

—তোমাদের ওই ভূতুড়ে কালীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিলের জলে ফেলে দাও। খোদাতালার মস্‌জিদের কাছে ও সব বুত্‌-পরস্ত চলবে না আর!

বুড়োর চোখ দুটো ধিকি ধিকি জলে উঠল, কিন্তু আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেনা। আস্তে আস্তে সরে এল গাঁয়ের দিকে। একশো লোক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নামাজ পড়তে লাগল।

গাঁয়ে ফিরেই নাকাড়া বাজিয়ে দিলে সর্দার মাঝি। পঞ্চায়েৎ। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে নাকাড়ার শব্দ দিকে দিকে রণ-আহ্বান ঘোষণা করে দিলে।

যারা নামাজ পড়ছিল, তারা নামাজ শেষ করেই উঠে গেলনা। তারা জানে, এ শুধু আরম্ভ—শেষ নয়; এর পরেই আসবে সত্যিকারের কাজ। গোল হয়ে মস্‌জিদের চারপাশে বসে রইল তারা।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরল মোড়ল। একা নয়—সঙ্গে আরো জন-তিনেক অনুচর।

—এখানে কোনোদিন মস্‌জিদ ছিলনা—সর্দার মাঝি জানালো।

—বরাবর ছিল—তেজালো গলায় জবাব দিলে ইস্‌মাইল।

—এইখানে মস্‌জিদ থাকবেনা—মোড়ল আবার বললে।

—আলবৎ থাকবে।

—তা হলে আমাদের পূজো হবেনা।—মোড়ল ধীর কঠিন স্বরে বললে, আমরা এখানে থাকতে দেবনা মস্‌জিদ।

—কী করবে তবে?—বুক চিতিয়ে জানতে চাইল ইস্‌মাইল। মাথার বিশৃঙ্খল চুলগুলো দু পাশ দিয়ে বন্য আকারে নেমে এসেছে, হাতের মুঠি দুটো বন্ধ হয়ে এসেছে আপনা থেকেই।

—ভেঙে দেব।—মোড়লের স্বর তেম্‌নি শান্ত আর কঠিন।

—ভেঙে দেবে—মস্‌জিদ ভেঙে দেবে!—আকাশ ফাটানো চিৎকার করে উঠল ইস্‌মাইল: ভাই সব, মোছলমানের বাচ্চা হয়েও এর পর চুপ করে আছো তোমরা?

—আল্লা-হো-আকবর—

একটা পৈশাচিক ধ্বনি উঠল করুণাময় ঈশ্বরের নাম নিয়ে। কোথা থেকে একখানা তরোয়াল কে ইস্‌মাইলের হাতে বাগিয়ে দিলে—হিংস্র উল্লাসে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে উন্মত্তের মতো ইস্‌মাইল বললে, চলে আয়—কে মস্‌জিদ ভাঙবি চলে আয়—

এমন সময় পেছনের টিলার ওপর ডুম্ ডুম্ শব্দে নাকাড়া বেজে উঠল।

মন্ত্রবলে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠছে ষাট-সত্তর জন সাঁওতাল। কারো হাতে তীর ধনুক, কারো বল্লম, কারো লাঠি। বুড়ো থেকে দশ বছরের বাচ্চা—বাদ নেই কেউ। এমন কি, টুল্‌কু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়াও আছে তাদের মধ্যে। পেছনে মেয়েরা—তাদের হাতেও তীর-ধনুক।

তার পরে মুহূর্ত মাত্র।

একটা লাঠি উঠে এল মোড়লের মাথা লক্ষ্য করে—আর একটা টাঙ্গি

চট্ করে রুখে দিলে তাকে। মোড়ল তার সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে চলে এল নিজের দলের মধ্যে। আকাশে বাহু তুলে রক্ত চোখে গর্জন করে বললে, মার্—

ত্রিশজন সাঁওতাল হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তীর জুড়ল। ধারালো ইস্পাতের ফলাগুলো রোদে ঝক ঝক করে উঠল।

কিন্তু তার আগেই বহু কণ্ঠের একটা চিৎকার উঠেছে দূরান্তে। মুহূর্তের জন্যে যুযুৎসু দুদলই তাকালো সেই শব্দের দিকে। চিৎকার করতে করতে পঞ্চাশ ষাট জন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মাঠের ভেতর দিয়ে: থামাও—দাঙ্গা থামাও—

হাওয়ায় ঘাস দোলার আওয়াজ অবধি পাওয়া যায়, এম্‌নি স্তব্ধতা। সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো ইস্‌মাইল—মোড়ল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল। গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল দু দলের মধ্যে।

যুযুৎসু দুটি বাহিনীর মাঝখানটিতে—সংগ্রাম ক্ষেত্রে দুহাত তুলে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। পেছনে পেছনে আরও জনত্রিশেক লোক। কিছু ধাওয়া—কিছু বাদিয়া হোসেনের দল।

আলিমুদ্দিন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, মিথ্যে খুন-খারাপীর মধ্যে কেন যাচ্ছ ভাই সব? মাতব্বরদের নিয়ে বৈঠক হোক—মস্‌জিদ এখানে আদৌ ছিল কিনা সেটা ঠিক হোক—তার পরেই যা হয় হবে।

ইস্‌মাইলের চোখ দুটো ক্রোধের জ্বালায় ঠিকরে পড়তে লাগল।

—আলবৎ ছিল মস্‌জিদ, হাজারবার ছিল। তুমি কাফের—এ সব ব্যাপারে কেন মাথা গলাতে এসেছো মাস্টার?

কিন্তু ইস্‌মাইলের কথার শেষটা কেউ শুনতে পেলনা। তার আগেই ধাওয়া আর হোসেনের দল সমস্বরে গর্জন তুলল: কাফের! মুখ সামাল্ ইস্‌মাইল সাহেব!

ইস্‌মাইল থর থর করে কাঁপতে লাগল : নিশ্চয় কাফের !

হোসেন বললে, ইস্‌মাইল সাহেব, এ শাহুর বৈঠকখানা নয়। ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে জবান সামলাও। নইলে এখন থেকে মাথা নিয়ে ফিরতে পারবেনা।

ইস্‌মাইল একবার তাকালো চারদিকে। তার অপমানে তার দলবলের মধ্যে তো চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি, এতগুলো মুখ তো প্রতিহিংসায় কালো হয়ে যায়নি। হঠাৎ মনে হল কোনো শক্ত মাটির ওপরে পা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে নেই—সেখানেও টলমল করছে ভাঙন-ভাঙা। আরো অনুভব করল—সকলের দৃষ্টি একান্তভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে আলিমুদ্দিনের প্রতিই—তার দিকে নয় !

অবস্থাটা অনুমান করে হাজী সাহেবই এগিয়ে এলেন সম্মুখে।

—কী হচ্ছে এসব ? মোছলমানে মোছলমানে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবার কী মানে হয় ? মাস্টার সাহেব কী বলছেন—শোনা যাক।

—মাস্টার আবার—ইস্‌মাইল বলতে গেল।

—আপনি চুপ করুন—চীৎকার উঠল জনতার মধ্য থেকে : আমরা মাস্টার সাহেবের কথাই শুনতে চাই।

পায়ের তলায় যে ভাঙা তটের শিথিল ভিত্তি অনুভব করছিল, এবার যেন সেটা শুদ্ধ নদীর জলে ধ্বসে পড়ল ইস্‌মাইল। শাহুর বৈঠকখানা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় মাস্টারকে, বরখাস্ত করা যায় চাকরী থেকে—কিন্তু—

ওই কিন্তুই সর্বনেশে ! মাটির গভীরে যেখানে আলিমুদ্দিনের অলক্ষ্য শিকড় গিয়ে পৌঁছেছে, সেখান থেকে কে তাকে উৎপাটন করবে ?

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ইস্‌মাইল দাঁড়িয়ে রইল।

আলিমুদ্দিন ফিরে তাকালেন সাঁওতালদের দিকে।

—এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো তোমরা মিছিমিছি তোমাদের ধর্মে কর্মে কেউ ব্যাঘাত করবে না।

তীরগতিতে এই সময় আরো দুটো সাইকেল এসে পৌঁছুল। নগেন আর রঞ্জন। কলস্বরে সম্বর্ধনা করে উঠল সাঁওতালেরা। এতক্ষণে যেন নিজেদের লোক পেয়েছে নির্ভর করবার মতো।

আলিমুদ্দিন হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

—আসুন আসুন। বড় ভালো হয়েছে। সকলে মিলেই একটা ফয়শালা করে ফেলা যাক।

কালো মুখে, ক্ষিপ্ত চোখের অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ইস্‌মাইল ক্রমশ ভিড়ের পেছন দিকে হটে যেতে লাগল। অবিলম্বে খবর দিতে হবে শাহুকে—অন্য উপায় দেখতে হবে এইবার।

আলিমুদ্দিন ততক্ষণে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন।

—ভাই সব, আশেপাশের গাঁয়ে অনেক প্রবীণ মাতব্বর আছেন। তাঁরাই ভালো জানেন—এখানে কোনদিন মস্‌জিদ ছিল কিনা, অথবা কবে ছিল। যদি থাকে—

হাজী সাহেবের একটা টাট্টু ঘোড়া বাঁধা ছিল হিজল গাছের সঙ্গে। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা খুলে নিলে ইস্‌মাইল—তারপর দ্রুত বেগে সেটাকে হাঁকিয়ে দিলে পালনগরের উদ্দেশ্যে।

বাইশ

ঝড়ের মেঘটা থমথমে হয়ে উঠেও দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বেশি কিছু বক্তৃতা হল না—দরকারও ছিল না তার। সাদা-সিদে সহজ আলোচনা শান্তভাবেই শুনে গেল দুপক্ষ। সত্যিই তো, নিছক একটা ঝোঁকের মাথায় এমন ভাবে কি খুন খারাপী করবার মানে হয় কিছু? জান জিনিসটা নিতে এক লহমাও সময় লাগে না, কিন্তু হাজার বছর চেষ্টা করলেও যে আর তা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, যেন খেয়াল থাকে কথাটা।

তা হলে রফা?

দশখানা গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বর ডাকা হোক। সাবুদ করা হোক প্রাচীন যাঁরা আছেন আশেপাশে। পরচা দেখা হোক, দেখা হোক নক্‌শা। মস্‌জিদ যদি থাকে এখানে, আবার গড়ে উঠবে; পীরের দরগা নাকি ছিল, আবার নতুন করে তা হলে চেরাগ জ্বলবে তাঁর। তখন যদি কেউ বাধা দেয়, তা হলে অনেক সুযোগ মিলবে লাঠির জোর পরখ করবার। আর যদি না থাকে—বেশ তো, চুকে-বুকেই গেল সব।

সম্মতির মাথা নাড়ল দুপক্ষই।

কৃতজ্ঞ চিত্তে রঞ্জন বলেছিল, মাস্টার সাহেব, সময় মতো আপনি এসে পড়েছিলেন বলেই রুখে গেল দাঙ্গাটা।

আলিমুদ্দিন হেসেছিলেন—অত্যন্ত ক্লান্ত, বিমর্ষ হাসি।

—কিন্তু সত্যিই যদি এখানে মস্‌জিদ থেকে থাকে, তা হলে এর পরে

হয়তো আমাকেই দাঙ্গায় নামতে হবে। পীরের জায়গা, খোদার জমিন্ আমরা এমনি ছাড়ব না।

—তখনকার ভার আমরা নিচ্ছি—নগেন জবাব দিয়েছিল: কিন্তু আজ আপনি যা করলেন এটাকে এমনি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে—

—অবিশ্বাস্য! কেন?—মুহূর্তে ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছিল মাস্টারের চোখ: আপনাদের কি ধারণা যে দাঙ্গা বাধানোটাই মুসলমানের কাজ?

—না, তা বলছি না—নগেন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল: মানে, আমার বলবার কথা ছিল—

আলিমুদ্দিন তিক্ত স্বরে বলেছিলেন, জানি। আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের কী অভিযোগ সব আমার জানা আছে। আপনারা বলেন, আমরা অসহিষ্ণু, অন্য ধর্মকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তা নয়! আমাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই আমরা তার মর্যাদা রাখবার জন্যে সহজে প্রাণ দিতে পারি। ইস্‌লামের সত্যই তো তাই। যেচে আমরা কাউকে ঘা দিতে চাই না, কিন্তু কেউ আমাদের ওপর চড়াও হলে তাকেও আমরা ক্ষমা করব না।—আলিমুদ্দিনের চোখ দুটো আচমকা এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করেছিল: দিনের পর দিন আমাদের তুচ্ছ করেননি আপনারা? দূরে সরিয়ে দেননি যবন বলে?—এক বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যার অপমানের ক্ষত আকস্মিকভাবে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল আলিমুদ্দিনের বুকের ভেতর: আপন বলে যতবার আপনাদের দিকে আমরা হাত বাড়াতে গেছি, ততবার ঘৃণা করে সে হাত ঠেলে দেয়নি আপনাদের সমাজ?

কী থেকে কথাটা কোথায় গিয়ে পৌছুল! কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আলিমুদ্দিন তিক্ততম স্বরে বলেছিলেন, তাই তো পাকিস্তান চাই! সমান শক্তি না নিয়ে দাঁড়ালে আমাদের কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে শিখবেন না আপনারা। সে শিক্ষা আপনাদের দরকার।

রঞ্জন বলেছিল, ঠিক। আপনাদের দাবীকে আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভুল বোঝাটা দুপক্ষেই হয়েছে—এক হাতে তালি বাজেনি। ওর মূলটা আছে ইতিহাসের আড়ালে। সে কথা যাক মাস্টার সাহেব। আপনি একদিন সময় করে আসুন না জয়গড়ে। অনেক কিছু আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে।

—কী আলোচনা ?

—আপনি একটা কিছু গড়তে চাইছেন—আমরাও চাইছি। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত এক সঙ্গে এগোতে পারি আমরা। সেই সুযোগটা বা ছাড়ব কেন ?

—অনেকদূর পর্যন্ত একসঙ্গে এগোব!—চোখ বুজে কিছুক্ষণ যেন কী চিন্তা করে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন: সে কথা মন্দ বলেন নি। কিছুদিন না হয় এক টার্গেটেই প্র্যাকৃটিস করা যাক। তারপর মুখোমুখি দাড়ানো যাবে রাইফেল নিয়ে।

রঞ্জন বলেছিল, মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইনা আমরা—পাশাপাশি পা ফেলে এগোতে চাই সম্মুখের দিকে। আজ আপনাদের না পাই, দুদিন পরে পাবোই।

—দুরাশা করছেন। তেলে-জলে মিশ খায় না। খাবেও না কোনোদিন।

রঞ্জন হেসে বলেছিল, শুধু একটি কথায় আমার প্রতিবাদ আছে মাস্টার সাহেব! তেল-জল কথাটা আমি মানি না। দুটোই জল—একটা জমজমের, আর একটা গঙ্গার। শুধু মাঝখানে আরব সাগরের ফারাক। ওটুকু পার হতে পারলেই দুটো জল এসে এক সঙ্গে মিশবে।

আলিমুদ্দিন ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন, কিন্তু এই আটশো বছরেও কেউ তা পারেনি।

—আটশো বছর ধরে যা পারা যায়নি, তা আজও পারা যাবেনা এটা কোনো যুক্তিই নয় মাস্টার সাহেব। মানুষ পৃথিবীতে পা দিয়েই আকাশে উড়তে চেয়েছে কিন্তু এরোপ্লেন গড়তে তার সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। সেই জন্যেই আমরা আশাবাদী। বলুন, কবে আসছেন জয়গড়ে?

নগেনের ঘরে বসে আরো জোরালো, আরো তীব্র কণ্ঠে আলিমুদ্দিন বললেন, পাকিস্তান আমাদের চাই। কিন্তু ওই শাহুর মতো লোকের জন্যে নয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, পণ্ডিত হোক, আর মৌলবীই হোক—শয়তান আর অত্যাচারীর জায়গা নয় পাকিস্তান। আল্লার রসুলের নাম নিয়ে আমরা গড়ব আজাদী দুনিয়া—সমস্ত শঠ-বঞ্চকদের নিকাশ করব সেখান থেকে। গরীবের রক্ত যারা শুসে খায়, তাদের টুঁটি টিপে ধরব!—বলতে বলতে মাস্টারের হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে এল—মনে হল যেন ফতে শা পাঠানের গলাটাকেই পিষে ধরছেন তিনি।

নগেন বললে, সে পাকিস্তানে আমরা সবাই পাকিস্তানী হতে রাজী আছি মাস্টার সাহেব। অত্যাচারী হিন্দুস্থান আমাদেরও দুশ্‌মন। তাই সকলের আগে গরীবকে আমরা একসঙ্গে মেলাতে চাই, কোমর বেঁধে দাঁড়াতে চাই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আমাদের 'কৃষাণ-সমিতি'র কথা নিশ্চয় শুনেছেন আপনি।

আলিমুদ্দিন বললেন, শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করিনা।

—কেন করেন না?

—ও-ও আপনাদের একটা চক্রান্ত। মুসলমানের দল ভাঙানোর ফন্দি।

রঞ্জনের মুখ লাল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে : একটু অবিচার হচ্ছে না মাস্টার সাহেব ?

—অবিচার ?—ঘৃণাভরে আলিমুদ্দিন বললেন, কংগ্রেসে একদিন আমিও ছিলাম—স্বাধীনতার জন্যে জেল আমিও খেটেছি, আমার মাথাতেও পুলিশের লাঠি পড়েছে অনেকবার। আমি জানি, কিসে কী হয়। ভালো ভালো কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু মুসলমানের দাবীর প্রশ্ন যখনি উঠেছে, তখনি কেমন করে তা দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে সে কথাও আমি ভুলিনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে রঞ্জন বললেন, মতভেদ রইল। তবুও একটা জিনিস বিশ্বাস করুন মাস্টার সাহেব, দিন বদলায়।

—হয়তো বদলায়। কিন্তু এখনো তার প্রমাণ পাইনি।

—প্রমাণ তো চাননি!—রঞ্জন হাসল : শুধু অভিমান করে দূরে সরেই দাঁড়িয়ে আছেন। এসে একবার দেখুন না আমাদের ভেতর।

—এসে কী দেখব ?—উদ্ধত স্বরে আলিমুদ্দিন বললেন, চাপা পড়ে যাব আপনাদের তলায়।

নগেন বললে, চাপা পড়বেন কেন ? আমাদের এখানকার কৃষাণ সমিতিতে হিন্দুর চাইতে মুসলমানই বেশি। তারা নিশ্চয় আপনার পেছনেই থাকবে।

আলিমুদ্দিন চুপ করলেন। কিছু একটা ভেবে স্থির করে নিতে চাইলেন নিজের মধ্যে। তারপর মৃদু হাসলেন : যদি সেই সুযোগে আপনাদের কৃষাণ সমিতিকে আমাদের লীগের প্ল্যাটফর্ম করে নিই ?

—নিন্ না করে!—রঞ্জনও হাসল : গরীবের জন্যে যে লড়বে সেই আমাদের দল। সে নামে মুসলিম লীগ হোক, কৃষাণ সমিতি হোক, হিন্দু মহাসভাও হোক—কিছু আসে যায় না।

আবার চুপ করে রইলেন আলিমুদ্দিন। চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটছে কপালে, অর্ধমনস্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরের ছায়া-রৌদ্রে-চঞ্চল মহুয়া বনের দিকে—ঝলক-লাগা টাঙ্গন নদীর নীল ধারায়। তারপর ধীরে ধীরে মুক্তি দিলেন বুক-চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসকে।

—নাঃ, লোভ দেখাচ্ছেন আপনারা। ও সবের মধ্যে আর আমি নেই। এর ফলে শুধু আমার পাকিস্তানের লক্ষ্য থেকেই আমি ভ্রষ্ট হবো। সোস্যালিজ্‌মের বুলি কপ্‌চে মুস্‌লিম লীগকে স্যাবোটেজ করতে চান আপনারা।

রঞ্জন হাসল: কিন্তু আপনি যা চাইছেন, তাও তো সোস্যালিজম্ ছাড়া কিছু নয়।

—ইস্‌লামী সোস্যালিজম্। শরিয়তী আইনে সে চলবে। ধর্মকে সামনে রেখে সে এগিয়ে যাবে। আপনাদের মত ধর্ম মানে না, মুসলমানের সঙ্গে রফা হতে পারে না আপনাদের।

—ধর্ম না মানলেও আমাদের মত কারু ধর্মে কখনো হাত দেবেনা মাস্টার সাহেব। ধর্মটা ব্যক্তিগত।

বিরক্ত হয়ে আলিমুদ্দিন বললেন, আর আমাদের ধর্ম সমাজগত। এ সব বলে ভোলাতে পারবেন না। আমাদের লক্ষ্য সোজা—যা চাই, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি। যদি মেনে নিতে পারেন আসুন। নইলে এ নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আজ বরং আমি উঠি—আলিমুদ্দিন চৌকি ছেড়ে দাঁড়ালেন।

—সে কী হয়! এখনি উঠবেন কেন?—নগেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—বাঃ, ফিরতে হবেনা? ঢের বেলা হয়ে গেছে।

—তা হোক্ না। খেয়ে যাবেন এখান থেকে।

—খেয়ে যাব?—আলিমুদ্দিন যেন আঁত্‌কে উঠলেন।

—সেই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে। এতদূর থেকে এসে না খেয়ে ফিরে যাবেন, তা কি হয় ?

মুখের চেহারাটা শক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের : নাঃ, থাক।

—কেন ? আপনি কি হিন্দুর বাড়িতে খান না ?—রঞ্জন জানতে চাইল।

আলিমুদ্দিন খর দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে। ক্ষতটায় আবার নিষ্ঠুর আঁচড় পড়ছে একটা। বিতৃষ্ণাভরা অদ্ভুত গলায় বললেন, খেতাম এককালে। কিন্তু এখন আর খাই না। দেখলাম, যাদের সঙ্গে জাত মেলে না, তাদের সঙ্গে পাতও মিলবে না কোনোদিন।

নগেন শশব্যস্তে বললে, এখানে ও ভয় রাখবেন না। আমাদের কোনো জাতই নেই।

—আপনারা মুসলমানের রান্না খান ?

নগেন উত্তেজিত হয়ে বললে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। অমন মোগলাই রান্না থেকেই যদি বঞ্চিত হলাম, তা হলে আর বেঁচে থেকে সুখ কী ?

নিঃশব্দে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন, তবে খাব। কিন্তু আজ নয়। অনেক কাজ আছে—এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

—তবে এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার চার্জ এখন আর আমাদের ওপর নেই—ও ভারটা আমার বোন নিয়েছে। তাকেই ডাকি।—নগেন স্বর চড়িয়ে ডাকল, উত্তমা—

—আসছি—উত্তমার সাড়া এল।

—আবার কেন—দ্বিধাভরে বলতে গিয়েও থেমে গেলেন আলিমুদ্দিন।

দোরগোড়ায় উত্তমা এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনি চিরাচরিত অভ্যস্ত তার চেহারা। গাছকোমর বাঁধা, গালে-কপালে স্বেদবিন্দু।

নগেন বললে, এই ছাখ্, মাস্টারসাহেব না খেয়ে পালাচ্ছেন।

—সে কি কথা? এত কষ্ট করে রাঁধছি, পালালেই হল!

সংস্কারবশেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন। এই মেয়েটির কাছে রূঢ় হয়ে উঠতে তাঁর বাধল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, অনেক কাজ আছে—আজ থাক।

—আমার হয়ে গেছে, বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না দাদা।

দাদা! শিউরে উঠলেন আলিমুদ্দিন—বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকালেন উত্তমার দিকে। কল্যাণী! উত্তরবঙ্গের এক মফঃস্বল শহরে বর্ষার রাত্রে যে চিরদিনের মতো কালো অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল, আজ কোথা থেকে সে এমন করে প্রাণ পেয়ে উঠল! কোন্ মৃত্যুর আড়াল থেকে আলিমুদ্দিন শুনলেন এই প্রেতকণ্ঠ! একটা তিক্ত-যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে উঠল বুকের ভেতর। দাদা!

মৃত্যুর ওপার থেকে আবার ভেসে এল কল্যাণীর প্রেতস্বর।

—আধঘণ্টার মধ্যেই খেতে দেবে।

আলিমুদ্দিন তেমনি তাকিয়ে রইলেন। উত্তমার মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ—আর ধীরে ধীরে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। আর সেই শূন্যতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কতগুলো দিন—কতগুলো বৎসর—জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো উড়ে চলেছে ঝাঁক বেঁধে। তারপর সেগুলো যখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যেন পাথরের বেদীর ওপর হিন্দুর একটা মূতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে মূর্তি কল্যাণীর!

কিন্তু আলিমুদ্দিন তো পৌত্তলিক নন। নিষ্প্রাণ প্রতিমা শুধু নিতেই

জানে—দেবার শক্তি কোথায় তার! একবার অজ্ঞানের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন, তার দাম তো শোধ করে দিতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়! আবার —আবার কি সে ভুল তিনি করবেন? সেদিনের সেই অসহ্য যন্ত্রণার পরেও কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি তাঁর? না, নিজেকে সংযত করতে হবে এবার।

পারলেন না।

উত্তমা বললে, আর একটু বসুন দাদা, খুব শিগ্‌গিরই আপনাকে ছেড়ে দেব।

যা বলা উচিত ছিল, তার উল্টোটাই বললেন আলিমুদ্দিন। বহুদিন আগে যে কংগ্রেসকর্মীর কবরের ওপর তিনি শেষ মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ তাঁর গলার ভেতর থেকে তার আত্মাটাই কথা কয়ে উঠল।

—আচ্ছা, বেশ!—যেন ঘোরের মধ্য থেকে জবাব দিলেন।

যেমন সহজে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল উত্তমা, তেমনি সহজেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ভেসে চললেন আলিমুদ্দিন। এ হওয়া উচিত ছিল না, কোনো প্রয়োজন ছিল না এর। যে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে একদিন তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন, কখনো কি জানতেন যে একটা সামান্য আকর্ষণেই আবার যেখানকার সেইখানেই ফিরে আসবেন তিনি?

কখনো কি কল্পনা করেছিলেন তাঁর মন এত দুর্বল, এমন হীনশক্তি? একটা অন্ধ, ব্যর্থ আক্রোশে নিজেকেই তাঁর আঘাত করতে ইচ্ছে হল। কবে কোন্ কালো সমুদ্রের ক্ষুব্ধ আক্রোশ পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটা শিলাখণ্ডের ওপর—চক্ষের পলকে সেখান থেকে অন্তহীন তরঙ্গের মধ্যে আছড়ে পড়লেন তিনি!

এতক্ষণ পরে কাণে এল, নগেন হাসছে।

—দেখলেন তো! ইচ্ছে করলেই এত সহজে পালানো যায় না!

—তাই দেখছি!—ক্লান্ত পীড়িত স্বরে যেন স্বগতোক্তি করলেন মাস্টার।

বাইরের মহুয়া বনে ঝলক লাগা রোদ। টাঙ্গন নদীর নীল জল শিথিল বেদনার মতো বয়ে চলেছে। তারবাঁধা দুপুরের ভেতর থেকে থেকে ঝঙ্কার তুলছে হট্টিটির ডাক! ঠাণ্ডা ছায়া দিয়ে ছাওয়া এই ঘরখানা, খাটের ওপর শীতলপাটি পাতা। একটু আগেই দোর গোড়া থেকে যে সরে গেল—সে তো সেই স্বপ্নে দেখা কল্যাণী! আজ মনে হল—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মনে হল: পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত দীর্ঘ, কত অর্থহীন পথ যেন তিনি পেরিয়ে এসেছেন! যেন মরীচিকার হাতছানিতে ছুটে চলেছেন মরু-বালুকার এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে—। কী চেয়েছেন নিজেও স্পষ্ট করে জানেন না, কী পাবেন কোনো সুস্পষ্ট রূপ নেই তারও! তার চেয়ে এখানকার এই ছায়ায়—কল্যাণীর এই ছায়ায়—তিনি কি কোনো স্বপ্নহীন নীরন্ধ্র তন্দ্রার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারেন না? হারিয়ে যেতে পারেন না কোনো নিশ্চিন্ত লুপ্তিতে?

—কী ভাবছেন মাস্টার সাহেব?

রঞ্জনের প্রশ্ন। আবিষ্ট চোখ তুলে ধরলেন মাস্টার।

নগেন বিমর্ষ গলায় বললে, অবশ্য আপনার যদি খুব বেশি অসুবিধে থাকে, তবে পীড়াপীড়ি করবনা। যদি অস্বস্তি বোধ করেন—

—অস্বস্তি? নাঃ—একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিলেন আলিমুদ্দিন: অন্য কথা ভাবছিলাম। সে যাক্। হাঁ, এখন আমাদের পুরোণো আলোচনাটাই চলুক—জোর করে সব কিছু ভুলে যাওয়ার একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করে মাস্টার বললেন, খানিক দূর পর্যন্ত আমরা

এক সঙ্গে যেতে পারি—এই কথাই হচ্ছিল। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত? আর আপনাদের প্রোগ্রামটাই বা কী?

রঞ্জন কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা লোক। তার পর আলিমুদ্দিনকে দেখেই চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ছাঁটা ছাঁটা চুল—ষণ্ডা চেহারা—একটা বন্য মহিষের মতো দেখতে। দুটো রক্তমাখা চোখে আগুন বর্ষণ করতে করতে সে হিংস্র জন্তুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

নগেন চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কী—কী হয়েছে যমুনা?

যমুনা আহীর তবু জবাব দিলনা। প্রকাণ্ড চওড়া বুকটা প্রচণ্ড নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শুধু তালে তালে ওঠাপড়া করতে লাগল।

—কোনো ভয় নেই, বলো। ইনি আমাদের বন্ধু লোক।

যমুনা কেঁপে উঠল একবার। তারপর একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর বেরুল তার গলা দিয়ে।

—আমি ফেরারী—থানায় যেতে পারিনি। কিন্তু ইস্ দফা হাম খুন করেঙ্গা—জান লে লেঙ্গা!

—কার জান নেবে? কী হয়েছে?—নগেন আকুল হয়ে উঠল: খুলে বলো সব।

সেই অদ্ভুত বিকৃত স্বরে যমুনা বললে, শাহুর লোক লাঠি পাঠিয়ে মাঠ থেকে ঝুমরিকে ধরে নিয়ে গেছে।

তেইশ

—লীগ-ফীগের কথা ছাড়ুন—পরম পরিতৃপ্তিতে গড়গড়ায় টান নিলেন ফতেশা পাঠান। তারপর ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্রে ধোঁয়াটাকে মুক্তি দিয়ে আধবোজা চোখ দুটোকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরলেন: কী করা যায় তাই বলুন এখন।

আজ বিকেলে আফিঙের মৌতাত করেছেন কিনা ভৈরবনারায়ণ, বলা শক্ত। আশ্চর্য জাগ্রৎ আর সজীব তাঁর চোখ। এই সময়ে ভৈরব-নারায়ণকে দেখলে মত বদলাত রঞ্জন। যে মুখখানাকে সে 'প্রাইজ বুলের' সঙ্গে তুলনা করেছিল, সে মুখ দেখলে এখন তার অন্য কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত গ্রীক পুরাণের গল্প—ভেসে উঠত লুব্ধ বীভৎস কামনায় ইয়োরোপার দিকে ছুটে আসা জুপিটারের বৃষভমূর্তি!

ভৈরবনারায়ণ বললেন, গণ্ডগোল আপনারাই তো বাধিয়েছেন। কী কতগুলো লীগ আর ন্যাশানাল গার্ড গড়েছেন, লোক ক্ষ্যাপাচ্ছেন—

ইস্‌মাইল ফোঁস করে উঠল।

—লোক আমরা ক্ষ্যাপাচ্ছি না। এতকাল ধরে আপনারা সব ভোগ দখল করে এসেছেন, এবার আমরা আমাদের হিসেব মিটিয়ে নিতে চাইছি।

ভৈরবনারায়ণ হাসলেন: আলাদাই যদি হয়ে যেতে চান, তা হলে আর একসঙ্গে কী করে কাজ করা যায় বলুন। আমরা উত্তরে গেলে আপনারা যাবেন দক্ষিণে; আমরা পূবে যেতে চাইলে আপনারা পশ্চিমে—

ইস্‌মাইল কী বলতে চাইছিল, ফতেশা থামিয়ে দিলেন।

—ওসব পরের কথা পরে। সে ফয়শালা ত্বদিন দেরীতে হলেও চলবে। কিন্তু অবস্থা বুঝতে পারছেন না এখন? আমার প্রজারা বাগ মানছে না। ওই চাষা প্রজা—ওই সাঁওতালের দল, সব জোট বাঁধছে। ওদের পেছনে আছে কতগুলো হারামী মুসলমান, আলিমুদ্দিন মাস্টারটা হয়েছে তাদের পাণ্ডা। আপনিই বা কোন্ সুখে চোখ বুজে বসে আছেন কুমার বাহাত্বর? আপনার জয়গড় মহল বশ মানছে না, কালা পুখ্রির তুরীরা 'ডাঁড়ার' মুখ বাঁধবার জন্যে কোমর বাঁধছে। দেখছেন না, আপনি ডুবছেন, আমিও ডুবছি!

ভৈরবনারায়ণের ভ্রূত্বটো একসঙ্গে জুড়ে এল।

—কিন্তু এর শেষ কোথায় সেটাই বুঝতে পারছি না! চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কুমার বাহাত্বর: সে যাক, পরের ব্যাপার পরেই হবে। আপাতত আপনার কথাটা আমার মনে ধরছে। আপনার যেমন মাস্টার জুটেছে, আমিও তেমনি এক ঠাকুরবাবু পুষেছিলাম। চোখে চোখেই রেখেছিলাম, কিন্তু সরে পড়েছে আমার ওখান থেকে। খবর পেয়েছি উঠেছে গিয়ে হতভাগা নগেন ডাক্তারের ওখানে। তুরীদের নাচাচ্ছে ওরাই। আপনি নতুন কিছু জানেন নাকি সরকার মশাই?

নগেনের জ্যাঠা মৃত্যুঞ্জয় সরকার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। কুমার বাহাত্বরের প্রশ্নে উৎসাহে নড়ে উঠলেন তিনি।

—হাঁ, কৃষাণ সমিতি হচ্ছে, গরম গরম বক্তৃতাও চলছে সেখানে।

—আপনি তো জয়গড়ের মাথা—ফতেশা প্রশ্ন করলেন, ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্টও বটেন। ঠেকাতে পারেন না লোকগুলোকে?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়লেন।

—আমি অহিংসার সেবক—গান্ধীজির শিষ্য। বলেছিলাম, এসব করে কী হবে? লোকের মনে হিংসা আর লোভ বাড়িয়ে কী লাভ? এর

ফল হবে সর্বনেশে। কিন্তু মাথায় দুর্বুদ্ধি ঢুকেছে, সবশুদ্ধু মরবে শেষ পর্যন্ত। শুনল না। তা অহিংসার সেবক হিসেবে আমার কর্তব্য আমি করছি—সবই জানাচ্ছি কুমার বাহাদুরকে।

—হাঁ, ওঁর কাছ থেকেই সব খবর আমি পাচ্ছি। ভেবেছিলাম, এক ফাঁকে সব কটাকে মাটিতে দলে দেব!—ভৈরবনারায়ণ হিংস্র হাসি হাসলেন: ততদিন প্রশ্রয় নিক খানিকটা। এখন দেখছি শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত গড়াচ্ছে। আর কী আস্পর্ধা বেড়েছে ওই আহীরগুলোর! জটাধর সিংকে খুন করেছে। দারোগা ধরতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাস্তানাবুদ করে হাওয়া হয়ে গেছে পালের গোদা যমুনা আহীর।

—সেটাও বোধ হয় নগেনের ওখানে গিয়ে জুটেছে—জুড়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

—তাই নাকি?—ভৈরবনারায়ণের বৃষ-মুখে 'বুল ফাইটিঙের' জিঘাংসা ফুটে বেরুল: ওটাই তা হলে ঘাঁটি। একটা কাজ করতে পারেন সরকার মশাই? লাল ঘোড়া ছোটাতে পারেন নগেন ডাক্তারের আস্তানায়?

—অনুমতি হলেই পারি—মৃত্যুঞ্জয় হাসলেন: আমি অহিংসার সেবক, তবু দরকার হলে অহিংসার জন্যে হিংসাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

—আপনাদের গান্ধী সে কথা বলেছেন নাকি? তাঁর ভালোমন্দ যাই থাক, তাঁকে অন্তত মহাত্মা বলেই তো জানতাম আমরা!—টিপ্পনি কাটল ইস্‌মাইল!

—বাজে কথা থাক।—শাহু ধমক দিলেন: এখন শুনুন। পালনগরের ব্যাপারটা পণ্ড হল আপনার ঠাকুরবাবু আর আমার মাস্টারের দৌলতে। কিন্তু হাল আমি ছাড়িনি। আর একটা চেষ্টা করেছি যমুনা আহীরের মেয়েটাকে চুরি করিয়ে—

—তাই নাকি ?—ভৈরবনারায়ণ চমকে উঠলেন : আমার এলাকা থেকে—

মিথ্যে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবেন না কুমার বাহাদুর। দুজনের এলাকাই এখন যায় যায়—এসমস্ত ছোট বড় মান অভিমানের কথা থাক। সাঁওতালদের দিয়ে হল না, এবার যদি আহীরদের সঙ্গে—

—কাঁচা কাজ হয়েছে চাচা—একদম কাঁচা কাজ! উল্‌টো ফল হয়েছে। এতকাল আহীরেরা কারো সাতে-পাঁচে ছিল না, এবার ওরাও তেতে উঠেছে। সাঁওতালদের নিয়ে এর মধ্যেই বৈঠক করেছে নিজেদের ভেতর।—ইস্‌মাইল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো : চারদিকে এমন একটা বেড়াজাল তৈরী হয়েছে যে এখন কেটে বেরুনোই মুশ্‌কিল। মাঝখান থেকে লীগের কাজকর্মই পণ্ড!

—রাখো তোমার লীগ!—শাহু সজোরে ফরাসে একটা থাবড়া মারলেন : যত জঞ্জাল সব! ভালো করতে গিয়ে একরাশ বিপত্তি বাধল। জুটল ওই আলিমুদ্দিন মাস্টার—এখন গোড়াশুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে।

—সব ঠাণ্ডা হবে, কিছু ভাববেন না—ভৈরবনারায়ণ চিন্তিত মুখে বললেন, এখন একটা পথ বাতলান। দারোগাকে বলে কয়েকটা পাণ্ডাকে ধড়পাকড় করিয়ে—

ইস্‌মাইল বললে, উহুঁ, খুব সুবিধে হবে না। এক যমুনা আহীরকে নাড়তে গিয়ে বেজায় ভেবড়ে গেছে দারোগা। বলছে, এসব ক্রিমিন্যাল্ এলাকায় কাজ করা সাতজন ভুঁড়িওলা কনেস্টবল, আর পাঁচজন হাবা চৌকিদার নিয়ে সম্ভব নয়। মাঝ থেকে বেঘোরে প্রাণ যাবে। শহরে নাকি চিঠি দিয়েছে স্পেশাল পুলিস ফোর্সের জন্যে। যদি না আসে, এ এরিয়া থেকে ট্রান্স্‌ফার নেবে সে।

—যা করবার নিজেদেরই করতে হবে—শাহু বললেন, ওসব হাতটান মার্কা ছারপোকা-মারা দারোগার কর্ম নয়। আসুন এক জোট হই আমরা। নিজেদের মধ্যে মামলা-মোকর্দ্দমা, লাঠালাঠি, হিন্দু-মুসলমান—এগুলো এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় যে আপনার আমার কারুরই তা গায়ে লাগবে। কিন্তু প্রজা ক্ষেপবার ফল বুঝতে পারছেন? দুদিনে ওলট-পালট করে দেবে। তখন হিন্দুও থাকবে না, মুসলমানও থাকবে না—সব শালা এক হয়ে জমিদারের ঘাড়ে লাঠি ঝাড়তে চাইবে। ওদিকে আপনার ঠাকুরবাবু এদিকে আমার মাস্টার, মাণিকজোড় মিললে আর—

—মিলেছে।—কথার মাঝখানে থাবা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, মিলেছে। আলিমুদ্দিন সাহেব কাল নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন নগেনের ওখানে—

কথাটা সভার ওপর বজ্রপাতের মতো এসে পড়ল।

ঘরশুদ্ধ সকলে একসঙ্গে চমকে উঠলেন। খোঁচা-খাওয়া বিষধর সাপের মতো একটা অস্ফুট গর্জন করলেন ফতে শা পাঠান—মনে হল মাস্টারকে সামনে পেলে আর কিছুই করতেন না তিনি, শুধু হিংস্র ক্রোধে ছোবল মারতেন একটা।

অসহ্য জ্বালায় ইস্‌মাইল বলে ফেলল, শালা হারামী!

চাপা তীক্ষ্ণস্বরে শাহু বললেন, ব্যাস্‌, খতম!

—না, খতম নয়।—ভৈরবনারায়ণ বললেন, এই শুরু।—উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপতে লাগল: আমার পূর্ব্বপুরুষ কান্তনগরের যুদ্ধে লড়েছিল ইংরেজের সঙ্গে। আর কটা অবাধ্য লোককে ঠাণ্ডা করা যাবে না? আপনি তৈরী হোন শাহু, আমিও তৈরী। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব—দুটোয় না হলে দুশোর মাথা নামিয়ে দেব মাটিতে। তারপর ফাঁসি যেতে হয়—সে ভি আচ্ছা!

—তা হলে তাই কথা রইল—শাহু উঠে পড়লেন : আমি তা হলে আজ আসি কুমার বাহাদুর। রাত হয়ে গেছে। ইদ্রিস!

একজন বাদিয়া বরকন্দাজ ঘরের বাইরে থেকে দোর গোড়ায় এগিয়ে এল।

—গাড়ি জোতা আছে?

—জী।

—তা হলে—শাহু দু পা এগোলেন।

ভৈরবনারায়ণ বললেন, একটু বসে যান। বৃষ্টি পড়ছে।

—বৃষ্টি? তাই তো বটে।—শাহু বসলেন।

হাঁ, বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। এতক্ষণের তন্মগত আলোচনায় সেটা কারো খেয়াল ছিল না। বাইরে লাল মাটির সহস্রদীর্ণ বুকের ওপর নেমেছে বহু প্রতীক্ষিত বর্ষণ, রৌদ্রদগ্ধ দিক-প্রান্তের ওপর স্নেহের মতো ঝরে পড়ছে অকৃপণ ধারায়। এলোমেলো হাওয়ায় শোনা যাচ্ছে তালবনের মর্মর, আমবাগানের আর্তধ্বনি, মালিনী নদীর কল্লোল!

—তাই তো বৃষ্টি নামল যে!—শাহু বিব্রত হয়ে বললেন।

—ভয় নেই, এখুনি থামবে—আশ্বাস দিলেন ভৈরবনারায়ণ।

—থামবে?—কাচের জানালার ভেতর দিয়ে বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের দিকে তাকালেন বিচক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় : ঠিক সে কথা কিন্তু মনে হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে বান ডাকানো বৃষ্টি—সহজে থামবে না, মাঠে জল আসবে—

—মাঠে জল!—চকিত হয়ে মন্তব্য করলেন কুমার বাহাদুর। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা মনে পড়ল তাঁর—একটা সুতোয় টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে ভেসে এল পাশাপাশি কতগুলো ছবি। কালা পুখ্‌রি—ডাঁড়া—মালিনী নদীর বান—মাঠভরা জল—নগেন ডাক্তার—ঠাকুরবাবু—

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল মাধব। কালা পুখ্‌রির মাধব। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, সর্বাঙ্গে কাদা—চোখে মুখে উৎকণ্ঠার আকুলতা।

—খবর কী মাধব?

হাঁপাতে হাঁপাতে মাধব বললে, নদীর বান এসেছে।

—তারপর?

—ওঁরাও, তূরী, সাঁওতাল, জয়গড়ের সব হিন্দুমুসলমান প্রজা, মাস্টার সাহেবের বাদিয়ার দল, সব এক জোট হয়ে কালা পুখ্‌রির ডাঁড়ার বাঁধ বাঁধছে!

কিছুক্ষণ শুধু বাইরের বৃষ্টির শব্দটাই জেগে রইল।

তারপর ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, ফতে সাহেব!

শাহু বললেন, আপনি লোক ঠিক করুন, আমিও আসছি। গাড়ি জুততে বল, ইদ্রিস—

—জোর বৃষ্টি হচ্ছে যে শাহু—ইদ্রিস বলতে গেল।

—চুপ কর হতভাগা উল্লুক—যা বলছি তাই করবি!—বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়িয়ে বজ্রধ্বনির মতো শাহুর কণ্ঠ ঘরময় ভেঙে পড়ল।

* * * *

রাজবংশী চাকরটাও বাড়িতে নেই—ক্যারু একা। সেই ফাঁকে বসল বোতল নিয়ে।

অনেক দিন পর্যন্ত এমনভাবে মদ খায়নি ক্রু সাহেব।

মার্থার ভয়ে জীবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলো একদিন শান্ত সংযত করে নিয়েছিল,—মার্থার রুচি আর শিক্ষার সাহচর্যে নিজেকে মার্জিত করে নিতে চেয়েছিল সে। সেদিন জানত, গোল্ডার্স গ্রীণের সোনার হরিণ মার্থাকে আর ভোলাতে পারবে না; তার নিজের যা কিছু রঙ সব জ্বলে গিয়ে সে মার্থার কাছে একটা মূল্যহীন ফাঁকি হয়েই ধরা দেবে। সেই

হীনম্মন্যতার অপরাধে সে দিনের পর দিন স্তুতি করেছে মার্থাকে, তার গঞ্জনা সহ্য করেছে। উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়াল পার্সিভ্যাল আর কালো মায়ের যে নগ্ন কামনার মিলনে তার জন্ম, নিজের ভেতর তার বন্য আবেগকে প্রাণ-পণে রোধ করেছে বার বার। মার্থা আসবার আগের অধ্যায়ে সেই একদিনের ভুল—একটা মেয়েকে জোর করে ধরে এনে তারপর পুলিস-কেস বাঁচাবার জন্য গলা টিপে তাকে খুন করা! সেই পাপ—সেই অপরাধে সে শঙ্কিত থেকেছে দিনের পর দিন। অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছে সে।

কিন্তু আজ?

আজ আর কোনো ভয় নেই।

কী আছে—কেই বা আছে? কাকে ভয়—কার কাছেই বা কৈফিয়ৎ? আজ কুড়ি বছর ধরে যে চিঠি আসেনি—সে চিঠি আর কখনো আসবে না। এতদিন পরে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। আশা করবার যা কিছু সাহস ছিল, একটি আঘাতে তার সব কিছু চুরমার করে দিয়ে গেছে মার্থা। মনে হয়েছে, আজ এতদিন পরে ফুরিয়ে গেছে স্মাইদ্ ক্যারু—এতদিন পরে আর তার কিছু করবার নেই।

সবাই বঞ্চনা করেছে তাকে—সবাই। বাপ, মা, মার্থা, অ্যাল্‌বার্ট—আর, আর পৃথিবী! খুন করেছিল সে? সেই খুনের পাপে এতদিন ধরে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? পালিয়ে থাকতে চেয়েছিল এই অন্ধকার ভাঙা কুঠি-বাড়ির একটা গর্তের ভেতর? ক্যারুর মুখে একটা স্বাদহীন হাসি ফুটে উঠল। আর তার ভয় নেই। শুধু একটি মেয়েকে মাত্র নয়—পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকেই সে খুন করতে পারে আজ।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। লাল মাটির আদিগন্ত পৃথিবীতে জল আর বাতাসের মাতামাতি শুরু হয়েছে ক্ষ্যাপা আনন্দে। তালগাছের

বুক ফুঁড়ে নামছে বজ্রের অসহ ক্রোধ—দিকে দিকে অবিন্যস্ত বনজঙ্গলে উড়ছে রাত্রির জটা। খর-খড়্গের দীপ্তি দুলছে ডাঁড়ার তীক্ষ্ণপ্রবাহে!

বাইরের ক্ষেপে-ওঠা পৃথিবীর সঙ্গে ক্যারুর সমস্ত মনও উদ্দাম হয়ে উঠল। কিছু একটা করা চাই—ওই মুহূর্তেই করা চাই তার। ক্যারু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান পেতে রইল। হাওয়ায় ভাঙা কুঠি-বাড়ির কজা ভাঙা জানলার কবাটে পেত্নীর কান্না বাজছে; কোথায় যেন খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকে কী একরাশ খস্ খস্ করে ওড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। আর—আর—সেই মেয়েটা কি চুপ করে আছে এখনো? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না—কাঁদছে না—চেঁচিয়ে উঠছে না?

তার নির্জন কুঠি-বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে মেয়েটাকে জিম্মা করে রেখে গেছে শাহু। তখন প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি—শাহু বলে গেছে, সকালেই মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এখন এত তাড়া-তাড়িতে বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন বোধ করেছিল ক্রু সাহেব। কিন্তু এখন? এখন আর কোনো ভয় নেই। পৃথিবী তাকে ঠকিয়েছে—সবাই বঞ্চনা করেছে তাকে। কাউকে আর সে ক্ষমা করবে না। শিকার যখন মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তখন সে নেবে না কেন তার পূর্ণ সুযোগ? দরকার যদি হয়, না হয় আর একবার আর একজনের গলা সে পিষে দেবে দুহাতে।

মদের নেশায় আচ্ছন্ন চেতনাটার ওপর ক্রমশ বাইরের অন্ধকার এসে ঘন হতে লাগল—ক্রমশ একটা বন্যজন্তু যেন সেখানে স্থায়ী হয়ে এসে বসল থাবা পেতে। মনের দিকে তাকিয়ে ক্যারু শুধু সেই জন্তুটার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে লাগল। সে চোখ তিলে তিলে তার সমগ্র সত্তাকে হরণ করতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধ করতে লাগল, তারও পরে—আস্তে আস্তে নিজের ওপর তার আর বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বও জেগে রইল না।

বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার তাকে লোভানি দিতে লাগল—হাওয়ার সঙ্গে মিশতে লাগল তার উদ্বেজিত উত্তপ্ত ঘনশ্বাস। দেওয়ালের গায়ে 'গড্ সেভ দ্য কিং' যেন রূপ বদলে ফেলল আকস্মিকভাবে—তার মনের চোখ দুটো তার মধ্যেও আবির্ভূত হল টেবিল-ল্যাম্পের ম্লান আলোয়। যেন কুটিল কটাক্ষে ডেকে বললে লাগল: ওঠো—ওঠো! সময় চলে যাচ্ছে—দামী, দুর্লভ, দুর্মূল্য সময়!

অসহ্য জ্বালায় এবং অসংযত মত্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যারু। অন্ধকারে দূরে ছুড়ে ফেলল মদের বোতল, তারপর—

টলতে টলতে এসে দাঁড়ালো অন্ধকার ছোট কুঠরিটার সামনে।

ঘরটা পেছন দিকের একটা কোনায়। সংসারের প্রয়োজনে কোনোদিন লাগেনি—কোনোদিন ঘরটাকে ব্যবহার করেনি মার্থা। এই ঘরখানাকে সে ভয় করত—সন্ধ্যার পরে আসতে চাইত না এদিকে। তার কারণও ছিল। পার্সিভ্যাল যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল এ অঞ্চলে, তখন এদিককার স্বাধীন রেশম চাষীদের এই অন্ধকার কুঠরিতে এনে বন্ধ করা হত। স্বেচ্ছায় যারা রেশম কুঠিকে পলু বেচতে চাইত না, তাদের—

সেই পুরোনো ইতিহাস। ঘরের নোনা-ধরা দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো হয়তো আঁকা আছে রক্তের চিহ্ন, এখনো এর স্যাঁৎসেঁতে মেজে অনেক চোখের জলের স্মৃতি-চিহ্নিত। দেওয়ালের গায়ে মরচে-পড়া দুটো লোহার আংটায় এখনো বুঝি ছড়ে-যাওয়া হাতের ছেঁড়া চামড়া শুকিয়ে আছে!

এই আংটায় ঝুমরি বাঁধা।

দোর গোড়ায় এসে আবার ফিরে গেল ক্যারু—নিয়ে এল এক টুকরো আধপোড়া মোমবাতি। শিথিল হাতে সেটাকে জ্বালালো, তারপর একটানে খুলে ফেলল দরজাটা।

কাঁপা মোমবাতির আলো পড়ল বন্দিনীর মুখে। পড়ল তার যন্ত্রণা-বিকৃত দেহের ওপর।

ক্যারু থমকে দাঁড়াল। মনের ভেতর থেকে যে কুটিল ক্রূর রাক্ষসটা বেরিয়ে আসছিল, সে যেন কোথা থেকে সাপের ছোবল খেলো একটা।

দৃষ্টির সামনে কতকগুলো বুদ্বুদ উঠল—ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। দেখা দিল একটি দিন। তার সাত বৎসর বয়েসের একটা দিন।

কালো ছেলের মনে পড়ে গেল প্রায় ভুলে যাওয়া কালো মাকে। একটা অসহ্য অন্ধ ক্রোধে একটু আগেই যে মাকে সে খুন করতে চাইছিল—সাত বছর বয়েসের একটি দিন সেই মাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনল। এই ঘরে, ওই আংটাদুটোর সঙ্গে বেঁধে তাকে চাবুক মেরেছিল শাদা বাপ পাসিভ্যাল। কী অপরাধ সে জানে না, কিন্তু পাসিভ্যালের চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলন্ত ক্ষুধায় জ্বলেছিল। চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে ছিঁড়ে আসছিল গায়ের চামড়া, লাল ফিতের মতো সর্বাঙ্গে ফুটে ফুটে উঠছিল ক্ষত রেখা।

ইচ্ছে হয়েছিল একখানা থান ইঁট কুড়িয়ে এনে পেছন থেকে ছুড়ে মারে বাপের মাথায়। কিন্তু সাহস ছিল না। ওই বয়েসেই বাপের হাতে নির্মম নির্যাতনের স্মৃতি তারও কম ছিল না নিতান্ত।

দোরগোড়া থেকে সভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিল আহত জানোয়ারের মতো ক্ষতচিহ্ন লেহন করতে করতে। নিরুপায় ক্রোধ—অথচ প্রতিকারের পথ নেই!

আজ ক্যারুর মনে হল: নেশার জর্জরিত চেতনা নিয়ে মনে হল: ওই তার মা। কালো দুটো নিষ্ঠুর আংটায় বাঁধা কালো মায়েরা এমনি করেই শাদা হাতের চাবুকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে চিরকাল। মনে হল:

তার দুর্ভাগ্যের পেছনে কালো মায়ের অপরাধ ছিল না—ছিল বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

ক্যারু এগোল ঝুমরির দিকে।

—হট্ যাও—হট্ যাও—দু চোখে বিষবর্ষণ করল নাগকন্যা।

—ভয় নেই, আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ঝুমরি দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

নিজের ঘরে এসে আবার বোতল নিয়ে বসল ক্যারু। জীর্ণ কুঠি-বাড়ির চারদিকে বাতাস গোঙিয়ে চলেছে—কান্না উঠছে দরজা জানলার ভাঙা কব্জায় কব্জায়। এতদিন পরে নেশার ঘোর লাগা চোখে ক্যারু যেন কুঠি-বাড়ির স্বরূপটা দেখতে পেল। শূন্য, নগ্ন, নিরর্থক। এ কোন্ আবর্জনার মধ্যে তাকে ফেলে গেছে পার্সিভ্যাল? লাল মাটির রক্ত শুষে খেয়ে ফেলে তাকে ছুড়ে দিয়ে গেছে কোন্ অস্থিশয্যার ওপর?

ঘৃণা—অসহ্য ঘৃণা। নিজেকে, পার্সিভ্যালকে, গোল্ডার্স গ্রীণের মরীচিকাকে। নিজের ভয়কে, শাহুর ভয়কে, ভৈরবনারায়ণের ভয়কে। এই কুঠি-বাড়ি। এর প্রেত তার কাঁধে চেপে বসে আছে, পার্সিভ্যালের চাবুকের চাইতেও আরো নিষ্ঠুর, আরো নির্মম চাবুকের ঘায়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে তাকে। কেন সে নিজের চারদিকে এমন একটা মুক্তিহীন জাল জড়িয়ে নিয়ে বসে আছে? কেন সে এখান থেকে পালাতে পারে না? অ্যাল্‌বার্ট কি এই সত্যটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি যে তার স্থান কোথায়, কারা তার সগোত্র?

একটা কিছু করা চাই। ভয়ঙ্কর একটা কিছু। বিদ্রোহ—নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। কালো মায়ের কালো ছেলে। শাদা বাপের পায়ে পায়ে চলতে গিয়ে সে শুধু আঘাতই পেয়েছে, ঠাঁই বাঁচাতে গিয়ে শুধু

নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছে পৃথিবী থেকে। এর চাইতে যদি সে খাঁটি কালো ছেলে হয়ে মাটি কোপাত, যদি লাঙল ঠেলত, যদি বলতে পারত সে এই মাটির—সে লাল মাটির মানুষ—

তার জন্ম—তার রক্ত—তার দুরাশা। কী দিয়েছে? অভাব, বঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা। সে কেউ নয়। লাল মাটিরও নয়—গোল্ডার্স গ্রীণেরও নয়। একটা শূন্যতার যোগফল।

হাঁ—কিছু একটা করা চাই। ভয়ঙ্কর—ভয়াবহ। নিজের বিরুদ্ধে—এই শূন্যময় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। বোতলটা উবুড় করে সে দেখল তাতে আর একটি ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

কোথা থেকে রাজবংশী চাকরটা এসে দাঁড়াল।

—ডাঁড়ার দিকে ভারী গোলমাল হুজুর।

—গোলমাল!—ক্যারু সজাগ হয়ে উঠল: কী হয়েছে?

—প্রজারা ডাঁড়ায় বাঁধ দিচ্ছে। শাহু আর কুমারের লোক আসছে বাঁধ কেটে দেবার জন্যে। খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে।

কানাঘুষোয় ব্যাপারটা শুনেছিল ক্যারু—আজ হঠাৎ যেন সব জিনিসের একটা নতুন অর্থ দেখা দিলে তার কাছে। শাহু নয়, ভৈরবনারায়ণ নয়—পার্সিভ্যাল। বন্দিনী মেয়েটা! আর ডাঁড়ার জলে যে ফসল ভেসে যায়, তার ভেতর মিশে যায় তার কালো মায়ের চোখের জল। ক্যারু উঠে দাঁড়াল।

—আমার বন্দুক—

চাকরটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল: কী হবে বন্দুক, সাহেব?

—বাঁধে যাব—

হাঁ—সে যাবে। নিজের বিরুদ্ধে, পার্সিভ্যালের বিরুদ্ধে, এই রেশম

কুঠির বিরুদ্ধে। কোথায় জায়গা পাবে তা সে জানে না, কিন্তু যেখানে সে আছে সে যে তার জায়গা নয়, এ সত্যই আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঝড়ের মধ্যে, বন্দুক কাঁধে, ক্যারু ঘোড়া ছোটালো।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না।

বেশিদূর যেতে পারল না ক্যারু। চোখের সাম্‌নে দিয়ে প্রলয়-শব্দে চোখ জ্বালানো তীব্রতম আলো ঝল্‌সে গেল, একটা মাটির টিবিতে টক্কর খেল ঘোড়াটা, আর উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ঝপাং করে প্রায় দশ হাত নিচে কাঁদড়ের জলের মধ্যে পড়ে গেল ক্যারু। শুধু পা দুটো জেগে রইল জলের ওপর, বুক পর্যন্ত পুঁতে গেল কাদার তলায়। মেঘের গর্জনে থরথরিয়ে উঠল দিগ্বিদিক।

না, বেশি দূর যেতে পারল না ক্যারু। হয়তো জলের তলায় সেই বাদামী রঙের কঙ্কালটাই নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে তাকে আঁকড়ে রইল।

শুধু একটা খবর জানলনা ক্যারু। ওই বাজটা পড়েছিল তারই কুঠির ওপর—যেটুকু বাকী ছিল, তাও শেষ করে দিয়েছিল। অগ্নিশোধন করে দিয়েছিল পার্সিভ্যালের সমস্ত সঞ্চিত অপরাধের।

জলের ওপর জেগে থাকা দু পাটি ছিন্ন জুতোর ওপর লাল মাটির বৃষ্টি পড়তে লাগল। আর কিছুক্ষণ ধরে লাল জলটা আরো খানিক রাঙা হয়ে রইল—পড়বার সময় সেফ্‌টি খুলে কখন তার গলার মধ্যেই ফায়ার হয়ে গিয়েছিল বন্দুকটা।

চব্বিশ

বৃষ্টি থেমেছে, তবু মেঘে ঢাকা কালো আকাশ। যেন কোনো জীর্ণ মন্দিরের পাথুরে ছাদ ঝুলে আছে মাথার ওপর—তার ফাটলে ফাটলে বিদ্যুৎ-বিলাস। এক সময়ে যেন সবটা হুড়মুড় করে সশব্দে ভেঙে পড়বে, তার সঙ্গে সঙ্গে নিচের পৃথিবীটাকেও নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

লাল মাটির তমসা-দিগন্ত মুখর করে তীব্র স্বর উঠেছে মালিনী নদীর জলে। সেই বান এসেছে নদীতে—সেই ঢল নেমেছে লাল মাটিতে: যার প্রতীক্ষায় বরিন্দের পৃথিবী এতকাল সহস্রদীর্ণ হয়ে ছিল—তুলছিল ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের গৈরিক ঝড়; এতদিন ধরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে যাওয়া মেঘে মেঘে পড়ছিল যার পদাঙ্কলেখা, টিলার ওপর নিঃসঙ্গ তালগাছের মাথার ওপর যার তর্জনী সংকেত দেবার জন্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল!

সেই বৃষ্টি এসেছে—এসেছে সেই সমুদ্র-প্রতিভাস বন্যার আবেগ। এইবার বন্যার সঙ্গে লড়াই। অন্ধ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়া। কালা পুখ্‌রির তিন হাজার বিঘে ধানী জমির ফসল আর ভেসে যেতে দেবনা আমরা।

শেষ পর্যন্ত যমুনা আহীরও এসেছে দলবল নিয়ে। বুক পুড়ে যাচ্ছে ঝুম্‌রীর জন্যে—বরিন্দের বন্য হিংসা জ্বলছে মাথার মধ্যে ধূধূ করে। তার শোধ নেবে সে কড়ায় গণ্ডায়, একটা আধ্‌লাও বাকী রাখবেনা। কিন্তু তার আগে বাঁধ বাঁধা চাই।

সাঁওতালেরা এসেছে—এনেছে তীর ধনুক। সোনাই মণ্ডলের নেতৃত্বে চাপ চাপ মাটি কোদালের মুখে তুলে ডাঁড়ার মুখে ফেলছে

তুরীরা। বৃষ্টি নেই এখন—এলোমেলো হাওয়ায় কাঁপছে পঞ্চাশটা মশালের শিখা—প্রেতদীপ্তি জ্বলছে ফেনিল ঘোলা জলের ধারায়, মানুষগুলোর মুখে বুকে, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা হোসেনের দল আর কৃষাণ সমিতির লোকগুলির লাঠিতে লাঠিতে। আকাশের জমাট মেঘ যেন সেইদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

একটু দূরে অপেক্ষা করে আছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, রঞ্জন, নগেন, আর হোসেন বাদিয়া। কারো মুখে কথা নেই। শুধু মশালে মশালে দোল-খাওয়া রক্তাভ আলো-ছায়ায়, মালিনী নদীর গর্জনে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা ডাঁড়ার মুখে চাপ চাপ মাটি পড়ার শব্দে অভিভূত হয়ে আছে চারদিক। আকাশের ফাটলে ফাটলে লুকিয়ে যাচ্ছে সাপের জিভের মতো ক্ষীণ বিদ্যুৎ।

—ঠাকুরবাবু!

একটা চাপা স্বর শোনা গেল বাঁধের তলা থেকে। এক চাপ অন্ধকারের আড়াল থেকে আবার ডাক শোনা গেল: ঠাকুরবাবু!

—কে?

সীমাহীন বিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ল রঞ্জন। ছায়ার মধ্যে কায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। একটুখানি শাদা কাপড়ের আভাস ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। যেন কোথাও থেকে সে আসেনি, মাথার ওপরের অন্ধকার আকাশ থেকেই নিঃশব্দে ঝরে পড়েছে এখানে।

—একটু এদিকে আসবি ঠাকুরবাবু?

নগেন জিজ্ঞাসা করলে, কে ডাকছে?

রঞ্জন বললে, কালোশশী।

—সেই বেদের মেয়েটা? কী চায় এখানে?

—দেখছি।

বাঁধের গা বেয়ে রঞ্জন নিচে নেমে এল।

এইবার আরো স্পষ্ট করে দেখা গেল কালোশশীকে। মাত্র দু হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে। দেহের ধারালো রেখাগুলো মূর্তির মতো কঠিন রেখায় জেগে উঠেছে। চিক চিক করছে গলার রূপোর হাঁসুলী, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুহাতের দুটো সাপের ঝাঁপি।

সেই বৃষ্টির রাত—মেটে প্রদীপের ছায়া-কাঁপা ঘর—সেই অর্থহীন কান্না; কালো পাথরের মতো বেদের মেয়ের হৃৎপিণ্ড-ফাটা অশ্রুর উচ্ছ্বাস। কয়েক মুহূর্ত একটা কথাও বলতে পারলনা রঞ্জন। এমন সময়ে—এই বাঁধের ধারে কোথা থেকে এল কালোশশী। কী চায়?

কিন্তু সে তো ঘর; সে তো আকুল বৃষ্টির সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এ তা নয়। এখানে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ জাগছে ভয়ঙ্করের ভ্রূকুটির মতো, দিগন্তে এখানে স্তম্ভিত ঝড়, এখানে প্রায় দুশো মানুষের আমৃত্যু সংকল্পে চারদিক আকীর্ণ হয়ে আছে। কোদালের মুখে রাশ রাশ মাটি পড়ে এখানে যখন মালিনী নদীর ফেনিল জল অসহায় আক্রোশে রুদ্ধস্রোত হয়ে আসছে, তখন কয়েক বিন্দু চোখের জল কখন কোন্ মাটিতে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে—কে তার খবর রাখে?

তবু কালোশশীর সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রঞ্জন।

কিন্তু যা আশঙ্কা করছিল, তার কিছুই ঘটলনা।

কালোশশী বললে, তোরা তৈরী আছিস ঠাকুরবাবু?

রঞ্জন হাসল: তৈরী বই কি। আর দু তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুই এখানে কেন?

—খবর দিতে এলাম—শুকনো স্বর শোনা গেল কালোশশীর। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই সে রইল। এক পাও সে নড়লনা—

গলার আওয়াজ ছাড়া মূর্তির মতো কঠিন রেখা-দিয়ে-গড়া দেহে এতটুকু স্পন্দন লক্ষ্য করা গেলনা।

—কিসের খবর?—রঞ্জন ভ্রুকুটি করল।

—ওরা আসছে।

—কারা?

—শাহু আর জমিদারের লোকজন।

—শাহু!—রঞ্জন চমক খেল: শাহু কেন?

—তা তো জানিনা। কালোশশী একবার থামল: শাহুর সব বরকন্দাজ আসছে, সেই সঙ্গে জমিদারের লাঠিয়াল। তরোয়াল, বন্দুক, বল্লম—সব আসছে ঠাকুরবাবু!—এতক্ষণে কালোশশীর গলায় প্রাণের লক্ষণ পাওয়া গেল, কাঁপতে লাগল উৎকণ্ঠার রেশ: তোদের মারতে আসছে।

কিন্তু কালোশশীর সে উৎকণ্ঠা মনকে স্পর্শ করলনা। শাহু—শাহুও আসছেন! কালা পুখ্‌রির বাঁধে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই, তবুও আসছেন লোকজন, লাঠিয়াল আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে! যে ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর মামলা-মোকর্দমা আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা—আজ অহেতুকভাবে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেও একবিন্দু দ্বিধা হলনা ফতেশা পাঠানের!

—তুই জানলি কী করে?

—ওরা একসঙ্গে বেরিয়েছে। তাই দেখেই তো তোকে খবর দিতে এলাম। তোরা সাবধান হয়ে থাকিস।

—সাবধান!—রঞ্জন হাসল: হাঁ, সাবধান হয়ে আমরা আছি।

ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে শাহু আসছেন। কিন্তু বিস্ময় বোধ করবার কী আছে এতে? যে কারণে আজ আলিমুদ্দিন মাস্টার তাঁর মত আর পথের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও এসে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই

কারণেই শাহুর সঙ্গে মৈত্রী রচনা হয়েছে ভৈরবনারায়ণের। আজ দুদিকে দুদলকে জোড় বাঁধতেই হবে—শোষক আর শোষিতের সমস্ত স্বার্থ দুটি দলেই ভাগ হয়ে গেছে আজকে। এই নিয়ম—এই ইতিহাস।

চিন্তার ঘোর কাটল কালোশশীর একটা নিশ্বাসে।

ভালো করে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই রঞ্জন দেখল, হাতের ঝাঁপি নামিয়ে কখন কালোশশী এসেছে তার কাছে, নুয়ে পড়ে নিয়েছে তার পায়ের ধূলো। তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়ায় সে চমকে উঠল।

—কী হল রে?

—চলে যাচ্ছি ঠাকুরবাবু। শুনলাম আইহোর বাজারে এসেছে বেদের দল। ওরাই আমার আপনার লোক—চলে যাব ওদের সঙ্গেই। পথে বেরিয়ে ভাবলাম তোকে একবার খবরটা দিয়ে যাই।

মুহূর্তের জন্যে একান্ত কাছের মানুষটির কাছে ফিরে এল রঞ্জন। একটি দীর্ঘশ্বাস তাকে সজ্ঞান করে তুলল, মাত্র চকিতের জন্যেই!

—তুই চলে যাচ্ছিস কালোশশী?

—হাঁ ঠাকুরবাবু।—এতক্ষণে যেন একবার হাসল কালোশশী: ঘর আর বাঁধা হলনা।

পরক্ষণেই ঝাঁপি দুটো তুলে নিয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। মনের ভুল কিনা বোঝা গেলনা—বাঁধে মাটি পড়বার আওয়াজে সে ভুল শুনল কিনা তাও বোঝা গেল না—শুধু যেন দীর্ঘশ্বাসের মতো কানে এল: ওরা আসছে। কিন্তু তুই মরিসনে ঠাকুরবাবু, তুই মরিসনে—

চোখদুটো কচলালো রঞ্জন। স্বপ্ন দেখছিল নাকি এতক্ষণ? কোথাও কেউ নেই। আরো অনেকবার যেমন করে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুছে গেছে কালোশশী, আজো তেমনি করে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আর সে ফিরবে না। ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, পারল না। বন্যার মুখে একদিন

একটা ঘাটে এসে বাঁধা পড়েছিল, আবার বন্যার মুখেই শূন্যতায় ভেসে গেল সে।

দূর হোক ছাই। স্রোতের কুটোর জন্যে কী হবে সময় নষ্ট করে! আকাশে বিদ্যুতের আর একটা ভ্রূকুটি জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সে সজাগ হয়ে উঠল। একটা বেদের মেয়ে নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ; বেনো জল নয়, দিকে দিকে প্রাণবন্যার উচ্ছলিত উদ্দাম প্রবাহ।

রঞ্জন বাঁধের ওপরে উঠে এল।

নগেন বললে, এত দেরী হল যে? কী হয়েছে?

—জরুরি খবর আছে ভাই! ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে ফতেশা পাঠান আসছেন বাঁধ বাঁধা রুখতে।

—কী বললেন!—আলিমুদ্দিন অস্ফুট চীৎকার করলেন একটা।

—হাঁ, খবরটা পাকা বলেই মনে হচ্ছে।

তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। শুধু অন্ধকার মুখর হয়ে চলল ঝপাঝপ কোদালের আওয়াজে—ঝপাস্ ঝপাস্ করে মাটি পড়ায় আর ক্রমাগত বাধা পাওয়া জলের ক্রুদ্ধ বিযাক্ত গর্জনে।

নগেন বললে, মাস্টারসাহেব, বড়লোকেরা একজাত। হিন্দুস্থানীও নয়—পাকিস্থানীও নয়।

আলিমুদ্দিন কী ভাবছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা তুললেন।

সংক্ষেপে বললেন, জানি।

—কী করবেন এবার?—মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন নগেন।

—যা করতে এসেছিলাম—আলিমুদ্দিন তেমনি সংক্ষেপেই জবাব দিলেন। তার পর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে ওঠা মাটি কাটা কালো মানুষগুলির পিঠের দিকে তাকিয়ে

থেকে, নিঃশব্দে কান পেতে জলের মুখে মাটি পড়বার আওয়াজ শুনে বললেন, সেই তো আমার আজাদ পাকিস্তান। বড়লোকের নয়। গরীব মুসলমানের—গরীব হিন্দুর।

আচম্‌কা চারদিকের মানুষগুলো কলরব করে উঠল। আকাশ-ফাটানো একটা গর্জন করল যমুনা আহীর—যেন বরিন্দের লাল মাটির অন্ধকার বুকের ভেতর থেকে জেগে উঠল ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সীমা পার হল—পার হল মহাকালের সিংহদ্বারের পরে সিংহদ্বার; জলস্তম্ভ উঠল "দীবোর দীঘি"র শ্যাওলাধরা নির্জীব স্তব্ধতায়, থরথর করে কেঁপে উঠল দিব্যোকের জয়স্তম্ভ, একট বিরাট বিস্ফোরণে "ভীমের জাঙ্গাল" দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল!

সেই সঙ্গে লাল মাটির টিলাগুলোও গর্জন তুলল—যেন একদল ক্রুদ্ধ সিংহ যুগ-যুগান্তের ঘুম ভেঙে লেজ আছড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল—তালগাছের মাথাগুলো দুলে উঠল ঝড় খাওয়া ঝাণ্ডার মতো। অন্ধকার আকাশ থেকে বিদ্যুতের তরোয়াল হাতে নামলেন গণ-বিপ্লবের নেতা দিব্যোক: মাথার ওপর বজ্রগর্জিত কৃষ্ণতা, পায়ের তলায় থরথর করে কেঁপে ওঠা পৃথিবী।

মাঠের ওপারে একরাশ মশাল। রক্তের ছোপ-লাগা দিগন্ত।

যমুনা আহীর আবার পৈশাচিক স্বরে চিৎকার করে উঠল।

—ঠিক হো যাও ভাই সব।

বুড়ো সোনাই মণ্ডল থেকে টুল্‌কু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়া পর্যন্ত; জরাতুর শার্দুল থেকে নাগশিশু অবধি। হোসেনের দল আর তুরীরা। 'কৈবর্ত-বিদ্রোহের' নবজন্ম।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—গম্ভীর স্বর উঠল নগেনের। তার প্রতি-ধ্বনিতে মালিনী নদীর জল পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। আর দূরে মাঠের

পারে রক্তের রঙ্ ধরানো মশালগুলো থমকে দাঁড়ালো একবার—কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই।

—ঠিক হো যাও—যমুনার বজ্রধ্বনি বাজতে লাগল বার বার। যে তেলপাকানো পিতলের গাঁটবাঁধা লাঠির ঘায়ে জটাধরসিংয়ের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে, সেই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সে ওই মশালগুলোর দিকে ছুটে চলল : আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুটো ঝড় মুখোমুখি দাঁড়ালো।

সকলের আগে কুমার ভৈরবনারায়ণ। আফিঙের নেশায় নিদ্রিত স্থূলোদর মাংসপিণ্ড নন্। আরক্তিম ভয়ঙ্কর চোখ। ঘোড়ার পিঠে তাঁর চেহারাটাকে অতিকায় বলে মনে হতে লাগল : কান্তনগরের যুদ্ধে তাঁর পিতৃপুরুষের গৌরব-কীর্তি নিতান্তই তবে ইতিহাস নয়!

ভৈরবনারায়ণ বললেন, সরে যাও সব। খুন-খারাপী হবে নইলে।

জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন : কেউ সরবে না।

মশালের আলোয় পেছনে ফতেশা পাঠানকে দেখা গেল। চিৎকার করে শাহু বললেন, শালা কাফের!

—কাফের!—আলিমুদ্দিন পাল্টা চিৎকার করে বললেন, কে কাফের? ইব্লিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গরীবের রক্ত শুষে খেতে এসেছো—কে কাফের?

—খবর্দার!—শাহু আকাশে হাত তুললেন : মারো শালাদের!

—চলা আও—যমুনা আহীরের হাতের লাঠিটা ঘুরতে লাগল বন্ বন্ করে। ওদিক থেকে একটা বল্লম ছুটে এসে রঞ্জনের পায়ের কাছে মাটিতে গেঁথে গেল—শন্ শন্ করে ছুটল টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়ার হাতের তীর!

চিৎকার, গর্জন, গোঙানির ভেতরে বাজতে লাগল লাঠির আওয়াজ।

নেচে নেচে ফিরতে লাগল মশালের প্রেতচ্ছায়া। ফট্ ফট্ করে উঠতে লাগল মানুষের মাথা ফাটবার শব্দ!

দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ এল একটা।

পেছন থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে বন্দুক ছুঁড়েছে ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকার। এতদিন পরে সেই ঘুষিটার বদ্লা নিয়েছে সে।

সভয়ে রঞ্জন দেখল, নিঃশব্দে বুকে হাত দিয়ে বাঁধের ওপর শুয়ে পড়েছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

তবুও তৈরী হয়ে গেছে রক্তমাখা বাঁধ। মালিনী নদীর জল ডাঁড়ার মুখে ঢুকতে না পেরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পাশের ঢাল জমি বেয়ে নেমে গেছে মাঠের ভেতর। আর পালিয়েছে শাহু আর ভৈরবনারায়ণের দল, আট দশজন আহত লোককে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো।

এর পরে হয়তো পুলিশ ফৌজ নিয়ে পৌঁছুবেন বদরুদ্দিন জমাদার আর দারোগা তারণ তলাপাত্র। কিন্তু বাঁধ বাঁধা হয়ে গেছে, বাঁধ রুখতেও হবে। সে হয়তো আরো বড় লড়াই।

কিন্তু এই দুঃখরাতের পার থেকে যে সূর্য উঠেছে, সে সূর্য সেদিনও জেগে থাকবে; যে রাত্রি প্রভাত হল—সে রাত্রি আর ফিরে আসবে না।

রঞ্জনের ঘুম ভাঙল জয়গড়ে নগেনের বাড়িতে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পাশ ফিরতে গিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সে।

কপালে হাত দিয়ে কে বললে, আর একটু শুয়ে থাক্ চুপ করে।

রঞ্জন চমকে চোখ মেলল।

—কে?

—চিনতে পারছিস না রঞ্জু? আমি পরিমল!

পরিমল লাহিড়ী অল্প অল্প হাসছিল।

—কখন এলি তুই?

—তোদের যুদ্ধ শেষ হবার পর। এসে দেখি, সৈনিক হবার আর দরকার নেই, তাই নার্স হতে হল।

রঞ্জন উত্তেজিতভাবে বললে, আর মাস্টার সাহেব? আলিমুদ্দিন মাস্টার?

—পাশের ঘরে আছেন। ডাক্তারের বোন নার্স করছে।

—বাঁচবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পরিমল: বোঝা যাচ্ছে না।

যন্ত্রণায় রঞ্জনের হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে এল। নিঃশব্দ গলায় বললে, বড্ড খাঁটি মানুষ।

পরিমল অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ, সবই শুনলাম ডাক্তারের কাছ থেকে। ওই মানুষগুলোর হাতেই খাঁটি পাকিস্তান জন্ম নেবে একদিন। এখন শোন্। এখানে আপাতত তোকে নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল হবে। তুই আজই চলে যাবি কলকাতায়। থাকলে না-হক ঝামেলা বাড়বে কতগুলো।

—তারপর এখানকার ভার?

—সেইটে নেবার জন্যেই তো আমি এলাম।

এই আহত অসুস্থ মুহূর্তে একটা কথা বারবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় একটা আর্ত প্রশ্ন জেগে উঠতে চাইল ক্রমাগতই—কিন্তু উচ্চারণ করতে পারল না রঞ্জন।

পরিমল নিজেই বললে সে কথা।

—একটা খবর তোকে এখনো দেওয়া হয় নি। মাসখানেক আগে মিতাকে অ্যারেস্ট্ করেছে।

—ওঃ !

আর কিছু জানবার নেই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবারও নেই। এইবার যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে রঞ্জন। এখনও অনেক দেরী—নীড়ের স্বপ্ন এখনও অনেক দূরান্তরের অরণ্যছায়ায় ; তার আগে শুধু বেদের মেয়ে কালোশশী কেন—কেউই ঘর বাঁধতে পারবে না। না—কেউ নয়।

দরজার গোড়ায় ছায়ার মতো এসে দাঁড়ালো নগেন। পাণ্ডুর মুখে বললে, একবার উঠতে পারো রঞ্জনদা—আসতে পারো এঘরে ?

রঞ্জন সোজা বিছানার ওপর উঠে বসল : মাস্টার সাহেব ?

নগেন বললে, দেখে যাও।

উত্তমার কোলে মাথা রেখে ঘুমভরা চোখ মেলে একবার তাকালেন আলিমুদ্দিন। কাউকে চিনলেন না। রঞ্জনকে নয়, নগেনকেও নয়।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকলেন, কল্যাণী ?

উত্তমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

—কল্যাণী নয় দাদা, আমি উত্তমা।

—না, কল্যাণী !—আলিমুদ্দিন হাসলেন : আর তো তুমি দূরে নেই বোন, এবার কাছে চলে এসেছো। কিন্তু এ যাত্রা তো আর হলনা দিদি, আবার তোমার ভাইফোঁটা নেব আজাদ পাকিস্তানে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ !

নিবিড় তৃপ্তিতে আস্তে আস্তে তাঁর চোখ দুটি বুজে এল।

*   *   *   *

লাল মাটি।

আমার মা। অনেক ইতিহাসের রক্ত-স্বাক্ষরে সীমন্তিনী তুমি—অনেক প্রাণ-সাধনার তুমি মহাভৈরবী। আজও তোমার সাধনা শেষ

হয়নি, আজও গৈরিক মাটিতে তোমার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, আজও কালবৈশাখীর ঝড়ে দিকে দিকে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্ন-ভিন্ন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি। আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী তলোয়ার হয়ে জ্বলছে; আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুকনপুরের নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শেষ শিখা।

আমার জন্মভূমি—আমার লাল মাটি। আমাদের রক্ত দামামার তালে তালে, তোমার রাঙা টিলার চূড়োয় চূড়োয় আজ নবযুগের স্পর্ধিত পদধ্বনি॥

কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৫৮
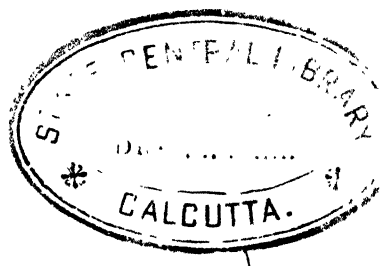
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬